আধুনিক

ভারতীয়

গল্প ৩

আধুনিক ভারতীয় গল্প ৩

প্রকাশ : ১৩৭২ ১১ জ্যৈষ্ঠ

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : শর্মিলা পাল । ভূর্জপত্র
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৪

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৬

সূচি

কাকে বলবো ভারতীয় গল্প, 'আধুনিক' ভারতীয় গল্প—এই প্রশ্ন ক'রেই আমরা সংকলনের সূত্রপাত করেছিলাম। প্রশ্ন ছিলো, পরিবেশ, ঘটনাস্থল, চরিত্ররা ভারতীয় হ'লেই কি রচনা ভারতীয় হ'য়ে ওঠে, 'কিম' বা 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' বা 'মিডনাইটস চিলড্রেন'-এর কথা ভেবে? না কি আছে গল্পবলারই ধরনে, বয়নের ভেতরেই, এমন-কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য, যেটা রচনাকে ক'রে তোলে ভারতীয়—সে-গল্প যদি ভারতবর্ষে ফাঁদা না-হয়, তাহ'লেও?

অনুসন্ধানের সূচনা থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম যে অনেকেই হয়তো বলবেন সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার কথা—আন্তর্জাতিকতার কথা। তবে সেটা আমাদের তেমন বিচলিত করে না, অনুসন্ধান চালাবার বিষয়ে বরং আমাদের উৎসাহিতই করে। কেননা, যেমন বলেছি, উপনিবেশ যারা গড়ে আর উপনিবেশের বলি বা শিকার যারা হয়, তারা কেমন ক'রে একইভাবে দেখবে সবকিছু? সে-কোন্ বিশ্বজনীনতা বাঘে আর গোরুকে একঘাটে জল খাওয়ায়, পরস্পরকে নির্বিরোধ দোসর ক'রে তোলে? বিশ্বজনীনতা নিয়ে অনেক রকম ফ্যানটাসির বলি হয়েছি আমরা—সব বৈশিষ্ট্য উকো দিয়ে ঘ'ষে বেমালুম উড়িয়ে দিলেই নির্বিশেষ কোনো বিশ্বজনীনতায় গিয়ে পৌঁছুনো যায় না, এ-কথাটা ভাবিনি। বরং যদি আনুগত্য থাকে নিজের পরিবেশ, ইতিহাস, সামাজিক পটভূমিকায়—এককথায়, শিকড় যদি জানা থাকে, তবেই হয়তো বিশ্বের বাসিন্দা হ'য়ে-ওঠা যায়: কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলেই, শৃগাল ধোবার নীলের গামলায় অবগাহন করলেও কাকত্ব বা শৃগালত্ব হারিয়ে অন্যকিছু হ'য়ে যায় না। ইট মিট কিট বললেও, সাবান, ঝামা বালি যতই ঘষি-না কেন, যতই চাই-না কেন, আমরা একেকজন সাহেব হ'য়ে পড়বো না। বিদিয়াধর নয়পল, বেচারা, অত চেষ্টা ক'রেও কিনা পশ্চিম ইণ্ডিজেরই লেখক থেকে গেলেন।

সাহিত্য ভাষানির্ভর—কিন্তু পুরোপুরি নয়। না-হ'লে আফ্রিকী বা মার্কিন সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য হ'য়ে যেতো। ক্যানাডার ফরাশি সাহিত্য ফ্রান্সের সাহিত্য-ইতিহাসে বড়ো পরিসর পেতো, লাতিন আমেরিকার ভিন্ন-ভিন্ন দেশের সাহিত্য অন্তর্ভূ'ত হ'তো মূলধারা এস্পানিওল সাহিত্যের। হায় রে, অস্ট্রেলিয়ায় বড়োদিনে একশো দশ ডিগ্রি গরমে স্লেজ টেনে বরফ পেরিয়ে আসে না সান্তাক্লস!

ফলে অস্ট্রেলিয়ার বড়োদিন গ্রেট ব্রিটেনের বড়োদিন হয় না। চেখোস্লোভাকিয়ায় বড়োদিনে রুইমাছ কাটে, তুর্কিমোরগ নয় মার্কিন মুলুকের মতো।

ভারতবর্ষে আরো-সব বিশেষ গোলমাল পাকিয়ে আছে। পুঁজিবাদ, সামন্ত-তন্ত্র, নয়া ঔপনিবেশিকবাদের সহাবস্থান, কম্পিউটার এবং জ্যোতিষচর্চার যুগলবন্দী, প্রেমের কবিতার হাহুতাশ ও বধূ পোড়ানোর উৎসব, পণপ্রথা সতী আর বোরখার পাশাপাশি মা-মা ব'লে আহ্লাদ প্রকাশ—এ-রকম তুলকালাম পঞ্চশীল আর-কোথাও সম্ভব হয়েছে কিনা, আর-কোথাও যুগপৎ বাস্তবের এ-রকম হাইড্রামুণ্ড আছে কিনা—সেটা নিয়ে সারাক্ষণই মাথা ঘামিয়ে যাওয়া যায়। ধাপে-ধাপে যে-সমাজ আমরা গড়েছি, ওপর মহল, নিচের মহল, ওপর তলা নিচের তলা, শ্রেণী ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, জাতপাতের বিভেদ, পাহাড়ি উপজাতি-অচ্ছুৎ, পুরুষ-শাসনে-নারী—এই ওপর-নিচের কাজ-কারবার এমনই যে তার তুলনা অন্য-কোথাও পাওয়া দুষ্কর। এই বাস্তবোঝাই ওপর-নিচ নিয়ে আমরা একবিংশ শতাব্দীর দিকে ধাবিত হচ্ছি—তবে সাহিত্য জাতির বিবেক যদি নাও হয় কিছুটা জাতিকে প্রতিফলিত করে ব'লেই বোধকরি ভারতীয় ছোটোগল্প অন্যভাবে এ-সব ব্যাপারের দিকে তাকিয়েছে।

এই ওপর-নিচের লীলাভূমিতে সবচেয়ে নিচে মেয়েরা, যারা নাকি পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে কেমন ক'রে বালিশ-চাপা দিয়ে বা নুন খাইয়েই আঁতুড়েই নয়, ভ্রূণাবস্থাতেই মেয়েদের হত্যা করার সহজ উপায় কাজে খাটানো যায়। এই সংকলনে তাই অন্যসব সাহিত্যিক প্রশ্নের আড়ালে, একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নও আছে—সেটা সমাজের এই বিভিন্ন ধাপের সহাবস্থান সম্বন্ধে বিস্ময়চিহ্নসম্বল প্রশ্ন—অক্সফোর্ডের কোনো ঐতিহাসিক যাকে বলেন প্রতিরোধপ্রতিবাদবিহীন শরিকী ব্যবস্থা, সাহিত্য কি বলে সেটাই প্রকৃত দশা? এ-গল্পকে আমরা কি পাশ্চাত্যে-গজানো সাম্প্রতিক আখ্যায়িকাতত্ত্ব ব্যবহার ক'রে বুঝতে পারবো, যদি-না প্রয়োগ করি আলোচনার খাতিরে, বোঝবার দায়ে, অন্যসব সূত্র—যা সামাজিক বাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতাতেই অন্বিত হ'য়ে ওঠে?

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শাস্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াশুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, "ওই রে বাধিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব দিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যে-দিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থমথম ছমছম করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যে-দিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন স্তব্ধ গৃহ গমগম করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে

একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি, ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ-বা নিজের খেতে কেহ-বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবর্দস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে-স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল; তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতে-ছিল। দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল দেখিল, উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো একমুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষ বচন, বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি!" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না-ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাত জনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এ-পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ-নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্‌ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া, চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া, ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছমছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া-রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল।

চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল, আর রক্ষা হয় না; হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, 'রাম-রাম! সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে-দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে!' ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না; কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্ গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ-কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু, যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে

একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন; কহিলেন, "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে-দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হু হুঃ শব্দে পুলিশ আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

•

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে-পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজ মুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে-কথা গাঁ-শুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে; এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে-কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর-পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর-কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোল-গাল; শরীরটি অনতিদীর্ঘ; আঁটসাঁট; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে, এবং কুম্ভ কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শন-যোগ্য যাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উলটা : অত্যন্ত এলোমেলো, ঢিলেঢালা, অগোছালো, মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা-কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া-মাগিয়া বকিয়া-ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াশুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য-বর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া-বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না-বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে-মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন-কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ

কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে-কর্মে কোথাও এক দণ্ড সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও-মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভয় কিসের।" এই—দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য, এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জবর্দস্তি করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাসশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন-কি, এক-একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তম্ভিত হইয়া

চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামী-রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিশের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল দুখি বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।"

ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে-যে অলংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিশ আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিশ যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল চন্দরা কহিল, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।"

"কেন খুন করিয়াছ?"

"আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

"কোনো বচসা হইয়াছিল?"

"না।"

"সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?"

"না।"

"তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?"

"না।"

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব-এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বারবার সেই একই উত্তর পাইল—বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে-মনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন-পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সই-সাঙাতরা, কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ-বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, পুলিশ-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে-একে সত্যঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি যদি বলি, আমার বড়োভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবর্দার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও

মিথ্যা বলিস না—এত বড়ো মহাপাপ আর নাই।' " ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ভাবিল, 'ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভালো।' এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব-পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিশ আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুনসেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ-নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্‌বর্তী একটি ডোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কত শত লোক আপন-আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর-কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কত বার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে-অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাসো না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন?

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু, চন্দরা পুলিশ হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যে-দিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শশুরঘরে আসিল সে-দিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, 'যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সদ্গতি করিয়া গেলাম।'

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করো?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ!—"

ভণ্ডুলমামার বাড়ি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে-মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশ-বাবুকে লাগেও ভালো, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশি গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না-হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকি পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোলো আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোটো মাঠ, একপাশে একটা বড়ো তুঁতগাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েছে, স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোনো ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরিব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্‌, শোন্‌, যা দিকি, একবার গঙ্গার বৌয়ের বাড়ি, আমার নাম ক'রে বলগে, দুটি গরম মুড়ি ভেজে দেয়—এক্ষুনি···

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা···

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে-বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে-মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!···এখানকার লোকজন দেখেছেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার

কোনো চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে কোনোরকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে! কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাইনে, মালমশলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েছি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেছি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনো ভুলতে পারেননি। বেচারির জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ওই কলেজের কটা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়ছে, রঙিন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

···

—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ছিল কেন? এখন নেই?

সে-কথা পরে বলছি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে. গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট-নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াশুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোটো-বড়ো আটচালা ঘর, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড়ো আম-কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্ছে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে

পড়ল, এ-পাড়া ও ও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবায় ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হলো অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোটো-বড়ো ভাঁটশেওড়ার গাছ গজিয়েছে, চুন-সুরকি মাখার ছোটো খানাতে পর্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়লো, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্ছে দেখে-ছিলুম। এখনো গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলছে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করছে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনো শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে।··· ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করছে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্ছে না।

আমার ভারি কৌতূহল হলো, সাগ্রহে বললুম, ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?···

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণির হাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকতো, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুজ্যেবাড়ির ভাগ্নে, চাকরিবাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েছে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দেয়, মুখুজ্যেরা মিস্ত্রি লাগিয়ে ঘরদোর শুরু ক'রে দিয়েছে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে-মাঝে দেখাশুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুজ্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সবসময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রি লাগানো হয়।

কী জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণির হাট, যায় তাঁর ছেলেমেয়েশুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানু-ভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়ালো, অথচ কেন এ-সব হলো তার কোনো ন্যায়সংগত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে-শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেছি—লালমণির হাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে ?... না, এবার বোধহয় নিজে আসবে। মুখুজ্যেরা বোধহয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো-বা জিজ্ঞেস করি—লালমণির হাট কোথায় দিদিমা ?

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণির হাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কী দরকার পড়লো ?... তা, কী জানি বাপু কোথায় লালমণির হাট ? নে-নে, ঘুমুস্ তো আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় ছুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে—তোমায় নিয়ে সারারাত গল্প করলে তো চলবে না আমার!

আমি অপ্রতিভের স্বরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বলো, যেয়ো না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনছি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর ছুই পরে। এই ছু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হতো সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শ্যাওড়া বনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হলো কে জানে ? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুজ্যে বাড়ি টাকা পাঠিয়েছে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কী, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশি আর-একটুও এগোয়নি, বনে-জঙ্গলে একেবারে ভর্তি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড়ো-বড়ো চারা! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধহয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর!

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সে-বার অনেক কথা শুনলাম। ভণ্ডুলমামা লালমণির হাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েছে। তার এখন ছুই ছেলে, ছুই মেয়ে। বড়ো ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। বড়ো ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্র মাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠলো না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাবো মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজি করানো গেল। সারাপথ সে কী আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েছি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ-সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কী রকমে হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারিনে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না-লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেকদূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনো বসানো হয়নি।

হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কী বলবেন, তখনকার মতো সে-দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল।

উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হলো, গত বর্ষার পরে বোধহয় আর মিস্ত্রি আসেনি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েছে, গাঁথুনির ফাঁকে-ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড়ো একটা সজনে গাছে প্রথম ফাগুনে ফুলের খই ফুটেছে। ঘুরে-ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোটো দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড়ো ঘরটা বোধহয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধহয় থাকবেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধহয় উঠোনের একপাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুল-মামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন

জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়তো বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে-সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ-জংলি চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ-পাড়াতে একঘর লোক বাড়বে··· ওপাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধে হ'য়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না··· ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলে-মেয়েরা কথা বলবে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চ'লে যাবো।

আরো বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হ'য়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক হয়েছে। কবে আমি দেখিনি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনো বাকি, দরজা জানলায় এখনো কপাট বসানো হয়নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহ'লে হ'য়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড়ো সুদখোর হ'য়ে উঠেছেন, মাঝে-মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চ'লে যান। মাস-কতক পরে আবার এসে কাবুলিওয়ালার মতো চড়াও হ'য়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেছে রক্তদন্ত।

তারপর এলো একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মতো মামার বাড়িতে আর তত যাইনে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে-যেতে হয়তো দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন প'ড়ে আছে··· বনজঙ্গল চারিপাশে আরো গভীরতর, কেউ কোনোদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েছে ব'লে মনে হয় না··· একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কতবার ও-বাড়িটা দেখেছি, সেই একই মূর্তি···

এমনি ক'রে বছর কয়েক কেটে গেলো।

ক্রমে এনট্রেন্স পাশ দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলাম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ. এ. দেবো, কী-একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েছি।

বোধকরি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের ঘরে জানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধহয় একখানা লজিকের বই পড়ছি, এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড়ো মামিমা বললেন,—এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর।

আমার সে-ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েছে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন

পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিংয়ে ভলান্টিয়ারি করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই গেছে বদলে—তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরো-পাঁচটা পুরোনো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা প'ড়ে গিয়েছে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলি বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীনভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে প'ড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড়ো ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এ-সব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—আনবো, শিগগিরই আনবো, বাবা। এখনো একটু বাকি আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ-দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ জোগাতেই··· সেইজন্যেই তো খেয়ে-না-খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ওই একটুখানি যা বাকি আছে ···তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনো··· এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করবো।

বলে কী! এখনো বাকি! জ্ঞান হ'য়ে পর্যন্ত দেখে আসছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ-তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারবো তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই ব'লে যেতে লাগলেন,—সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটছে, আজ যদি চাকরি যায় তবে, ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো, তাই ভেবে আজ চোদ্দ-পনেরো বছর ধ'রে একটু-একটু ক'রে বাড়িটা তুলছি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেলবো। জায়গাটা বড়ো ভালোবাসি।

ভণ্ডুলমামা বললেন তো চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'লো ভণ্ডুল-মামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর

দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে··· যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর-একখানি উঠছে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হ'য়েই চলেছে··· ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বললেন—এসো একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামি তোমায় দেখলে খুশি হবে। সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইলো, অবিশ্যি-অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'লো। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের স্বরে বললেন,—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাশা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি, তা কেউ কি কথা শোনে?

মামিমা ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠলেন, যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হ'য়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে তো মানুষে··· তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের স্বরে ভয়ে-ভয়ে যা বললেন তার মর্ম এই যে, মানুষ বাস না-করলেই বাড়িতে বট-অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হ'য়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হ'তে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনো ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না-হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই ক'রে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম, পাঁচিল পাতকুয়া এখনো বাকি। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনো শেষ হয়নি, এখনো কিছু বাকি আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলছে যে, একদিক গ'ড়ে উঠতে অন্যদিকে ধরেছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আসতে হয়, দেখাশুনো করতে হয় ব'লে একদিন সলজ্জ

কৈফিয়ৎও দিলেন।··· পাঁচিল? হ্যাঁ, তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে··· সামনের বর্ষায়··· ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড়ো আদরের জায়গা—তোরা না-থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম, ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হ'য়ে গেছে।

—কী করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড়ো দম আমার যে। ছাখো, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হ'য়ে ঘরের কষ্ট বড়ো পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবোই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর-কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করবো। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না-হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায়-বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াবো কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু-কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না-থাকলে বাড়িখানা তো থাকবে না—আর এককালে-না-এককালে ছেলেদের তো এসে বসতেই হবে বাড়িতে। কলকাতার বাসায়-বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরো সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনো দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনো এ-জায়গাটা ভাঙছেন, ওটা গড়ছেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করছেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোটো মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এইরকম ক'রে চেয়ে-চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে-ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি. এ. পাশ ক'রে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাইনে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলিরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে-একে ম'রে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের

প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু একদিকের দোতলা-সমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে-পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড়ো-বড়ো জগ্যিডুমুরের গাছ, দিনেই বোধহয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে ঘোঝাই, জল দেখা যায় না, গোরুবাছুর কচুরিপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হ'তে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনো পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে-না-হ'তেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে-প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখির ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন ছোটো-মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক-পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা শাদা কাপড় বসানো বাঁশের বাটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা, এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!… শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সংকোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হ'য়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ করেছে এমন মনে হ'লো না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশি হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হ'য়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড়োমামার সেই পুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড়ো শখ হ'লো, বয়স হয়েছে কবে ম'রে যাবো, বললুম, তা দাও নবীন,

জুতোজোড়াটা পুরোনো হ'লেও এখনো দু-তিনমাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড়ো লাগে ব'লে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হ'য়ে গেলেন। আমি চেয়ে-চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারি চাল-ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং-ফটাং শব্দ করতে-করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এলো। আমি চেঁচিয়ে বললুম,—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও-না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এসো আমার—খাশা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনো যা বাকি। কী করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি…

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এর মাসকতক পরে তাঁর বড়োছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিলো। ম্যাকমিলান কোম্পানির বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাথ দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললেন—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজি নন। বুদ্ধিশুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হ'লে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেছে বাড়ির পেছনে, বেচতে গেলে এখন ইট-কাঠের দরেও বিক্রি হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে, পাগল আপনি?

আমি বললুম,—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে ছাখো, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরি করতে এত দেরি হ'য়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হ'য়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চ'লে গেলো, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হ'লো। কার দোষ দেবে?

তারপর ভণ্ডুলমামার আর-কোনো সংবাদ রাখিনি অনেক কাল। বছর-

তিনেক আগে একবার মেজোমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে ; পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হ'য়ে কদিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখা-শুনা করেনি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ-অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়ে ছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর-কখনো মামার বাড়ির গ্রামে যাইনি, হয়তো আর কোনো দিন যাবোও না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হ'য়ে পর্যন্ত যে-বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, এক গলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন, উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে··· সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানলার কপাট নেই, থামে-থামে কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে।···

আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কী ক'রে ঘটলো সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিশ কেন আমার মন এমন জুড়ে ব'সে রইলো, অথচ কত বড়ো-বড়ো ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছে গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এইসব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য, যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

···

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এলো।

ঘরওয়ালি

ইসমৎ চুগতাই

যেদিন মির্জার নতুন দাসী হেলেদুলে এসে তার বাড়ি ঢুকলো, সেদিন সারা মহল্লাটাতেই তোলপাড় প'ড়ে গিয়েছিলো। এমনকী সারাক্ষণ কাজে ফাঁকি দিতে অত-যে ওস্তাদ ঝাড়ুদারটি, সে যে শুধু থেকে গিয়েছিল তা নয়, দারুণ উৎসাহে সাফ করেছিল মেঝে। জল মেশাবার জন্যে গয়লার অত বদনাম কে না জানে, কিন্তু সেদিন সে এমন দুধ নিয়ে এসে হাজির হয়েছিলো যার ওপর ননী ভাসছে।

লাজো নামটা কে যে একে দিয়েছিলো? লজ্জাসরম লাজোর একেবারেই অজানা। কে যে তার জন্ম দিয়েছিলো, আর কেই বা তাকে একদিন রাস্তায় ফেলে চ'লে গিয়েছিলো, তাকে রেখে গিয়েছিলো এক সঙ্গীসাথীহীন কান্নায় ভরা শৈশবে, কেউ তা জানে না। ভিক্ষে ক'রে, উপোস ক'রে সে এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছিলো যখন সে নিজেই নিজের জীবিকাটা ছিনিয়ে নিতে পারে। যৌবন তার দেহ ভরাট ক'রে এঁকে গিয়েছিল এক মোহিনী বঙ্কিমা, আর সেটাই ছিলো তার একমাত্র পুঁজি। রাস্তাই তাকে দীক্ষা দিয়েছিলো জীবনের রহস্যে।

কোনো দরাদরি সে কখনও করেনি। যদি নগদানগদ কারবার না হয়, বেশ তো, না-হয় ধারেই হোক যৌনমিলন। তার নাগরের যদি কোনো আয়ই না-থাকে, তাতে কী, সে এমনকী বিনি দামেই না-হয় নিজেকে বিলিয়ে দেবে।

'আচ্ছা, তোর লজ্জাও করে না?' লোকে তাকে শুধোয়।

'করে তো!' প্রায় লোক দেখিয়েই রাঙা হ'য়ে যেতো লাজো।

'একদিন এজন্যে তোকে ঠিক পস্তাতে হবে।'

'থোড়াই তার পরোয়া করি!'

কেমন ক'রে পারে ও? মুখ দেখে তো মনে হয় সরলা বালিকা, একেবারেই নিষ্পাপ, গভীর-কালো চোখ, মুক্তোর মতো দাঁত, গায়ের রঙ পাকা সোনার, আর চলার ছন্দে কেমন একটা দোলা, কেমন একটা উশকানি।

মির্জা বিয়ে করেনি। রোজ থাবড়ে-থাবড়ে চাপাটি বানিয়ে আর সেঁকে-সেঁকে তার জীবনটাই যেন চ্যাপটা হ'য়ে গিয়েছে। ছোট্ট একটা মনোহারী দোকান আছে

তার, তাকে সে জাঁক দেখিয়ে নাম দিয়েছে 'জেনারেল স্টোর'। এই দোকান তাকে এককোঁটা অবসরও দেয়নি যে একদিন দেশে গিয়ে কাউকে নিকাহ্ ক'রে নিয়ে আসবে।

মির্জার জিগরি দোস্ত বক্সী লাজোকে তুলে এনেছিলো একটা বাসস্টপ থেকে। বক্সীর বিবি ছিল ন-মাসের পোয়াতি, তাদের দরকার ছিলো একজন দাসী—ঘরের কাজের জন্যে। পরে, লাজোর যখন আর-কোনো দরকার বা চাহিদা রইলো না, বক্সী তাকে সোজা মির্জার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলো। বাঈজি-বাড়ি গিয়ে অত টাকা না-উড়িয়ে—সে ভাবলে—মির্জা কেন কিছুদিন বিনি পয়সাতেই স্বর্গসুখটা চেখে দেখুক-না?

'আল্লাহ্ নারাজ, আমি বাড়িতে কোনো বেসরম ছেনালকে রাখব না', মির্জা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে। 'যাও, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

কিন্তু লাজো ততক্ষণে বাড়িটাকে নিজের ক'রে নিয়েছে। ঘাগরাটাকে নেংটির মতো তুলে নিয়ে, ঝাঁটা হাতে, সে বেজায় উৎসাহে মির্জার বাড়িঘর সাফা করতে লেগে গিয়েছে। বক্সী গিয়ে তাকে যখন মির্জার নারাজ হবার খবর দিলে, সে কথা যেন কার বধির কানে গিয়ে পড়লো। লাজো তাকেই সরাসরি হুকুম ক'রে বসলো রসুইঘরের তাকে থালাবাসনগুলো সাজিয়ে রাখতে, তার পর সে জল আনতে বেরিয়ে গেলো। 'চাস যদি তো তোকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি,' বক্সী বললে।

'ভাগো হিঁয়াসে! তুমি কি আমার বিয়ে-করা নাগর নাকি যে আমাকে মায়ের বাড়ি নিয়ে যাবে? যাও, যাও! মিঞাকে আমি নিজেই শামলাবো।'

বক্সীর প্রস্থান মির্জাকে কেমন অসহায় ক'রে দিলে। সে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সোজা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলে। এই ফালতু খরচাপাতি তার পোষাবে না। তা ছাড়া ছেনালটা নির্ঘাৎ চুরিচামারি করবে, ঠকাবে। সত্যি, বক্সী যে তাকে কী মুশকিলেই না ফেলে গেলো!

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে তার একেবারে দম বন্ধ হবার জোগাড়। যেন তার মা বাঈ আম্মাই আবার বেহেস্ত থেকে ফিরে এসেছে! বাড়িঘর সব ঝকঝক করছে। 'খাবার দেবো নাকি, মিঞা?' জিগেশ করেই লাজো রসুই ঘরে হাওয়া হ'য়ে গেলো।

আলু আর পালং শাকের তরকারি, ভাজা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মুগু কি ডাল—ঠিক যেমন আম্মাজি রসুই পাকাতেন!

'এত-সব তুই পেলি কোথায়?' হতভম্ব হয়ে মির্জা শুধোলে।

'বানিয়ার কাছ থেকে ধারে কিনেছি।'

'শোন, আমি তোর বাড়ি ফেরার টিকিট কেটে দিচ্ছি। আমার কোনো কাজের লোক রাখার ক্ষমতা নেই।'

'মাইনে কে চেয়েছে?'

'কিন্তু…'

'খাবার বুঝি ঝাল হয়েছে?' একটা টাটকা চাপাটি তার রেকাবিতে তুলে দিয়ে লাজো জিগেশ করলে।

'খাবার নয়—তবে আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি জ্বলছে!' মির্জা চেঁচিয়ে বলতে চাচ্ছিল, ঘরে শুতে যাবার আগে।

'না, মিঞা। এই আমি গ্যাঁট হয়ে বসলাম, চিরকালের জন্যে!' পরদিন সকালে কথাটা পাড়বামাত্র লাজো ভয় দেখিয়ে বললে।

'কিন্তু…'

'আমার রান্না তোমার পছন্দ হয়নি?'

'তা নয়…'

'সব আমি মেজে-ঘ'সে চকচকে ক'রে নিকিয়ে রাখিনি?'

'তা নয়…'

'তা হ'লে কী?' লাজো জ্ব'লে উঠল।

লাজো একেবারে হাবুডুবু প্রেমে প'ড়ে গিয়েছে—না, মির্জার নয়, বাড়িটার। বক্সী বেজন্মা একবার তার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করেছিলো। সে-ঘরের আদত মালিক ছিলো নন্দী—একটা মোষ। সে কবেই মরে-টরে দোজখে গেছে, কিন্তু পেছনে রেখে গিয়েছে সে কী বোঁটকা গন্ধ! আর বক্সী তার সঙ্গে খুব-একটা ভালো ব্যবহারও করেনি। আর এখন কিনা সে এখানে, মির্জার বাড়ির একচ্ছত্র ঘরওয়ালি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী! মির্জার মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, সে চোরের মতো বাড়ি আসে, চুপি-চুপি, সন্তর্পণে, যা দেয়া যায় তাই সোনা তোলা ক'রে খায়।

মির্জা অবশ্য তার দিক থেকে হিশেবটা অনেকবারই খতিয়ে দেখছে—এবং দেখে বেশ খুশি—লাজো আর যা-ই হোক ঠকায় না।

লাজো মাঝে-মাঝে যায় রামুর দিদার কাছে আড্ডা দিতে। রামু হচ্ছে মির্জার দোকানের ষোলো-সতেরো বছর বয়েসী ম্যাদামারা কর্মচারী। লাজোকে দেখবামাত্র সে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়েছে। মির্জা যে মাঝে-মাঝে বাঈজিবাড়ি যায় সেটা আসলে সে-ই লাজোকে ব'লে দিয়েছিলো।

এতে লাজো ভারি কষ্ট পেয়েছিলো। আচ্ছা, সে তবে আছে কী করতে? যেখানেই চাকরি নিক, লাজো অ্যাদ্দিন সব ব্যাপারেই তার মালিকদের সেবা ক'রে এসেছে। আর এখানে কিনা একটা গোটা হপ্তা নিরিমিষ কেটে গেলো! শুদ্ধ! পবিত্র! আর কখনও নিজেকে তার এত অপ্রয়োজনীয়, এত চাহিদাহীন লাগেনি। তাকে ভাগ ক'রে গোটা-কয়েক প্রস্তাব অবশ্য এসেছে, তবে সে তো মির্জার বাড়ির দাসী, না কি! পাছে লোকে মির্জাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, রগড় করে, এইজন্য সে সবগুলো প্রস্তাবই উড়িয়ে দিয়েছে। আর এদিকে মির্জা কিনা একটা বরফের পাহাড়ের মতো ঠাণ্ডা জলে ভাসছে—অন্তত সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। ওর মধ্যে কখনও কোনো আগ্নেয়গিরি আগুন ওগরাবে ব'লে তো লাজোর মনে হয় না। ও কিনা ইচ্ছে ক'রে বাড়ি থেকে দূরে-দূরে থাকে।

সকলের মুখেই লাজোর নাম: আজ সে গয়লার গালে থাপ্পড় কষিয়েছে, কাল সে বানিয়ার মুখে সরাসরি এক দলা গোবর ছুঁড়ে মেরেছিলো, ইত্যাদি। স্কুলমাস্টার পণ ক'রে ব'সে আছে তাকে লেখাপড়া শেখাবেই। মসজিদের মোল্লাজি আরবী ভাষায় কী সব জপ করতে থাকে, বোধহয় আসন্ন বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া চায়!

মির্জা বাড়ি ফিরলো বিরক্ত। লাজো সবে তার গোসাল সেরেছে। তার কাঁধে লেপটে আছে কয়েক গোছা ভিজে চুল। রান্নাঘরের উনুনে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে তার গাল রাঙা হ'য়ে উঠেছে, চোখে জল এসে গেছে। মির্জার এই অসময়ে প্রবেশ দেখে সে শুধু দাঁত কিড়মিড় করলে।

মির্জা প্রায় উলটে পড়ে আর-কি! চুপচাপ, কেমন একটা অস্বস্তিকর খানা শেষ হ'তেই সে তার ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে মসজিদে এসে বসলো। কিন্তু কিছুতেই সে আর সহজ হ'তে পারছিলো না। বাড়ির কত-কী ভাবনা কেবলই তাকে অস্থির ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। শেষটায় আর শামলে থাকতে না-পেরে সে ফিরে এসে দেখলো লাজো চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে কোন-একটা লোকের সঙ্গে তেড়ে ঝগড়া করছে। মির্জাকে দেখামাত্র লোকটা শুট ক'রে কেটে পড়লো।

'ও কে?' মির্জার গলার স্বর শুনে মনে হয় সে বুঝি কোনো সন্দেহবাতিকওলা স্বামী।

'রাঘব।'

'রাঘব!' কত বছর ধ'রেই তো মির্জা তার কাছ থেকে দুধ কিনছে, অথচ তার নামটাই কিনা অ্যাদ্দিন সে জানতো না।

'তামাক দেবো, মিঞা ?' লাজো কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলে।

'না! কী চায় লোকটা ?'

'জিগেশ করছিল. এখন থেকে কতটুকু দুধ দেবে ?'

'তুই কী বললি ?'

'বললাম : ভগবান তোর মরণ আনুক চটপট! অ্যাদ্দিন যা আনতিস, তাই আনিস।'

'তার পর ?' মির্জা খেপে বোম।

'তার পর বললাম : ওরে বেজন্মা, গিয়ে তোর মা-বহিনকে ঐ বাড়তি দুধ খাওয়া!'

'বদমায়েশ! আর ওকে এখানে ঘেঁষতে দিস না। এখন থেকে স্টোর থেকে ফেরবার সময় আমিই দুধ নিয়ে আসবো।'

সে-রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর, মির্জা কড়া ইস্ত্রি-করা একটা কুর্তা চাপালে গায়ে, কানে গুঁজলে আতর-দেয়া তুলো, তুলে নিলে তার ছড়ি, তার পর ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে বেরিয়ে পড়লো।

হিংসেয় লাজোর বুক বুঝি ফেটেই যাবে! স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে-ব'সে সে বাঈজির মুণ্ডপাত করতে লাগলো। মির্জা কি সত্যি তার সম্বন্ধে পুরোপুরিই উদাসীন ? 'তা কী ক'রে হয় ?' সে হা হ'য়ে ভাবলে।

বাঈজি তখন এক মক্কেলের সঙ্গে টাকা নিয়ে দরাদরি করছে। এতে মির্জা ভারি রেগে গেলো। ফিরে, সে সোজা চ'লে গেলো লালার দোকানে। সেখানে সে যত ঝাল ঝাড়লো মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য, আর দেশের রাজনীতির ওপর··· মাঝরাতে যখন সে বাড়ি ফিরে এল, তখন সে বেজায় বিরক্ত। আর ক্লান্ত। প্রচুর ঠাণ্ডা জল খেলে সে, ঢকঢক করে কিন্তু ভেতরের আগুনটা তখনও দাউদাউ ক'রে জ্ব'লেই চলেছে।

খোলা দরজা দিয়ে লাজোর মসৃণচিক্কণ সোনালি পায়ের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কেমন অসাবধানে পাশ ফিরতে যেতেই ঘুঙুরের বোল উঠলো রিনিঝিনি। মির্জা ঢকঢক ক'রে আবার এক গেলাশ জল খেয়ে নিলে, তার পর তার খাটিয়ায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো, এই চন্দ্রালোকে যাবতীয় বস্তুকে অভিসম্পাত দিতে-দিতে।

বিছানায় অনবরত এপাশ-ওপাশ করতে-করতে তার শরীরে প্রায় ফোসকা প'ড়ে যাবার জোগাড়। গেলাশের পর গেলাশ জল তার পেটটাকে ফুলিয়ে ঢোল

ক'রে দিয়েছে। কেমন যেন অপ্রতিরোধ্য ঠেকছে দরজার ওপাশে পা-টার স্বস্থ গোলত্ব। বিছানা থেকে রান্নাঘর—সে এত মাইল হেঁটেছে যে আরেকটা পা ফেলবারও ক্ষমতা আর তার নেই।

তার পরে একটা ভারি সরল ও নির্দোষ ভাবনা তাকে পেয়ে বসলো। লাজোর পা-টা যদি ওভাবে নগ্ন প'ড়ে না-থাকে তাহ'লে আর এতটা অস্বস্তি হয় না… আস্তে-আস্তে ভাবনাটা দানা পাকিয়ে উঠলো, আর মির্জাও বেশ সাহস ও শক্তি পেলে। যদি ও জেগে যায়? কিন্তু তাকে তো ঝুঁকিটা নিতেই হবে—নিতে হবে নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই।

সে তার চপ্পল রাখলে খাটের তলায়, তার পর শ্বাস রোধ ক'রে পা টিপে-টিপে সে গেলো সেখানে, বিরস বদনে ঘাগরার আঁচলটা তুলে আরো আস্তে সেটা টেনে নামিয়ে দিলে। একটু দাঁড়িয়েও রইলো, কেমন একটা দোনোমনা ভাব, তার পর পেছন ফিরলো।

ঝট ক'রে, একবারেই, লাজো তাকে পাকড়ে ধরলে! মির্জা বাক্যহীন। জীবনে সে এর আগে এত-বড়ো ভুল আর-কখনও করেনি। সে ধস্তাধস্তি করলে ছাড়া পাবার জন্যে, কাকুতি-মিনতি করলে; কিন্তু লাজো তাকে ছাড়লে তো?

পরদিন সকালে সে যখন লাজোর মুখোমুখি হ'লো, লাজো প্রায় নববধূর মতো রাঙা হ'য়ে উঠল। লাজো, বিজয়িনী, একটা কাজরী গুনগুন ক'রে গাইতে-গাইতে তার হাতের কাজ সারতে লাগলো। রাতের ঘটনার কোনো ছায়াই নেই তার চোখে। মির্জা যখন ছোটোহাজরিতে বসল, সে বসলো দরজার কাছে, যথারীতি, হাওয়া ক'রে মাছি তাড়াতে লাগলো।

সেদিন সে যখন মির্জার দুপুরের খাবার নিয়ে দোকানে গেলো, মির্জা দেখতে পেলে তার চলনে এক নতুন ছন্দ, এক নতুন দোলা জেগেছে। লাজো যখনই দোকানে আসে, লোকে থেমে প'ড়ে দোকানে গিয়ে জিনিশপত্তরের দাম জিগেশ করতে থাকে। মির্জা সারাদিন খেটেও যা বিক্রি করতে পারে না, লাজো তা বিক্রি করে একটুক্ষণের মধ্যেই।

মির্জার চেহারাছিরির বেশ উন্নতি হ'তে লাগল। লোকে অমনি কারণটা আঁচ করতে পারল, আর হিংসেয় টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো। মির্জা কিন্তু এদিকে কেমন একটু ঘাবড়েই গেলো, সারাক্ষণ দারুণ অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলো। লাজো যতই তার দেখাশুনো করে, ততই সে হাবুডুবু খায় তার প্রেমে, আর ততই সে পড়শিদের ভয় পেতে থাকে। এ-মেয়ের কোনোই লজ্জাসরম নেই। যখন সে

তার খানা নিয়ে আসে, সারা বাজারটাই যেন সে আসছে ব'লে দপদপ করে ফুটতে থাকে।

শেষটায় মির্জা একদিন ব'লেই ফেললে, 'আর তোকে আমার খাবার নিয়ে আসতে হবে না।'

'না কেন?' লাজোর মুখটা ঝুলে প্রায় প'ড়ে যায়। সারাদিন একা-একা বাড়িতে থাকতে তার ভারি একঘেয়ে লাগে। বাজারটা বরং বেশ-একটা চনমনে ছুটির মতো—দিনের একঘেয়েমি থেকে বেশ রেহাই পাওয়া যায়।

তার আসাটা বন্ধ করে দেবার পরেই অনেক সন্দেহ এসে হামলা করলে মির্জার ওপর। সে যখন-তখন বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাজির হয় শুধু তার ওপর নজর রাখবার জন্যেই, আর সে তখন তাকে তার এই মনো-যোগের জন্য 'হাতে-নাতে' ইনাম, বকশিশ, পুরস্কার না-দিয়ে ছাড়বেই না!

মির্জা যেদিন তাকে রাস্তার ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে কবাডি খেলতে ধরলো, তার রাগের আর কোনো সীমা রইলো না। লাজোর ঘাগরা উড়ছে হাওয়ায়, ছোঁড়া-গুলো ঐ ঘাগরাতেই তন্ময় হ'য়ে আছে। মিঞা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো, বানানো একটা ঔদাসীন্যে মাথা উঁচু ক'রে। তার অস্বস্তি দর্শকদের দারুণ মজা দিলে।

মির্জা লাজোর অনুরক্ত হ'য়ে পড়ছে। তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার কথা ভাবলেই তার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়। দোকানে আর মন বসাতে পারে না সে। তার ভয় করে, যদি লাজো একদিন তাকে ছেড়ে চ'লে যায়। যাবেই তো।

'মিঞা, ওকে নিকাহ্ ক'রে ফেলছ না কেন?' মিরন মিঞা পরামর্শ দিলে।

'আল্লাহ্ না-করুন!' চেঁচিয়ে বলে উঠল মির্জা। একটা বেসরম বেলাহাজ মেয়ের সঙ্গে সে অমন একটা পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে কীভাবে?

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় লাজোকে বাড়িতে না-দেখতে পেয়ে মির্জার মনে হ'লো সে নিজেই বুঝি হারিয়ে গিয়েছে। অনেক দিন ধ'রেই তাকে-তাকে ছিলো সেই বদমায়েশ লালা। তাকে এমনকী একটা বাংলোও দেবে বলেছে! মিরন মিঞা এমনিতে মনে হয় তার জিগরি দোস্ত—সেও কিনা আড়ালে-আড়ালে লাজোকে প্রস্তাব দিয়েছে।

মির্জা যখন তার আশাই প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, তখন হঠাৎ লাজোর আবির্ভাব হ'লো। সে গিয়েছিলো রাস্তার ওপাশেই—রামুর দিদার কাছে।

সেই দিনই মির্জা লাজোকে নিকাহ্ করবে ব'লে মনস্থির ক'রে ফেললে, তাতে তার বংশের মান-সম্মান-ইজ্জত বাঁচুক চাই না-বাঁচুক।

তার প্রস্তাব শুনে তাজ্জব হ'য়ে গিয়ে লাজো বললে, 'কিন্তু, মিঞা কেন ?'

'নয় কেন ?' সে চ'টে গিয়ে বললে, 'আর-কোথাও ফষ্টিনষ্টি করতে চাস ?'

'ফষ্টিনষ্টি করবো কেন ?'

'ঐ রাওজি তো তোকে একটা বাংলো বাড়ি দেবে বলেছে।'

'ওর বাংলোয় আমি থুতুও ফেলবো না।'

কিন্তু তবু বিয়ে-শাদির যে কী দরকার সেটা আদপেই তার মাথায় ঢুকলো না। সে তো তারই—এখনও, চিরকালই, সারাজীবনই তার। তার মতো প্রভু সহজে মেলে না। মিঞা যে একটি রত্নবিশেষ, আর কেউ না-জানুক লাজো তো সেটা জানে। তার সব আগেকার প্রভুই একদিন-না-একদিন তাকে নিয়ে শুয়েছে—অনিবার্যভাবেই। বেশ ক'রে মজা লুঠে নিয়ে তারা তাকে তারপর মারধোর করেছে, লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। মির্জা কিন্তু সবসময়েই তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে; শুধু যে কোমল আর স্নেহ ভরা ব্যবহার করেছে, তা-ই নয়, সে তাকে বেশকিছু জামাকাপড় আর এমনকী একজোড়া সোনার বালা অব্দি কিনে দিয়েছে। লাজোর বাপের সাত জন্মের কেউ কোনোদিন পাকা সোনার গয়না পরেনি।

মির্জা যখন রামুর দিদাকে তার মৎলবটা খুলে বললে, সেও ভারি অবাক হ'য়ে গেলো। 'মিঞা, থামকা কেন গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধবে ?' সে জিগেশ করলে, 'বেসরম ছুঁড়িটা বুঝি খুব আদিখ্যেতা জুড়ে দিয়েছে ? ক'ষে মার লাগালেই ছুঁড়িটা সজুত হ'য়ে যাবে। যেখানে মার দিলেই চলে, সেখানে থামকা শাদি করবার কথা ভাবছো কেন ?'

কিন্তু মির্জা প্রায় পাগলের মতোই ভাবনাটাকে আঁকড়ে ধরেছে।

'ওরে, ও-ছুঁড়ি, ওরে, শোন, তুই কি ধর্মের তফাৎ নিয়ে ভাবছিস ?' রামুর দিদা লাজোকে জিগেশ করলে।

'না, আমি তো সবসময়েই ওকে আমার পতি ভেবে এসেছি।'

কোনো সাময়িক প্রণয়ীকে লাজো সাময়িক পতি হিসাবেই গণ্য করতো, আর সেইভাবেই কায়মনোবাক্যে তার সেবা করতো। কেউ তার ওপর কখনো কোনো ধনসম্পদ বর্ষায়নি—তবু সে কায়মনে অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। শুধু মির্জাই যে একমাত্র ব্যতিক্রম, সে তো বলাই বাহুল্য। কেবল লাজোই জানে তার সঙ্গে দেয়ানেয়ার খেলায় কত আনন্দ। তার তুলনায় অন্যরা তো একেকটা শুওরের বাচ্চা।

তা ছাড়া বিয়ে তো করে কুমারীরা। সে-দিক দিয়ে ভাবলে তার কি নতুন বউ হবার কোনো যোগ্যতা আছে? সে কাকুতি-মিনতি করলে, অনুনয়-বিনয় করলে, কিন্তু মির্জা একগুঁয়ের মতো জেদ ধ'রে ব'সে আছে, আইনমাফিক নিকাহ্‌র চুক্তিটা ঘটিয়ে ফেলবার জন্যে। সেদিন সন্ধের নামাজের পর নিকাহ্‌ হ'য়ে গেলো। চুটিয়ে পাড়ার মেয়েরা গাইলে বিয়ের গান। মির্জা তার ইয়ারদোস্তদের বহুৎ খানাপিনা করিয়ে আপ্যায়ন করলে। লাজোর নতুন নাম দেয়া হ'লো, কানিজ ফাতিমা, মির্জা ইরফান আলি বেগের বিবি।

মির্জা প্রথমেই নেংটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ক'রে চুড়িদার পায়জামা পরার নির্দেশ দিলে। লাজো এদিকে দুই ঠ্যাঙের মধ্যে খোলামেলা হাওয়া পেতেই অভ্যস্ত। এই নতুন বায়নাক্কা যেটা চাপানো হ'লো, সেটা ভারি বিরক্তিকর। এতে সে কিছুতেই আর অভ্যস্ত হ'তে পারছে না—পারবেও না। একদিন, পয়লা সুযোগেই, সে পায়জামা খুলে ফেলে লেহ্‌ঙ্গা পরতে যাবে, হঠাৎ মির্জা এসে হাজির। ঘাবড়ে গিয়ে লাজো ঘাগরাটা কোমরের কাছে ধরে রাখতে ভুলে গিয়েছিলো—সেটা মেঝেয় প'ড়ে গেলো।

'শয়তান নিক তোকে!' মির্জা কোর্‌-আন থেকে অভিসম্পাত দিয়ে তাড়াতাড়ি তার গায়ে একটা বিছানার চাদর চাপিয়ে দিলে।

তার এই বিরক্তি, এবং অতঃপর তার শ্রীমুখ থেকে যে জমকালো ভাষণ বেরিয়ে এল, লাজো আদপেই তার কোনো মর্ম বুঝতে পারলে না। তার ভুলটা হ'লো কোথায়? এই ক'দিন আগেও তো এই কাজটা মির্জার শ্বাস ঘন ক'রে দিয়েছে—অথচ এখন কিনা এতটাই তার মেজাজ বিগড়েছে। মির্জা লেহ্‌ঙ্গাটা তুলে নিয়ে সত্যি-সত্যি পুড়িয়ে দিলে।

তারপর মির্জা চোটপাট ক'রে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেলো। লাজো হতভম্ব, কিছুই বুঝতে পারছে না: বিছানার চাদরটা গা থেকে খুলে সে নিজের শরীরটা খুঁটিয়ে দেখলে। রাতারাতি কোনো চামড়ার অসুখ বাধিয়ে বসেছে নাকি সে?

বাইরে কলতলায় খোলামেলায় স্নান করতে-করতে সে বারে-বারে চোখের জল মুছতে লাগলো। মিঠোয়া—সে রাজমিস্ত্রির ছেলে—রোজ ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াবার অছিলায় তার নাহানা দেখতো। লাজো আজ মনের দুঃখে এতটাই মুষড়ে পড়েছে যে তাকে সে কাঁচকলাও দেখালে না অথবা চটিজোড়াও ছুঁড়ে মারলে না। বিছানার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে সে অন্দরে চ'লে গেলো।

বুকে ভারি বোঝা নিয়ে সে ঐ লম্বা পাজামায় পা গলালে—শয়তানের নাড়ি-

ভুঁড়ির মতো লম্বা। তার দুঃখকে বাড়িয়ে দিয়ে এদিকে কোমরবন্ধের ফিতেটা কোমরের ভাঁজের মধ্যে হারিয়ে গেলো। সে সাহায্যের জন্ত হাউ-হাউ ক'রে চ্যাচালে। পড়শির মেয়ে জুন্নু এলো আর ফিতেটা হাৎড়ে পাওয়া গেলো। লাজো মনে-মনে ভাবলে, 'সে-কোন্ নৃশংস দুশমন এই বন্দুকঢাকাটাকে মেয়েদের পোশাক ব'লে চালিয়ে দিয়েছে।'

পরে, মির্জা যখন বাড়ি ফিরলো, ফিতেটা আবার কোথায় চম্পট দিলে, লাজো প্রায় মরীয়া হ'য়ে ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে সেটা পাকড়াবার চেষ্টা করলে। তার এই ঘাবড়ে-যাওয়া কাতর ভাবটা দারুণ ভালো লাগলো মির্জার। অনেকক্ষণ ধ'রে যুগ্মভাবে মন দিয়ে হাৎড়াবার পর ফিতেটার খোঁজ পাওয়া গেলো।

কিন্তু মির্জার কাছে এদিকে একটা বেজায় গুড়গুড়ি-দেয়া সমস্যা জেগে উঠেছে। একদিন যা ছিলো লাজোর নেশাধরানো ছেনালিপনা, এখন তা বদলে গিয়েছে বিয়ে-করা বিবির বেসরম দেখানেপনায়। ভদ্র-ঘরের বউয়ের কাছ থেকে কেউ কোনো বেলাহাজ প্রণয়ীর অসভ্যতা আশা করে না। লাজো তার স্বপ্নের বিবি হ'য়ে উঠতে পারলে না—সেই যে-বিবি তার প্রেমের অভিব্যক্তিতে সরমে রাঙা হ'য়ে উঠবে, বিরক্ত হ'য়ে উঠবে তার একটানা আদিখ্যেতায়, তার মনোযোগে যে উদাসীনতা দেখাবে। লাজো তো নেহাৎই কোনো বাঁধানো রাস্তার একটা শানদার খোয়া।

প্রতি পদে বাধা দিয়ে-দিয়ে মির্জা তার আতিশয্য থামিয়ে দিলে, পোষ মানালে তার মধ্যে যা ছিলো বন্য—অন্তত তাই সে ভেবেছিলো। তা ছাড়া এখন আর সন্ধে হ'তেই বাড়ি ফেরবার তাড়ায় সে অমন অধীর হ'য়ে ওঠে না। সব স্বামীদের মতোই সে বেশি সময় কাটায় ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে, নাহ'লে লোকে যে তাকে স্ত্রৈণ বলবে, জরুর গোলাম বলবে।

সে যেহেতু অমন ঘন-ঘন গরহাজির থাকে, মির্জা তাই প্রস্তাব করলে একজন ঝি রাখা যাক। লাজো খেপে বোম। বাঈজিদের কাছে মির্জার যাতায়াত যে আবার শুরু হ'য়ে গেছে, তা সে জানে। সে এও জানে যে মহল্লার সব পুরুষই বাঈজিদের কাছে যায়। কিন্তু নিজের বাড়িতে সে অন্য-কোনো স্ত্রীলোকের উপস্থিতি কিছুতেই সইবে না। আসুক-না কেউ রসুই-ঘরে, চকচকে ঝকঝকে বাসনকোশনগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখুক তো দেখি—লাজো তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে না! সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মির্জাকে ভাগাভাগি ক'রে নিতে রাজি, কিন্তু বাড়িটার শরিকানা সে দেবে না কাউকেই।

মির্জা—মনে হ'লো—লাজোকে সরকারিভাবে বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে বেমালুম

তার কথা ভুলেই গিয়েছে। হপ্তার পর হপ্তা সে শুধু হাঁ হুঁ ক'রে এক কথায় সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। যখন রক্ষিতা ছিলো, সব লোকেরই নজর ছিলো লাজোর ওপর। এখন যখন সে উপার্জন করেছে সরকারি স্বীকৃতি, সে হ'য়ে উঠেছে 'আম্মা, বহিন, লেড়কি'। চটের পর্দার দিকে কেউ এমনকী ভুলেও তাকায় না আর—শুধু বিশ্বস্ত ঐ মিঠোয়া ছাড়া। মির্জা যখন বাড়ি থাকে না সে তখন ঘুড়ি ওড়ায় ছাদে, আর লাজো স্নান করে উঠোনে।

এক রাত্তিরে মির্জা আর বাড়ি ফেরেনি, ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে দশেরা উপলক্ষে ফুর্তি করছিলো। বাড়ি ফিরলো পরদিন সকালে, এসে চটপট গোসল ক'রেই দোকানে বেরিয়ে গেলো। লাজো বেজায় চ'টে গেলো। শুধু তখনই স্নান করার সময় তার চোখ গেলো ছাদে। কিংবা হয়তো সেই দিনই মিঠোয়ার চাউনি তার ভিজে শরীরটাকে হাজারটা বল্লমের মতো বিঁধে গেলো।

হঠাৎ মিঠোয়ার ঘুড়ি কেটে গেলো। ছেঁড়া সুতো থরথর ক'রে ছুঁয়ে গেলো লাজোর শরীর। লাজো চমকে উঠলো। চটপট উঠেই ঘরে ছুটে এলো, আনমনা ছিলো ব'লে, না কি ইচ্ছে ক'রেই, গায়ে তোয়ালে জড়াতে সে ভুলে গিয়েছিলো।

সেই থেকে মিঠোয়াকে সারাক্ষণ মির্জার বাড়ির আশেপাশে দেখা যেতে লাগলো—আঠার মতো লেপটেই আছে। যখনই বাজার থেকে কিছু আনবার দরকার হয়, লাজো চটের পর্দাটা সরিয়ে হাঁক দেয়, 'মিঠোয়া! গোবরের তালের মতো ব'সে থাকিস না! যা, গোটা-কয় কচুরি নিয়ে আয় আমাদের জন্যে।'

তার নাহানার সময় মিঠোয়া যদি ছাদে দেখা না-দেয়, লাজো এমন ঝনঝন ক'রে বালতি নাড়ায় যে কবর থেকেও মড়াগুলো জেগে বেরিয়ে আসতো। যে-প্রেম সে সারাজীবন ধ'রে এমন দরাজভাবে বিলিয়ে এসেছে, এখন তা মিঠোয়ার—সে একটু টু শব্দ করলেই হয়। মির্জা যদি খেতে না-আসে, সে আর কখনও খানা নষ্ট করবে না, বরং গরিব অভাবী কাউকে খাইয়ে দেবে! আর মিঠোয়ার চাইতে অভাবী আর কেই বা আছে?

মির্জার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে লাজো পুরোপুরি ঘরওয়ালি ব'নে গিয়েছে। নিজের চোখে না-দেখলে সে তা বিশ্বাসই করতো না। তাকে দরজার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে লাজো খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। লাজো এমনকী তার সবচেয়ে আজব স্বপ্নেও কল্পনাই করতে পারতো না যে মির্জা এমন খেপে যাবে।

কিন্তু মিঠোয়া জানতো। এক হাতে ধুতিটা আঁকড়ে ধ'রে সে পিঠটান দিলে, দম

নেবার জন্যে থামলে তিন-তিনটে গাঁ পেরিয়ে এসে। মির্জা লাজোকে এমন চাব-কালে যে সে যদি আরেকটু নরম ধাতুতে গড়া হ'তো তো কখন শেষ নিশ্বাস ফেলতো।

মির্জা যে তার বিবিকে মিঠোয়ার সঙ্গে পাকড়েছে, এ-খবরটা দাবানলের মতো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লো। লোকে দলে-দলে এলো মজা দেখতে, এসে ভারি মুষড়ে পড়লো যখন জানা গেলো যে মিঠোয়া অর্থাৎ নাগরটি চম্পট দিয়েছে আর বিবি শুয়ে আছে জ্ঞানহারা। রামুর দিদা এসে তাকে নিয়ে চ'লে গেলো।

কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে অমন মার খাবার পর লাজো বুঝি পুরোপুরি মির্জার ওপর রেগে যাবে। মোটেই না! নিকাহ্ যেটা করতে পারেনি, এই মারটা তাই করলে। বন্ধন আরো জোরালো হ'লো। সাড় ফিরতেই লাজো প্রথমেই জিগেশ করলে মির্জার খবর। তার সব প্রভুই শেষ অব্দি তার নাগর হ'য়ে ওঠে। তাকে বেধড়ক পিটিয়ে মাইনের কথাটা উড়িয়েই দেয়া হয়। বিনামূল্যেই মার খায় সে, মাঝে-মাঝেই। কিন্তু মির্জা সবসময়েই তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। অন্য প্রভুরা মাঝে মাঝে তাকে এমনকী কর্জও দিয়েছে ইয়ারদোস্তদের কাছে, কিন্তু মির্জা তাকে মনে করতো শুধু একান্তই তার ব'লে। সব্বাই তাকে পরামর্শ দিলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে—কিন্তু সে এক পাও নড়লো না।

মির্জা এখন কী ক'রে মুখোমুখি হবে দুনিয়ার? নিজের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে লাজোকে খুন করা ছাড়া আর-কোনো পথই সে দেখতে পেলে না। মিরন মিঞাই তাকে ঠেকালে। 'একটা ফুর্তির জন্যে নিজের গর্দানটা খামকা ফাঁসির দড়িতে গলাবে কেন? তালাক দাও বেশ্যাটাকে—ভুলে যাও ওকে!'

মির্জা তক্ষুনি সেখানেই লাজোকে তিন তালাক দিয়ে ৩২ টাকা দেনমোহর পাঠিয়ে দিলে, সেইসঙ্গে তার জামাকাপড় ও অন্য-সব জিনিশপত্তরও পাঠিয়ে দিলে রামুর দিদার কাছে।

তালাকের কথা শুনে অবশেষে লাজো একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। নিকাহ্‌টাই যত নষ্টের গোড়া। সব দুর্ঘটনাই তার জন্যে ঘটেছে।

'মিঞা কি এখনও খেপে আছে?' রামুর দিদাকে সে জিগেশ করলে।

'তোর দিকে তাকাবেও না একবার। ও চায়, তুই কেটে পড়িস, ম'রে পড়িস ধড়াম!'

মির্জার তালাক দেবার খবরটা সারা গাঁকে কাঁপিয়ে দিলে। লালা ফের খবর পাঠালে: 'বাংলোটা তৈরি আছে।'

'যা, তোর মাকে নিয়ে রাখ্ ওখানে!' চ্যাটাং ক'রে বললে লাজো।

দিন-পনেরো বিছানায় কাটাবার পর লাজো আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালে। মারটা যেন তাকে ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে গেছে, বসন্তে যেমন সব ঝলমল করে; আগের চেয়েও খোলতাই চেহারা হয়েছে তার। একেবারে জলজল করছে। পান কিংবা কচুরি কিনতে বেরিয়ে আস্ত বাজারটাতেই সে যেন তুফান তুলে দেয়।

একবার দু-বার নয়, মির্জা মরলো হাজার বার। একবার সে দেখলে লাজো বানিয়ার সঙ্গে কী নিয়ে যেন ঝগড়া করছে। বানিয়ার জিভ দিয়ে যেন লালা গড়াচ্ছে। মির্জা সকলের নজর এড়িয়ে আলগোছে কেটে পড়লো।

'তুমি কি পাগল হয়েছে, মিঞা? ও কী করে না-করে তাতে তোমার কী? তুমি তো ওকে তালাক দিয়েছো, না কী?' মিরন মিঞা জিগেশ করলে।

'ও তো আমার বিবি ছিলো!'

'হক কথা জানতে চাও? ও কক্‌খনো তোমার বিবি ছিলো না!'

'বাঃ রে! নিকাহ্‌র কী হলো?'

'সম্পূর্ণ বেআইনি!'

'কেমন ক'রে?'

'কোনোদিনই আইনমাফিক হয়নি। ওকে যে কে পয়দা করেছে, তাই কেউ জানে না। তা ছাড়া কোনো বেজন্মার সঙ্গে নিকাহ্‌কে আইন কখনও মানে না।' মিরন মিঞা ঝটপট রায় দিয়ে দিলে।

'তার মানে নিকাহ্‌ই হয়নি কখনও?' মির্জা জিগেশ করলে।

'কক্‌খনো না!' সায় দিলে মিরন মিঞা।

'তাহ'লে আমার মুখে কখনো চুনকালি পড়েনি? বংশের ইজ্জত মান-সম্ভ্রম তাহ'লে বজায় আছে?'

মির্জা দারুণ স্বস্তি বোধ করলে। 'কিন্তু তালাকের তবে কী হ'লো?' উদ্বিগ্ন-ভাবে সে জিগেশ করলে।

'আরে মিঞা, নিকাহ্ না হ'লে তালাকই বা হবে কী ক'রে?'

'যাঃ, ৩২ টাকাই জলে গেলো!' মির্জা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে।

দেখতে-না-দেখতে খবরটা পাড়ায়-পাড়ায় লাফিয়ে ছুটলো যে মির্জা তার 'বিবিকে' কখনও নিকাহ্‌ই করেনি: নিকাহ্ আর তালাক—দুইই ছিলো বেআইনি।

খবর শুনে লাজো আহ্লাদে আটখানা—একেবারে নাচই জুড়ে দিলে। তার বিয়ে আর তালাকের দুঃস্বপ্নটা তাহ'লে কেটে গেলো। যা শুনে সে সবচেয়ে খুশি

হ'লো তা হ'লো এই তথ্য যে মির্জার মুখে কখনোই চুনকালি পড়েনি! তার জন্যে মির্জার মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়েছে ভেবে সে সত্যি দারুণ দুঃখ পেয়েছিলো। 'বেজন্মা হ'য়ে জন্মানোর কত সুবিধে,' সে ভাবলে। ভগবান না-করুন, সে যদি কারো বৈধ সন্তান হ'তো···সম্ভাবনাটার কথা ভাবতেই তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।

রামুর দিদার বাড়িতে লাজোর যেন দমবন্ধ হ'য়ে আসছিলো। বাড়িটার কথা ভেবে তার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। মিঞা কী ক'রে ঝাঁট দিয়ে সাফ রাখবে বাড়ি? তা ছাড়া চোরের ভয়ও আছে। বাড়িটা নিশ্চয়ই দারুণ বিশ্রী হ'য়ে আছে।

একদিন মির্জা যখন দোকানে যাবে, লাজো তাকে রাস্তায় পাকড়ালে।

'মিঞা, কাল থেকে আবার কাজে লেগে যাবো তো?'

'জাহান্নামে যা,' ব'লে মির্জা হনহন ক'রে চ'লে গেলো। 'তবে আমার তো শিগগিরই ঝি লাগবে একজন,' সে ভাবলে, 'তা এই ছুঁড়িই তো হ'তে পারে আর কারু বদলে!'

মির্জা কবে মনস্থির করবে, লাজো সেজন্যে আর সবুর করেনি। ছাদ থেকে সে লাফিয়ে নামলে বাড়ির মধ্যে, লেহ্‌ঙটা তুলে বেঁধে সোৎসাহে কাজে লেগে গেলো।

সেদিন সন্ধেয় বাড়ি ফিরে এসে মির্জার প্রায় শ্বাস রোধ হবার জোগাড়। এ যেন সেই বাঈ আম্মাই ফিরে এসেছেন বেহেস্ত থেকে! ঘরদোর ঝকঝক করছে, সব তকতকে নিকোনো। হাওয়ায় কেমন একটা মৃদু সুগন্ধ। জালাটা জলে ভর্তি, আর তার মুখটায় একটা ঝকঝকে বাটি বসানো।

পিছুটানে মির্জার বুকটা ভারি হ'য়ে গেলো। চুপচাপ নিঃশব্দে সে রোস্টমাংস আর পরোটা খেলে। যথারীতি লাজো চৌকাঠে ব'সে পাখা দিয়ে হাওয়া ক'রে মাছি তাড়ালে।

রাত্তিরে, লাজো যখন রসুই-ঘরের মেঝেয় চটের পর্দা বিছিয়ে শুতে গেলো, মির্জার আবার বেদম জল তেষ্টা পেলো। সে শুধু এপাশ-ওপাশ করলে, শুনতে পেলে তার পায়ের ঘুঙুরের চেতিয়ে-তোলা ঠুনঠুন বোল। ভয় যেন তার বুকটা চেপে ধরেছে, সেইসঙ্গে একটা অপরাধবোধও আছে। তার মনে হ'লো সে ভারি বদ ব্যবহার করেছে লাজোর সঙ্গে, বেচারাকে ভারি ছোটো ক'রে দেখেছে। এক গভীর মনস্তাপ তাকে দখল ক'রে নিলে। শুয়ে-শুয়ে সে নিজেকে অভিসম্পাত দিতে লাগলো।

তার পর আচমকা একটা 'গোল্লায় যাক সব' ব'লে সে উঠে পড়লো, ছুটে গিয়ে মাদুরের ওপর তুলে নিয়ে এলো ঘরওয়ালিকে।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তো হয়

লুসিও রডরিগস

এপ্রিল মাস। আবারও ফিরে গরম পড়েছে।

গাঁয়ের কূপগুলো সব শুকিয়ে গেছে। শুকনো খাঁ-খাঁ ফাঁকা মাটি, এককোঁটা জলের জন্যে যেন হাহাকার করছে। মাটির শুকনো ভাঁজগুলো অপেক্ষা ক'রে আছে কখন পড়বে বীজ, কখন নামবে গা-জুড়োনো বৃষ্টি। কবে জীবনের রস লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠেছে গাছে আর মানুষজনের মধ্যে, আমে আর নারকেলে, 'বটকারদের' মধ্যে। আর 'মান্দুকারদের' মধ্যে।

ভোরবেলাটা ঝকঝক করছে আলোয়, এখনও তাত নেই রোদের।

কূপের মুখটার ওপর ঝুঁকে গিলের্মে ছোটো-ছোটো ঢিল ফেলছিলো জলে, দেখছিলো কেমন ম্যাজিকের মতো গোল বৃত্তগুলো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে যায়, আর ব্যাঙগুলো ভয় পেয়ে হঠাৎ-হঠাৎ লাফিয়ে স'রে যায়। তরুণ যুবক গিলের্মে বড়োলোক এক বটকারের ছেলে, এখন পাঞ্জিম থেকে ছুটিতে গাঁয়ে এসেছে, গত সাত বছর ধ'রে পাঞ্জিমেই সে পড়াশুনো করছে।

'ভগবান তোমার দিনটা যেন ভালো দেন, বাবাসিন,' কার একটা নরম গলার স্বর তাকে সম্ভাষণ জানালে।

মুখ তুলে সে দেখতে পেলে তারই বয়সী একটি মেয়ে, যে-আঁটসাঁট স্থিতির ফ্রকটা প'রে আছে তা থেকে তার শরীর যেন উপচে ফেটে বেরুচ্ছে। কূপের পাশে মেয়েটি দুটো ফাঁকা কলস রাখলে, তারপর দড়ির কুণ্ডলিটা খুলতে লাগল। গিলের্মে মুগ্ধের মতো তার ভরপুর যৌবনের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেমনভাবে কোনো বাচ্চা ছেলে তাকায় গাছের উঁচু ডালে ঝুলে-থাকা পাকা আমের দিকে, লোলুপ চোখে। মেয়েটি বোধকরি তার চাউনি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে থাকবে, কারণ সে তার কালো চোখ দুটি নামিয়ে ছোট্ট কলসটার মুখে তাড়াতাড়ি দড়ি বেঁধে নিলে। যেন আদর ক'রেই তার সারা শরীরের ওপর আলতো ক'রে বুলিয়ে গেলো গিলের্মের চোখ···টশটশে ঠোঁট দুটি, পাকা আমের মতো গালের জলজলে সোনা রং··· সুগোল রোদে-পোড়া বাহু···আর উঁচু-উঁচু আহ্বান-জানানো বুক···

মেয়েটি খালি পায়েই কূপের ধার ঘেঁষে এলো, আর ছোটো কলসটা নামিয়ে দিলে কূপের মধ্যে, দুই পা ফাঁক ক'রে সে দাঁড়িয়ে আছে পাশটায়, এমনভাবে যে তার টান-লাগা ঘাগরার তলা থেকে উরু দুটো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে একটু ঝুঁকে দড়ি ধ'রে হ্যাঁচকা টান দিলে, যাতে কলসটা একপাশে হেলে যায় আর জল ঢোকে। কালো তেল-চকচকে চুল, মাঝখান দিয়ে সিঁথি-করা, আর পেছনটায় আঁটো ক'রে খোঁপা বাঁধা। ফ্রকের বুকের কাছটা ঝুঁকে পড়ার জন্যে খুলে গিয়েছে, গিলের্মের চোখের সামনে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে দুই স্তনের মধ্যবর্তী উপত্যকার পুরোভাগ।

ঢক-ঢক ক'রে জল ঢুকলো কলসে। বাঁ হাতে দড়িটা ধ'রে মেয়েটি তার কনুই রাখলে বাম উরুতে, তারপর আরো ঝুঁকে প'ড়ে—আর তাতে তার জামার সামনেটা আরো খুলে গেলো, স্পষ্ট দেখিয়ে দিলো তার ভরাট স্তনের শ্যামল বঙ্কিমা—আস্তে দড়ি টানলে। ভরাট সুগোল স্তন দুটি গিলের্মের চোখের সামনে যেন লুকোচুরি খেলছে, আর মেয়েটি ডান হাত বাড়িয়ে দড়ি টেনে ওপরে তুলে আনছে কলস।

বড়ো কলসটায় জল ঢেলে মেয়েটি আবার ছোটো কলসটিকে কূপের মধ্যে নামিয়ে দিলে। আবার···

ছোটো কলসটার মুখ থেকে সে দড়ির ফাঁসটা খুলে নিলে, তারপর তা থেকে একটু জল পাশে ঢেলে দিয়ে, টেনে তুললো সেটা বাম কাঁখে, তার বাঁ হাত জড়িয়ে রইলো কলসের গলা। আর অন্য কলসটা ডান কাঁধে তুলে কূপ থেকে ঘুরে একবার তাকালেও পলকের জন্যে তার দিকে। গিলের্মের চোখ তাকিয়েই রইলো তার চলার ছন্দের দিকে···

এ-দিনটায় নারকোল পাড়া হবে।

গিলের্মে ব'সে আছে একটা আম গাছের ছায়ায়। বড়ো-বড়ো তালগাছগুলো এমনভাবে হাওয়ায় নেচে উঠেছে যেন গাঁয়ের মেয়েরা কাঁখে জলের কলস নিয়ে চলেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে সরসর ক'রে ছুটে যাচ্ছে হাওয়ার দমকা, আর মাটি চমৎকার নকশার মতো সেজে আছে আলোছায়ায়।

দৃশ্যটা দেখবার মতো। পুরুষরা তরতর ক'রে অনায়াসে বেয়ে উঠছে নারকোল গাছে, একটার পর একটা, সার-সার, আর ভারি কাটারি দিয়ে কুপিয়ে নামাচ্ছে নারকোলগুলি। তাদের কালো শরীরগুলো গ্রীষ্মের রৌদ্রে ঝকমক ক'রে উঠছে। জায়গাটা একটু পরেই শয়ে-শয়ে নারকোল পাতা আর নারকোলে ভ'রে গেলো।

নারকোল আর তাল গাছের ছায়াগুলো আস্তে-আস্তে ছোটো হ'য়ে এলো,

গরমও বেড়ে উঠলো। গিলের্মে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলো যেখানে কয়েকটি মেয়ে নারকোল পাতা আর নারকোলগুলো আলাদা-আলাদা ক'রে জড়ো ক'রে রাখছিলো। মেয়েদের একজন হ'লো সেই মেয়েটি যে তাকে একটু আগে কূপের ধারে শুভদিন জানিয়েছিলো। একটু দূর থেকে সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কেমন ক'রে মেয়েটি নারকোলগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে : তার নমনীয় শরীর ঝুঁকে পড়ে, খাড়া হয়, কয়েক গোছা কালো চুল ওড়ে হাওয়ায়।

'আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, বাবাসিন,' বললে জাকি আনটন, তার দিকে এগিয়ে এসে। আনটন হলো 'মুখদম'। 'যা গরম পড়েছে।' আরো জুড়ে দিলে সে।

'আগো ফিলস্থু,' সে হেঁকে বললে, 'তোর বাবাকে বল বাবাসিনের জন্যে দুটি কচি ডাব পাড়তে। তারপর চটপট এখানে নিয়ে আয়।' তারপর গিলের্মের দিকে ফিরে বললে, 'কচি ডাবের জল ভারি ভালো লাগে গরমে। বটকার বাব যখনই আসেন, কখনও ডাবের জল খেতে ভোলেন না।'

মেয়েটি পরক্ষণেই দুটো কচি ডাব নিয়ে এলো, তারপর উবু হ'য়ে ব'সে ডাব দুটোর ওপরকার সবুজ ছোবড়াটা কেটে নিলে গোড়ায়, ভেতরের মালাটা বড়ো আর গোল, সে একদিকে একটা ফুটো ক'রে দিলে, তারপর ডাবটাকে উপুড় ক'রে একটা গেলাশে ঢেলে দিলে জল।

সত্যি, ডাবের জলের স্বাদের তুলনা হয় না, মিষ্টি জল, একটু কষা ভাব মেশানো, আর জল খেতে-খেতে গিলের্মে তাকালে মেয়েটির দিকে, ফিলস্থুর দিকে ; ফিলস্থু দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, একটু লাজুক ভঙ্গি তার, একটু আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতারও ভঙ্গি, ভাবটা, যেন এসো না দেখি, হাতে দুটো কচি ডাব, ফুটো করা। ডাবের শাঁসগুলো নরম, তার জিভের ডগায় তা জেলির মতো গলে গেলো, আর গিলের্মের মনে হ'লো তার মুখে যেন ফিলস্থুরই টশটশে ঠোঁট দুটির স্বাদ।

'বটের পাশেই ঐ যে গুদোমঘরটা,' জাকি আনটন বললে, একটা চৌকো টালি-ছাওয়া-পাথরে তৈরি ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে। 'আপনি ইচ্ছে করলে ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন—অবশ্য কিছু শুকনো নারকোল ছাড়া ওখানে আর-কিছু নেই। আমাকে এবার এই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হবে—এরা নারকোল আর নারকোল পাতা কিনতে এসেছে।'

ডাবের জল খাবার পর গিলের্মের নিজেকে বেশ সতেজ লাগছিলো, সে ভাবলে একবার গিয়ে গুদোমটা দেখবে ; আস্তে-আস্তে সে এগিয়ে গেলো সেদিকে।

চৌকাঠে এক ঝলক দাঁড়িয়ে সে পরক্ষণেই ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ঘরটা অন্ধকার, গোড়ায় কিছুই সে দেখতে পারছিলো না, কিন্তু আস্তে-আস্তে চোখ স'য়ে এলে সে দেখতে পেলে তার ডান দিকে শুকনো কিছু নারকোল স্তূপ ক'রে রাখা। ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে সরু কতগুলো আলোর ধারা আসছিলো, দেখা গেলো দেয়াল থেকে ঝুলছে মাকড়শার জাল। ঘরটা তাকে মনে করিয়ে দিলে পুরোনো গোয়ার ক্যাথিড্রালগুলোর মাটির তলার ঘরগুলো। বেরিয়ে আসার জন্যে সে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পেলে দরজায় ফিলস্থ দাঁড়িয়ে আছে সটান, যেন ফ্রেমে-আঁটা একটা ছবি। তার মাথায় একটা চওড়া ঝুড়ি, তার বুকটা উঠছে-নামছে, আর তার গ্রীবা যেন কোনো দেবীর মতো মসৃণ, টান-ধরা। এক ঝলক দাঁড়িয়ে থেকে সে মাথা থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে দুই হাতে ধ'রে রইলো।

'আপনি কি বেরিয়ে আসবেন না, বাব?' সে জিগেশ করলে।

গিলের্মে ডান দিকে একটু স'রে দাঁড়ালে, যাতে ফিলস্থ ঢুকতে পারে। ভেতরে খুব কমই ফাঁকা জায়গা, কারণ নারকোলের স্তূপ প্রায় দরজা অব্দিই গড়িয়ে এসেছে। ফিলস্থর সঙ্গে-সঙ্গে একটা জোরালো নেশা-ধরানো সুঘ্রাণও যেন ঢুকে পড়েছে ঘরে, কেমন ঝিম ধরিয়ে দিয়েছে সারা ঘরে। তার ঘামে-ভেজা কপালে এলোমেলো প'ড়ে আছে দু-এক গোছা চুল, তার ভেজা বগলের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে ঘামের গন্ধ।

'দেখবেন, বাবাসিন, নারকোলগুলো গড়িয়ে পড়বে!' ফিলস্থ বললে।

'ঠিক আছে,' গিলের্মে বললে, তার গলায় কেমন একটা কাঁপন।

ফিলস্থর মাথা থেকে কাপড়ের একটা কুণ্ডলি মেঝেয় প'ড়ে ছড়িয়ে খুলে গেলো গিলের্মের পায়ের কাছে। ফিলস্থর নিশ্বাস কেমন ঘন হ'য়ে এসেছে। ঘুলঘুলি থেকে আলোর একটা রেখা পড়েছে তার ওপর, শরীরের নিচের দিকটা ছায়ায় ঢাকা, আর এই প্রতিতুলনাতেই আরো ফুটে উঠেছে তার স্তনের উৎসার। মাথার কাপড়টা তোলবার জন্যে সে ঝুঁকে পড়লো। গিলের্মের গায়ে যেন রক্ত ফুটছে টগবগ ক'রে, সে এক পা এগিয়ে এলো, আর তার কোমরে দু-হাত জড়িয়ে তাকে টেনে আনলে বুকের কাছে। ফিলস্থর শরীরটা গরম, যেন ভাপ বেরুচ্ছে। একটু সে কুঁকড়ে গেলো গোড়ায়, এক ঝলক শুধু, আর গিলের্মে তার ভিজে মুখটা টেনে ঘুরিয়ে কাছে এনে তার লোনা টশটশে ঠোঁটে সজোরে চুমু খেলে, তার বুকে তাকে সজোরে চেপে।

'বাবাসিন,' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে ফিলস্থ অনুনয় করলে, 'যেতে দিন আমায়। আমাকে বাকি নারকোলগুলোও নিয়ে আসতে হবে।'

অন্ধকার, গরম একটা গ্রীষ্মের রাত।

নরম খড়ের ওপর পরস্পরকে কাছে জড়িয়ে ঘন হ'য়ে তারা শুয়ে আছে—হু-পাশে দুটি খড়ের গাদা। অন্ধকার যেন মোলায়েমভাবে ঢেকে রেখেছে তাদের। জুঁই আর নিমের গন্ধ যেন ফিলসুর চুলে, খড়ের গন্ধের সঙ্গে তা যেন মিশে গিয়েছে। তারা শুয়ে আছে অন্ধকার কোনো খাদে যেন, আর আকাশ নেমে এসেছে নারকোল গাছগুলোর কালো-কালো চূড়ায়, আর পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ঝিকমিক করছে তারা, যেন বর্ষার দিনের জোনাকিরা একটা চাঁদোয়া বানিয়ে দিয়েছে নীলে-কালোয় আর রুপোয়। একটা পাতাও নড়ছে না গাছে।

আর সেই স্তব্ধতায় গিলের্মের শরীর যেন ফিলসুর শরীরের সঙ্গে গাঢ় অন্তরঙ্গ কিছু কথা কইছে, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ আর কম্পনের ভাষায়। ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, খুঁজে-খুঁজে, এ ওকে তাতিয়ে দিয়ে, শিউরে-শিউরে উঠে শরীর দুটোয় যেন উল্লাস আর সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ফিলসুর কুমারী দেহের শ্যামল বনানী যেন গিলের্মের স্পর্শে মঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে আর তৃপ্ত কোনো মালির মতো গিলের্মে যেন ছুঁয়ে দেখছে তার ঠোঁটের মাধুরী ও সৌন্দর্য, তার গালের গোলাপি আভা, তার স্তনের ফুটে-ওঠা পাপড়ি ছড়ানো ডালিয়াগুলো, তার তলপেটের শ্বেতপদ্ম, তার দুই বাহু আর উরুর নলিনীর মতো মৃণাল, তার উরুসন্ধির কালো প্রস্ফুটিত ফুল।

আর তার পরিব্রাজক ঠোঁট আর আঙুল হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখলো মেয়েটির শরীরের মানচিত্র, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠলো মাথা-ঘোরানো কোন শূন্যতায়, খুঁজে-খুঁজে নামলো উষ্ণ গন্ধমধুর উপত্যকায়, সুগোল মসৃণ সব বঙ্কিমা আর আঁটো কঠিন সব কিনার, স্বপ্ন দেখলো দীঘল নিস্পন্দ কোন তৃণভূমিতে, ফিরে-ফিরে এলো চেনা পথগুলো ধ'রে, আর ধীরে-ধীরে, প্রায় পুজোর ভঙ্গিতে খুঁজে বেড়ালো অন্ধকার সেই গোপন বেদি যেখানে লুকিয়ে আছে কামের অন্তহীন রহস্য।

আর গিলের্মে যতই হাৎড়াচ্ছে, ধমনীতে তার রক্ত ফুটছে টগবগ, যেন ছুটে ব'য়ে যাচ্ছে প্রধান ধারা বেয়ে, আর তার সারা শরীর লাফিয়ে উঠলো ফুলে-ওঠা উচ্ছ্বসিত জোয়ারে, আর তার ধনুকের মতো বাঁকানো শরীর থেকে ছুটলো কামনার শিখাপ্রোজ্জ্বল সব তীর, খুঁজে বেড়ালো লক্ষ্য, চাঁদমারি, নিশানা, হলের মতো ফুঁড়ে ঢুকলো উর্বর শ্যামভূমি, যতক্ষণ-না তার ভেতরকার ঘনিয়ে-আসা তুফান ফেটে পড়লো মরশুমি ধারায়, ভিজিয়ে গেলো বীজ, ভাসিয়ে দিলো সব, নিঃশেষ ক'রে দিলো নিজেকে, আর পেছনে রেখে গেলো এক আশ্চর্য স্তব্ধতা, অদ্ভুত শান্তি,

অবসন্ন ও পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আচ্ছন্ন এক ঘোর।

আর নারকোল পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করতে লাগলো আকাশের তারা, যখন প্রকৃতির এই দুই শিশু অবসাদে ভ'রে গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে রইলো রাতের অন্ধকারে।

...

ভ্যাপসা একটা দুপুর। দিনটা যে মাসের শেষে।

তিনটি শাড়ি-পরা স্ত্রীলোক মাপুকার শুক্রবারের মেলা থেকে ফিরছিলো, মাথায় বেতের ঝুড়ি, পিঠ নুয়ে আছে ভারে, তারা বেয়ে উঠছে টিলা। ওপরে উঠে তারা একটা বড়ো আমগাছের তলায় বসলো, তরমুজ ফালি ক'রে দিলে পরস্পরকে।

প্রথমা : 'মারি কনসাও-এর মেয়ের কীর্তির কথা তোমরা শুনেছো?'

দ্বিতীয়া (সাগ্রহে) : 'কোন মারি কনসাও?'

প্রথমা : 'বস্তিআওয়ের বউ। তার মেয়ে শুনছি বড়ো শিকার পাকড়াতে চাচ্ছে।'

দ্বিতীয়া : 'ও, ঐ ফিলমু! সেদিন পাসাকিন তার সম্বন্ধে কী যেন বলছিলো। কিন্তু আমি তা ধর্তব্যেই আনিনি। (সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, ফিশফিশ ক'রে) বটকারের ছেলে তো?'

প্রথমা (ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে) : 'ওরা বলছিলো জোসেমার না কি একদিন রাত্তিরে দুজনকে একসঙ্গে দেখেছে। শোনা যায় প্রায়ই নাকি রাতে ওরা দেখা করে।'

দ্বিতীয়া : 'ভগবান কৃপা করুন! অ্যাঁ! জল অ্যাদ্দুর গড়িয়েছে! আমি চিরকালই বলেছি ঐ ছুড়ির আখেরে ভালো কিছু নেই।'

তৃতীয়া : 'মেয়েরা একটু বড়ো হ'লেই বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত। এ-মেয়ে তো ডাগর হ'য়ে উঠেছে—যে-কোনো ছোকরারই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারে।'

প্রথমা : 'কিন্তু ইঁদুররা কেন লোহা নিয়ে খেলবে? যদি কিছু-একটা হয় তবে কার ক্ষতি হবে বলো? কে তখন কষ্ট পাবে?'

দ্বিতীয়া : 'আমাদের এই মেয়েগুলোও হয়েছে তেমন! বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। সহজেই ফাঁদে প'ড়ে যায়, তারপর সারা জীবন ধ'রে কাঁদে। গরিবগুরবোদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে তো আর পোমবুরপা পরবের ভোজ নয়।'

তৃতীয়া : 'বটকার বাঈয়ের কানে গেলেই হয়েছে—মারি কনসাওয়ের ছাল একেবারে ছাড়িয়ে নেবে।'

দ্বিতীয়া : 'ছাল ছাড়াবে ? হুঁ ! কুচি-কুচি ক'রে কেটে নুন মাখাবে !'

তৃতীয়া : 'মারি কনসাও এ-কথা জানে ? তাকে কারু সাবধান ক'রে দেয়া উচিত।'

প্রথমা : 'সকলেই জানে। কিন্তু মারি কনসাও একটুতেই হাল ছেড়ে দেয়। লাই দিয়ে-দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছে, এখন ফল বুঝুক। ডাগর হবার আগেই মেয়েগুলোকে বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত।'

তৃতীয়া (তরমুজের ফালিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত আর মুখ মুছে) : 'চলো, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।'

সবাই যে যার ঝুড়ি মাথায় চাপিয়ে তপ্ত ধূলিধূসর রাস্তা বেয়ে বাড়ির পথ ধরলে। ...

তার দিবাস্বপ্ন থেকে তাকে এক হ্যাঁচকা টানে জাগিয়ে দিলে তার মায়ের তীক্ষ্ণ কর্কশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। সে প্রভাতি কাগজটা চেয়ারে রেখে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে গভীর মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করলে। মা কাকে যেন ভীষণ বকছেন। যেখান থেকে আওয়াজ আসছে, আস্তে চুপিসাড়ে সে সেদিকে এগিয়ে গেলো। ক্রুদ্ধ সব কথার একটা তোড় তার কানে এসে পৌঁছুলো।

'নিজের মেয়েকে যদি শামলে রাখতে না-ই পারিস, তবে তার বিয়ে দিয়ে দিস না কেন ?'

গত ক-দিন ধ'রেই মায়ের গম্ভীর চুপচাপ ভঙ্গিটা তাকে মায়ের সামনে এলেই কেমন ঘাবড়ে দিতো ; তাই সে যদ্দুর সম্ভব দূরে-দূরে থাকবার চেষ্টা করেছে। সারাক্ষণ বই আর কাগজে আশ্রয় নিয়েছে। আর এখন মা সব খোলাখুলি ব'লে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ফিলসুর মা, সে ভাবলে।

'তোদের চিরকালই এইরকম। যদি একটু বিশ্বাস করি, অমনি ফিকির বুঝে মাথায় চেপে বসিস। তোদের নিজেদের তো লাজলজ্জার কোনো বালাই নেই—তাই ভাবিস আমাদের বু'ঝি কোনো মানসম্মান ইজ্জত নেই। তোদের নিয়ে তো আর লোকে হাসবে না। তোরা তাড়ি বানাস, ফেনি বানাস, ভাবিস বুঝি সবাই তোদেরই মতো। তোর মেয়েকে বম্বাই পাঠিয়ে দে-না কেন ? রাস্তায়-রাস্তায় প্রচুর লোফার আছে, তাদের সঙ্গে ভালোই মানাবে—এখানে ভদ্রলোকের ছেলেদের পেছন নেয় কেন ? তোর ঐ নাকি-কান্নায় কোনো ফায়দা হবে না। ও-সব কায়দা আমি ভালোই জানি, ওতে আমি ভুলছিনে। তোর মেয়েকে এখান থেকে কোথাও পাঠিয়ে দে—না-হ'লে আমাদের জমি থেকে তোদের সবাইকে

উৎখাত করবো। ওর মতো কোল্‌ভস্ট, ওর মতো ছেনালকে গায়ে দাগা দিয়ে ন্যাংটো ক'রে গলায় ষাঁড়ের মাথার খুলি ঝুলিয়ে সারা গাঁয়ে ঘুরিয়ে দেখানো উচিত—'

ফিলম্বর মা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলো।

...

পরদিন গিলের্মের বাবা তাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

'তোর জন্যে একটা চমক আছে, জানিস। তোর পড়াশুনোর জন্যে চিরকালই তোকে লিসবন পাঠাবার কথা আমি ভেবেছি। কিন্তু তোর মা কিছুতেই কথাটা শুনতে চাইতো না। এখন, অ্যাদ্দিন বাদে, অবশেষে তোর মা মত দিয়েছে। আমরা ঠিক করেছি যত শিগগির সম্ভব তুই লিসবন রওনা হ'য়ে যাবি। আগামী মাসে একটা জাহাজ ছাড়ছে, শুনেছি। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে রাখছি। কী, তুই খুশি হোস্‌নি?' বাবা মুখ-চোখ আলো ক'রে তার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, বাবা,' খুশি দেখাবার চেষ্টা ক'রে সে বললে।

অতটা সে আশা করেনি। তার মা তার হঠাৎ প্রেমকে চুরমার ক'রে ফেলবার জন্যে তাড়াহুড়ো ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। লিসবন···স্বপ্নের দেশ।

অবশ্য ফিলম্বর সঙ্গে এক্ষুনি একবার দেখা করা উচিত। কিন্তু পরদিন সে আর কূপ থেকে জল নিতে এলো না। সকালেও না, বিকেলেও না। রাত্তিরে সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো, যেখানটায় তাদের দেখা হয় সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করলো। মিথ্যেই। দু-দিন পরে সে শুনতে পেলে ফিলম্বু গ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সেদিন অনেক রাতে সে যখন বিছানায় শুয়ে আছে, অন্তরঙ্গ নিবিড় রাত-গুলোর স্মৃতি ভিড় ক'রে এলো তার মনে, উষ্ণ খড়, তার চুলের জুঁই গন্ধ, তার গায়ের গন্ধ—সব সমেত। কোনো ইন্দ্রিয়ময় স্বপ্নের মতো সে ভেসে রইলো তার স্বপ্নে।

আর এখন সে চ'লে গেছে কোথায়। তার, গিলের্মের, আছে শুধু স্মৃতি আর একটা অভিজ্ঞতা। আর লিসবন···

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রুদালী

মহাশ্বেতা দেবী

টাহাড় গ্রামটিতে গঞ্জু ও দোসাদরা সংখ্যাগুরু। শনিচরী জাতিতে গঞ্জু। গ্রামের আর-সকলের মতো শনিচরীর জীবনও কেটেছে অগুমার দারিদ্র্যে। শনিবারে জন্মেছিল ব'লে ওর কপালে এত দুঃখ, এ-কথা একদিন ওর শাশুড়ি বলত। যতদিন বলত, তখন শনিচরী ছিল বউ। মুখ তেমন খোলেনি। শাশুড়ি যখন মরে তখনও শনিচরী বউমানুষ। শাশুড়িকে জবাবটা ওর দেওয়া হয়নি। এখন মাঝে-মাঝেই ওর কথাটা মনে পড়ে। একা, আপন মনে ও বলে, 'ওঃ! শনিবারে জন্মালে শনিচরী নাম হয়, বউ অপয়া হয়। তুমি তো সোমরি ছিলে, কোন সুখে জীবনটা কাটল? সোমরি,বুধুয়া, মুংরি, বিস্‌রি—কার জীবনটা সুখে কাটে?'

শাশুড়ি মরতে শনিচরী কাঁদেনি। ওর বর আর ভাশুর, শাশুড়ির দুই ছেলেকেই হাজতে পুরেছিল মালিক-মহাজন রামাবতার সিং। একটাল গম চুরি যেতে রামাবতার এমন খেপে যায়, যে পাহাড়ের যত দুসাদ, যত গঞ্জু পুরুষ, সকলকেই দেয় জেলে পুরে। শাশুড়ি শোথজ্বরে ভুগে-ভুগে, 'খেতে দে! খেতে দে!' বলতে-বলতে, 'হা অন্ন!' 'জো অন্ন!' বলতে-বলতে ম'রে গিয়েছিল হেগেমুতে। ঝিমঝিমে বর্ষার রাত ছিল। শনিচরী আর তার জা মিলে বুড়িকে মাটিতে নামিয়েছিল। রাত পোহালে দোষ লেগে যাবে, ঘরে নেই একখুঁচি গম, প্রায়শ্চিত্তের কড়ি আসবে কোথেকে? রাতের মড়া যাতে রাতে বেরোয় সেজন্যে শনিচরীই সেই বর্ষার রাতে প্রতিবেশীদের ডাকতে বেরিয়েছিল। হাতে-পায়ে ধ'রে সকলকে আনতে, বুড়িকে দাহ করবার ব্যবস্থা করতে শনিচরী এত ব্যস্ত ছিল, যে কাঁদবার সময় হয়নি! হয়নি তো হয়নি! বুড়ি যে-জ্বালান জ্বালিয়ে গেছে, কাঁদলেও তো শনিচরীর আঁচল ভিজত না।

বুড়ি একলা থাকতে পারত না জীয়ন্তে। ম'রেও একা থাকতে পারেনি। তিন বছর যেতে-না-যেতে ভাশুর, জা সবাই সাফ। রামাবতার সিং তখন গ্রাম থেকে দুসাদদের, গঞ্জুদের তাড়াবে ব'লে উঠে প'ড়ে লেগেছে। তাড়িয়ে দেবে রামাবতার, সেই ভয়েই শনিচরী তখন কাঁটা হ'য়ে থাকত। ভাশুর আর জা মরতেও

কাঁদা হয়নি। কাঁদবে, না লাশ জ্বালাবার, শস্তায় শ্রাদ্ধ সারবার, কথা ভাববে? এ-গ্রামে দুঃখী মানুষ সবাই। প্রতিবেশীর দুঃখ বোঝে। তাই টকদই, ভুরা চিনি আর ভেজা চিড়ে পেয়ে খুশি হ'য়ে যায়। শনিচরী আর ওর বর যে কাঁদেনি, তাতেও সবাই বলে, 'কাঁদতে কি পারে এখন? তিন বছরে তিনটে মরল। চোখের জল বুকে পাথর হ'য়ে জ'মে যাচ্ছে!'—শনিচরী মনে-মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। মালিক-হুজোরের খেত ঠেঙিয়ে যে-খুদকুঁড়ো আনা, তাই এতগুলো মানুষের সম্বল। দুটো মানুষ মরল, ভালো হ'লো। নিজেরা পেট ভ'রে খাবে!

স্বামী মরতে কাঁদবে না, তা তো ভাবেনি শনিচরী! অথচ, এমন কপাল ওর, ঠিক তা-ই ঘটল। তখন ওদের একমাত্র ছেলে বুধুয়া বছর ছয়েকের। শনিচরী ছেলেকে ঘরে রেখে অসীম উদ্যমে, সংসারটা বেঁধে তোলবার জন্যে, চ'লে যায় মালিকের বাড়ি। দমাদম কাঠ চ্যালা ক'রে দেয়, গোরুর ঘাস এনে দেয়, ফসলের মৌশুমে স্বামীর সঙ্গে খেতে গিয়ে ফসল কাটে। ভাশুরকে-তার-শ্বশুরের-দেওয়া জমিটুকুতে ঘরখানা সবে তুলেছে দুজনে। দেওয়ালে শনিচরী চিত্র এঁকেছে। উঠোনে বেড়া দেবে বুধুয়ার বাপ, উঠোনে লঙ্কা-বেগুন আবাদ করবে। শনিচরী হুজুরের কাছ থেকে বকনা বাছুর পালানি নেবে, সব ঠিক। শনিচরীর বর বলল, 'চল, তোহরিতে বৈশাখী মেলা দেখে আসি। শিবঠাকুরকে পুজাও দেবো। সাতটা টাকা তো জমেছে।'

মেলা খুব জমেছিল। বড়ো-বড়ো রহীস লোকরা শিবের মাথায় ঢালছিল ঘড়া-ঘড়া দুধ। সেই দুধ কয়েকদিন ধ'রে মাটিকাটা চৌবাচ্ছায় জমছিল। টক দুর্গন্ধ উঠছিল দুধ থেকে, মাছি ভনভন করছিল। পাণ্ডাকে টাকা দিয়ে সেই দুধ গেলাশ-গেলাশ খেয়ে অনেকের হায়জা হয়, অনেকে মরে। বুধুয়ার বাপও মরেছিল হায়জায়। তখনও আংরেজরাজ। গোরমেনের লোক সব হায়জা রোগীকে টেনে-টেনে হাঁসপাতালের তাঁবুতে নিয়েছিল। তাঁবু মাত্র পাঁচটা। রুগী ষাট-সত্তর জন। তাঁবুর চারদিকে ছিল কাঁটাতারের বেড়া। শনিচরী আর বুধুয়া বেড়ার এ-পাশে বসেছিল। ব'সে-ব'সেই শনিচরী জেনে যায়, বুধুয়ার বাপ ম'রে গেল। কাঁদতে সময় দেয়নি গোরমেনের লোক। লাশগুলো তারাই জ্বালায়। শনিচরী আর বুধুয়াদের টেনে নিয়ে গিয়ে হাতে কলেরার সুঁই দেয়। তাতে যা ব্যথা হয়, সেই ব্যথাতেই মা-ছেলে খুব কাঁদে। কাঁদতে-কাঁদতে শনিচরী বুরুডা নদীর তিরতিরে জলে স্নান ক'রে মেটে সিঁদুর মুছে, হাতের চুড়ি ভেঙে, গ্রামে ফেরে। গালার চুড়িগুলো নতুন। মেলায় গিয়ে পরেছিল। তোহরিতে শিবমন্দিরের

এক পাণ্ডা বলে, 'এখান থেকে আগুপিণ্ড দিয়ে যা। বিভুঁয়ে এসে মরল বুধুয়ার বাপ।'—তার কথাতে পাঁচসিকে দক্ষিণা দিয়ে বুধুয়ার হাত দিয়ে বালি আর সত্তুর পিণ্ড দেওয়ায় শনিচরী। কিন্তু তা নিয়ে কি গ্রামে কম ঝড় উঠেছিল? মোহনলাল ব্রাহ্মণ, রামাবতারের স্থাপিত বিগ্রহের সেবক, সে বলেছিল, 'ওঃ! বালির পিণ্ডি নদীর জলে! বুধুয়া যেন রামচন্দ্র। বালি দিয়ে দশরথের পিণ্ড দিচ্ছে!'

—'বরাম্ভোন বলল যে!'

—'তোহরির ব্রাহ্মণ জানবে টাহাড়ের মানুষের কিরিয়াকরণের নিয়ম? তার কথায় পিণ্ডি দিয়ে তুই আমার মাথাটা হেঁট ক'রে দিয়ে এলি তো?' মোহনলালকে তুষ্ট করতে, রামাবতারের কাছে 'পাঁচবছর খেত-বেগারি খেটে পঞ্চাশ টাকা শোধ করব' খতে টিপসই দিয়ে কুড়ি টাকা নিতে, সে-টাকায় বুধুয়ার বাপের শ্রাদ্ধ করতে, শ্রাদ্ধ মিটতে কচি ছেলে নিয়ে 'হা ভাত! জো ভাত!' করতে এমন ব্যস্ত থাকে শনিচরী, যে বুধুয়ার বাপের জন্যে আর কাঁদা হয়নি। একদিন ঘোর গ্রীষ্মে পুড়তে-পুড়তে রামাবতারের খেতে নিড়িনি দিতে-দিতে শনিচরী হঠাৎ নিড়িনি ফেলে একটা পিপল গাছের ছায়ায় বসেছিল গিয়ে। অন্য মজুরদের বলেছিল, 'আজ আমি বুধুয়ার বাপের জন্য কাঁদব। বুক ফাটিয়ে কাঁদব।'

'আজই কাঁদবি কেন?'—দুলন গঞ্জু বলেছিল।

'তোরা মজুরি নিয়ে ঘর যাবি। আমি খত লিখে ব'সে আছি। আমি যাবো চারটি ভুট্টার ছাতু নিয়ে। তাই কাঁদব। আমার কান্না পায় না?'

'সেই দুঃখে কাঁদবি? এতোয়াকে টানছিস কেন?'

'তু বহোৎ খচড়াই লাটুয়াকে বাপ।'

'হিশেব ক'রে দেখেছিস? এক বছর হ'য়ে গেল।'

'একসাল!'

'হাঁ রে!'

'এক সাল সে নেই?'

'পেটের জ্বালায় সময় চ'লে যায়।'

'আমি যদি মরতাম!'

'বুধুয়া কোথায় যাবে? পাগলামি করিস না। শোন, খত যা লিখেছিস তা লিখেছিস। এখন ছাখ, আমি কাজ করি জিরিয়ে-জিরিয়ে। যদ্দিন কাজ, তদ্দিন মজুরি। তুই জান লড়িয়ে ও-হারামির খেত সাফ করছিস কেন? জেরেন নে। যদ্দিন কাজ, তদ্দিন জলখাই।'

সেদিনও শনিচরীর কাঁদা হয়নি।

গ্রামসমাজে সবকিছু সকলের চোখে পড়ে। শনিচরী যে কাঁদেনি, তা নিয়ে অনেক কথা হয়। শনিচরী সে-সব কথা কানেও নেয়নি। রামাবতার সিঙের খতের টাকা শোধ হচ্ছিল না, বোধহয় শোধ হ'তোও না। কিন্তু শনিচরী তখন একটা কালো এঁড়েকে দেখাই-ভালাই করছিল। আসরফির মা ওর হেফাজতে এঁড়েটা রেখে গয়াজি গিয়েছিল। তখনই রামাবতারের খুড়ো মরে, আর মৃত্যুকালে ঐ এঁড়েটার ল্যাজ বুড়োকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বৈতরণী পারের অব্যর্থ ওষুধ। শনিচরী ছাখে ঘরে অনেক লোক। রামাবতারের কুটুম-স্বজন সব। শনিচরীর মাথায় হঠাৎ খচড়াই খেলে। সে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে, 'গোড় লাগি গরিবের মা-বাপ! গরিব শনিচরী আপনাদের সেবায় লাগল আজ! তা একটা আর্জি। সে-খতের টাকা শুধে গেছে ব'লে লিখে দিন!'

খুড়ো মরা মানে আরো পঞ্চাশ বিঘা সরেস জমি হাতে আসা। রামাবতার কী জানি কেন, শনিচরীর কথা মেনে নেয়। এ নিয়ে পরে রামাবতারকে অনেক কথা শুনতে হয়। অন্য জোতদার-মহাজনরা বলেছিল,—খতের টাকা শোধ গেছে ব'লে মেনে নিলে যখন, তখন থেকে অছুতদের রবরবা বেড়ে চলেছে। টাকাটা কিছু নয়। নাগরার ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন। কিন্তু খতটা হ'লো সেই জোয়াল, যা কাঁধে নিয়ে বলদগুলো খেটে চলে।

রামাবতার বলত, 'খুড়ো মরেছে, মনে দুঃখ, খুব উদাস লেগে গিয়েছিল ভাই। মনে হচ্ছিল, যে যা চায়, তাকে তা-ই দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যাই।'

রামাবতারের ছেলে লছমনের যখন বিয়ে হয়, তখন রামাবতার শনিচরীদের কাছ থেকে বিয়ের বাদ্যিবাজনার খরচ আদায় করেছিল।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে আর পেটের ধান্দা করতে-করতে শনিচরী কাঁদতে ভুলে যাচ্ছিল। বুধুয়া বড়ো হ'লো। বাপের মতোই দারিদ্রের জোয়াল কাঁধে নিল। বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। বউ ঘর করতে এলো। বুধুয়ারও ছেলে হ'লো একটা। বউ যেন ডাইনি। হাটের মানুষদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে কী খেয়ে আসত কে জানে। দিনে-দিনে ফুলে ফেঁপে উঠল বউ। রামাবতারের ছেলে লছমনের গমের বোরা বইতে-বইতে বুধুয়াকে ধরল চেনা রোগে। খোঁখি রোগ। যক্ষ্মা। রাতে জ্বর হয়, ভোরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। কাশির সঙ্গে রক্ত। চোখের নিচে কালি। দেখে-দেখে শনিচরীর বুকে চিতার আগুন হা-হা

ক'রে আকাশ পানে ছড়িয়ে দেয় যে-বাতাস, সেই বাতাস বইত। বুধুয়ার দিকে চাইলেই শনিচরী বুঝতে পারত বুধুয়াকে আঁকড়ে ধ'রে সংসারটা বেঁধে তোলার আকাঙ্ক্ষাটাও তার পুরবে না। ছোটো আকাঙ্ক্ষাগুলোও পূর্ণ হয়নি ওর। কাঠের কাঁকই কিনবে একটা, কেনা হয়নি। গালার চুড়িগুলো একবছর হাতে রাখবে, রাখা হয়নি। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার চেহারা বদলায়। ছেলে-বউ কামাই করবে। ওদের মেহনতের অন্ন শনিচরী খাবে, শীতের রোদের ব'সে নাতির সঙ্গে এক শানকি থেকে খাবে ছাতু ও গুড়। এই আকাঙ্ক্ষাটা বড্ড বড়ো মাপের হয়েছিল কি? সেইজন্যেই কি বুধুয়া এখন তিলে-তিলে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে?

বুধুয়ার দিকে চেয়ে-চেয়ে, ওকে দোষ দিতে গিয়েও পারত না শনিচরী। বুধুয়ার বউ, নাতির মা তাকে কেমন ক'রে রুক্ষ কথা বলে শনিচরী? বুধুয়া সবই বুঝত। একদিন বলেছিল, 'মা, ওকে কিছু বলিস না।'

'কাকে?'

'তোর বউকে।'

'এ-কথা বললি কেন?'

বুধুয়া শীর্ণ ও শুভ্র হাসি হেসেছিল। বলেছিল, 'মা! ও যে হাটে সবজি বেচতে গিয়ে পয়সা চুরি করে, এটা-সেটা কিনে খায়, সবই তো জানি। ভুখের জন্যে করে, মা।'

'ওকে কি আমি খেতে দিই না?'

'ওর খিদেটা বেশি যে!'

'মানুষ কত কথা বলে।'

'জানি, মা। কেন বলে, তাও জানি। কিন্তু আমার আর এ নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। য়ো কা জানেগি মা, তুই আর আমি কত কষ্টে সংসারটুকু…'

বুধুয়া কাশতে শুরু করেছিল। শনিচরী ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল, 'ভগবানকে আর ডাকি না রে। ভগবান থাকলে তোর ব্যামো আমাকে দিত।'

'না, মা। তুই থাকলে আমার ছেলে বাঁচবে।'

'আমি যে আমার ছেলের বাঁচা চাই!'

কপাল চাপড়ে উঠে গিয়েছিল শনিচরী। উঠোন আলো ক'রে দিয়েছে বুধুয়া। ঢিণ্ডি, বেগুন, মুলো, লঙ্কা, কুমড়ো। নানাবিধ সবজি। লছমনের বাগান

থেকে চারা এনে, বীজ এনে বুধুয়া এই সবজির খেতটুকু করেছে। বউ তার ভবকা। বউয়ের খিদে বেশি। বউ খুব খুঁকেছিল, সেও যাবে লছমনের খেতে কাজ করতে। তার পেট ভরতে চায় না। নিজের খাবার জোগাড় সে নিজেই করবে। বুধুয়া সব কথাই শুনেছিল। বলেছিল, 'ছেলেটা হ'য়ে যাক। তারপর যা চাস, করবার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।'

বড্ড খেটেছিল বুধুয়া। উঠোন ঘিরেছিল কাঁটাঝোপের বেড়ায়। উঠোন কোদালে কুপিয়েছিল। চুরি ক'রে সার আনত লছমনের খেত থেকে। বাঁকে ব'য়ে জল আনত নদী থেকে তাতের সময়ে। কয়েক মাসেই লেজে উঠেছিল উঠোনটা। শনিচরী হেসে বলেছিল, 'এ খুব ভালো হ'লো, বুধুয়া। তোর বাপও এ-রকম সবজিখেত করতে চেয়েছিল রে।'

নাতি হ'লো। নাতির দেড়মাস বয়স হ'তেই বউ জেদ ধরল সে খাটতে যাবে। বুধুয়া বলল, 'যাবি। হাটবারে সবজি বেচতে যাবি। মালিকের খেতে যেতে দেবো না। মালিকের খেতে কাজ করলে যুবতী মেয়েরা ঘরে ফেরে না।'

'ঈশ, কোথায় যায়?'

'প্রথমে ভালো ঘরে, তারপর রাণ্ডিটোলিতে। এ নিয়ে আর কথা বললে মাথা নামিয়ে দেবো ধড় থেকে।'

বউ হাটে গিয়েছিল।

শনিচরী বলেছিল, 'হাটে পাঠালি, বুধুয়া? নয় ও ঘরে থাকত, আমি যেতাম?'

'না, মা। তুই আর আমি খেতে খাটতাম, ও তো ঘরে থাকত। কোনোদিন দেখেছিস ও রেঁধেবেড়ে রেখেছে, জল এনে রেখেছে, ঘরদোর ঝাড়ু দিয়েছে?'

'না।'

শনিচরী আর বুধুয়া দুজনেই জেনেছিল, বউয়ের মন বসবে না রোগা বরে, দুঃখের সংসারে। শনিচরী বউকে বলেছিল, 'ও আর কতদিন? চোখে-মুখে কালি পড়েছে। যতদিন থাকে, একটু সমঝে চ'লিস।'

বউ সে-কথা অক্ষরে-অক্ষরে মানে। বুধুয়া 'যতদিন' থাকল, সেও ততদিন ছিল। ছেলের ছয় মাস বয়স তখন। বুধুয়ার সেদিন, সেদিন কেন, কয়েকদিন ধ'রেই খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল। বৈদ্যের ওষুধেও কাজ হয়নি। শনিচরী বউকে বলেছিল বুধুয়ার কাছে থাকতে। নিজে গিয়েছিল, দৌড়ে-দৌড়েই গিয়েছিল বৈদ্যের কাছে অন্য ওষুধ চাইতে। ওষুধে আর কাজ হবে না জেনেও ওষুধ আনতেই গিয়েছিল ও।

বৈদ্যের বাড়ি মাইলখানেক দূরে। মাগো! ভাবলে কেমন লাগে, অতখানি পথ কেমন ক'রে দৌড়েছিল ও। কিন্তু বৈদ্য ছিল না ঘরে, হাটে গিয়েছিল। ঘরে ফিরতেই শনিচরী 'ওষুধ দাও, ওষুধ দাও' ব'লে মাথা কুটেছিল। বিরক্ত হ'য়ে বৈদ্য বলেছিল, 'ছোটোজাতের ধৈর্য সহ্য থাকে না। ছেলের অবস্থা যদি অতই খারাপ হবে, বউ হাটের দিকে ছুটছে কেন? নিশ্চয় ভালো আছে তোর ছেলে।'

ঘরে ফিরে শনিচরী বুধুয়াকে জীবিত দ্যাখেনি, বউকে ঘরে দ্যাখেনি। বাচ্চাটা তার ঘরে কাঁদছিল।

বউ আর ফেরেনি। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বুধুয়ার দাহের ব্যবস্থা করা, বউ পালাবার কেচ্ছা চাপা দিতে ছুটোছুটি করা, এইসব করতে গিয়ে বুধুয়ার জন্যেও কাঁদা হ'লো না। কাঁদতে পারত না শনিচরী। কেমন যেন ধন্দ ধ'রে ব'সে থাকত। তারপর চোখ বুজে শুয়ে পড়ত।

গ্রামের মানুষ দেইজি-কেজেতে যেতে থাকে। বুধুয়ার মৃত্যুর পর সেই মানুষেরই আরেক রকম চেহারা দেখেছিল শনিচরী। বুধুয়ার ছেলে হরোয়াকে নিয়ে ও হিমশিম খেতো। বুধুয়া যে নেই, তাও যেন ভুলে যেতো শনিচরী। কবে যে বুধুয়া ছিল না তাই ওর মনে থাকত না। যখনকার কথা, যতদিনের কথা মনে পড়ে, ততদিনই বুধুয়া ছিল যেন ওর সঙ্গে। শনিচরী যখন মালিক-মহাজনের খেতে কাজ করত, বুধুয়া ঘরদোর সাফ ক'রে জল এনে রাখত নদী থেকে। খেত-কুড়োনো মাটিমাখা গম বা ভুট্টা নদীর জলে ধুয়ে আনত। শান্ত, বুঝদার, দুঃখী মায়ের ছেলে। সবসময়ে থাকত বুধুয়া, কেমন ক'রে শনিচরী মেনে নেবে, যে আর তাকে রাতে উঠে জল গরম ক'রে খাওয়াতে হবে না বুধুয়াকে? স্বপ্নাদ্য মলম মাখাতে হবে না বুধুয়ার বুকে? বুধুয়ার ছেলেটা প'ড়ে-প'ড়ে কাঁদত।

একদিন দুলনের বউ, ধাতুয়া লাটুয়ার মা, এ-তল্লাটে বিখ্যাত ঝগড়ুটে মেয়ে-মানুষ, এসে দাঁড়াল। ছেলেটাকে তুলে নিল বুকে।

'কী করিস? অ ধাতুয়ার মা?'

'হরোয়াকে নিয়ে যাই।'

'কেন?'

'ধাতুয়ার বউয়ের কোলে ছেলে। তার দুধ খাবে।'

'কেনে? আমার নাতি, আমি মানুষ করব।'

'সবাই সবাইয়ের ছেলে-নাতিকে মানুষ করে, তুইও করবি। কিন্তু ধাতুয়ার বাপ বলল, কাজ ধরেছে একটা।'

'কোথায় ?'

'গোরমেন রেললাইনে মেরামত্তি করবে। ঠিকাদারের কাছে ধাতুয়ার বাপ ফুরন নিয়েছে, বিশটা মজুর দেবে।'

'তুই যাবি নাই ?'

'গৈয়া গাভীন হায়। তা ছাড়া মালিকের ঘরে পুজা। জঙ্গল সাফাই, রান্নার কাঠ চেলা করা—বেগারি কামও আছে।'

'দুলন গঞ্জু! বহোৎ শানদার খচড়া বুড্ঢা। কাজে মাতিয়ে আমাকে…'

'সে যা বুঝিস।'

ধাতুয়ার বউয়ের কাছে দুধ খেয়ে প্রাণে বাঁচল হরোয়া। যতদিন ঠিকাদারি কাজ চলে, শনিচরীর ঘরে উলুন জ্বলেনি। শনিচরীর রুটি ও আচার দুলনের সঙ্গেই দিয়ে দিত দুলনের বউ। যত আটা খরচ হয়, সব পরে শোধ ক'রে দেয় শনিচরী। কিন্তু সব ঋণ কি শোধ হয় ?

দুলনরা দেখেছিল, পরভু গঞ্জু বলেছিল, 'একেবারে একলা হ'য়ে গেলে! সম্পর্কে জ্যেঠাইম হও, না-হয় তোমার ঘরের দোর-জানালা-চালা এনে আমার উঠোনে ঘর তুলে দিই ?'

নাটুয়া, দুসাদ শনিচরীর উঠোনের সবজি হাটে বেচে দিত। গ্রামের মানুষ সে-সময়টা এইভাবে এসে না-দাঁড়ালে শনিচরী কি বাঁচত ? বুধুয়ার কসবি বউটার কথা কেউ বলত না। তবে শনিচরী জেনেছিল। হাটে যারা এক টাকায় চার রকম দাওয়াই বেচে, সেইসব দাওয়াইওয়ালাদের একজনই বউকে বুঝিয়েছিল! বউকে গয়া-আরা-ভাগলপুর দেখাবে—নৌটঙ্কি-সিনেমা-সার্কাস দেখাবে—রোজ পুরীকচৌরী খাওয়াবে। সে-লোকের সঙ্গেই গেছে বউ।

ছেলেটাকে নিয়ে যায়নি কেন ?

শনিচরীর মনে হ'তো, ছোটোবেলায় দেখা মোতির মায়ের কথা। মোতিকে নিতে চেয়েছিল মালিক, মোতির মা দেয়নি। মোতি পালিয়ে যায় লাইনের কুলি জোগাবার ঠিকাদারের সঙ্গে। মোতির মা শনিচরী জাঁতায় গম ভাঙতে আসত আর বলত, 'মালিকের হাতে মেয়ে দিলে তবু দেখতে পেতাম মুখখানা।'

শনিচরী তা বলে না। গেল যখন, ঐভাবে হারিয়ে গেছে। সেই ভালো, নইলে মালিকের ঘরে সে থাকত রানী হ'য়ে, শনিচরী আর হরোয়া বাইরে গোলাম খাটত, সে ভারি অপমানের কথা হ'তো। তাছাড়া, শনিচরী আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে জানে: বউ ও-কাজ করলে গ্রামের লোক তাকে নামে না-হ'লেও কাজে

একঘরে করত। তেমন হ'লে গ্রামে থাকা চলবে না। নিরন্ন ও রাঁকা দরিদ্রের বড়ো দরকার অন্ন নিরন্ন রাঁকাদের মদত। সে-মদত না-থাকলে মালিকের পাঠানো দুধ-ঘি খেয়েও গ্রামে বাস করা চলে না।

আস্তে-আস্তে শনিচরী সহজ ও স্বাভাবিক হ'লো। হরোয়াকে মানুষ করল সাধ্যমতো যত্নে। গ্রামের বুড়োবুড়ি, প্রবীণ ও প্রৌঢ়, সবাই হরোয়াকে বলত, 'বহোৎ দুখ কী তোহ্‌রা নানী। উসকো দুখ মৎ দিয়া করো, ও হরোয়া।'

হরোয়া মাথা নিচু ক'রে শুনে যেতো। ওর বয়স বছর চোদ্দ হ'তে শনিচরী ওকে নিয়ে গিয়েছিল। রামাবতার সিঙের ছেলে লছমন সিং এখন মালিক-মহাজন। হাজার হোক, মালিক পরোয়ার। অন্য জমানা এখন। মালিকও নতুন জমানায় নতুন রকম। লছমন সিং খেতমজুর, ছোটোজাত ও কিষানদের শায়েস্তা করতে এখন মস্তান রাখে। ঘোড়াচড়া, বন্দুকচালানো মস্তান। রামাবতার লাথ মারত, নাগরা পেটাত। কিন্তু মন ভালো থাকলে ওদের সঙ্গে গল্পও করত। লছমন সিং বাপের ও-সব আচরণকে মনে করে দুর্বলতা। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলে ও।

শনিচরী তার কাছেই গিয়েছিল। বলেছিল, 'সবই তো জানো, মালিক। শনিচরীর চেয়ে দুর্ভাগী জন্মায়নি কখনও। এই ছেলেটা আমার নাতি। একে একটা কাজকর্ম দাও। নইলে বাঁচব না।'

লছমন সিঙের বোধহয় মনটা ভালো ছিল সে-সময়ে। সে বলেছিল, 'হাটে আমার দোকানে মাল বইবে। ঝাড়ু-পানি করবে। মাসে দু-টাকা পাবে ওর পেটখোরাকি।'

'হজৌর কা কিরপা।'

শনিচরী নাতিকে নিয়ে উঠে এসেছিল। মোহনলালের কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদ এনে মাদুলিতে ভ'রে, সে-মাদুলি গলায় বেঁধে, তবে হরোয়াকে পাঠিয়েছিল হাটে।

অনেক কথা বলেছিল।

'হাটে অনেকে গোরু-মোষ আনে। সেখানে যাস না, হরোয়া। ভৈষা লাথ মারলে ম'রে যাবি।'

'নায়, নানী।'

'কোনো মন্দ লোকের কথা শুনিস না।'

'নায়, নানী।'

প্রথম কয়েক মাস খুব মন দিয়ে কাজ করত হরোয়া। মাইনের টাকা দিতো নানীকে। জলপানির ছাতু, গুড় ব'য়ে-ব'য়ে আনত। খেয়ে-মেখে চেহারা ফিরেছিল ক্রমে। ক্রমে মন আনচান হ'লো! একবার টাকা দিল না, একটা রঙিন গেঞ্জি কিনল। আরেকবার কিনল একটা প্লাস্টিকের মাউথ অর্গান। সেবার খুব ধমক-ধামক করেছিল শনিচরী। তারপর স্বয়ং লছমন যখন বলল, হরোয়া দোকানে থাকে না, সর্বদা ম্যাজিকওয়ালাদের পেছন-পেছন ঘোরে—তখন শনিচরী হরোয়াকে ক'সে মেরেছিল। বলেছিল, 'বেচাল করবি তো পা কেটে দেবো। ঘরে বসিয়ে খাওয়াব, তবু কুপথে যেতে দেবো না।'

আবার কিছুদিন মন দিয়ে কাজ করল হরোয়া। তারপর পালিয়ে গেল। নাটুয়া এসে বলল, ম্যাজিকওয়ালাদের সঙ্গে চ'লে গেছে হরোয়া।

'যাক গে।'

'যাক গে' বললেও শনিচরী ঘরে ব'সে থাকেনি। হাট থেকে হাটে মেলা থেকে মেলায় খুব খুঁজেছিল। নাতির জন্যে কাঁদার কথা মনেই হয়নি ওর। এ-রকমই যে হবে,—তা-ই যেন মনে হয়েছিল। সেই সময়ে, হরোয়াকে ফিরে পাবার আশা যখন নেই আর মনে, হঠাৎ দেখা বিখনির সঙ্গে। বিখনি ওর ছোটো বেলার খেলুড়ি, কালো কম্বলের ঘাগরা পরত ব'লে সবাই বলত কালিকমলি বিখনি। একটা পোটলা কাঁধে হনহনিয়ে হাঁটছিল বিখনি। হাঁটতে-হাঁটতে শনিচরীর গায় ঠেলা দেয় ও অসাবধানে।

'কে রে তুই? চোখের মাথা খেয়েছিস?'

'চোখের মাথা তোর বাপ খেয়েছে।'

'কী বললি?'

'ঐ তো শুনলি।'

চমৎকার একটা যুদ্ধ বাধছিল। শনিচরীর খুব ভালো লাগছিল। জমাটি ঝগড়া একখানা করলে মনের বহু জঞ্জাল কেটে যায়, সাফ হ'য়ে যায় সব। ধাতুয়ার মা সেই জন্যেই কাকচিলের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করলে মন ভালো থাকে। শরীর ভালো থাকে, দেহের রক্ত বন্দুকের গুলির মতো দমাদম চলতে থাকে। কিন্তু দুজনে দুজনের দিকে চাইতেই বিখনি বলেছিল, 'এ কী! তুই শনিচরী না?'

'তুই, তুই কে?'

'বিখনি। কালিকমলি বিখনি।'

'বিখনি!'

'হ্যাঁ রে!'

'তোর তো সেই লোহার জাতে বিয়ে হয়েছিল।'

'আজ কতকাল আছি জুজুভাতুতে।'

'জুজুভাতু? আর আমি থাকি টাহাড়ে! একবেলার পথ গো, তবু দেখা হয়নি কখনও!'

'চল, বসি কোথাও।'

দুজনে একটা পিপল গাছের ছায়ায় বসল। দুজনেই দুজনকে আড়ে-আড়ে দেখছিল। দুজনেই নিশ্চিন্ত হ'লো, ওর অবস্থা আমার চেয়ে ভালো নয়। বিখনিরও হাতে-গলায়-কপালে—শনিচরীর মতোই—গয়না বলতে উলকির দাগ, অভ্যাস বশে দুজনেরই কানের ছিদ্রে শোলা গোঁজা। শনিচরী ও বিখনি বিড়ি ধরাল। দুজনের চুলই রুক্ষ।

'শনিচরী কি হাঁটে এসেছিলি?'

'না রে। নাতিকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

শনিচরী অতিসংক্ষেপে হরোয়ার কথা, নিজের কথা, সবই বলল। বিখনি সব শুনে বলল, 'দুনিয়া থেকে মায়ামমতা চ'লে গেল না কি? না তোর-আমার কপালদোষ?'

শনিচরী অনেক দুঃখে হাসল। বলল, 'স্বামী নেই, ছেলে নেই, নাতিটা যেখানে থাক, প্রাণে বেঁচে থাকুক।'

বিখনি বলল, তিন মেয়ের পর এক ছেলে। ছেলের বাপ মরেছে কবে, বিখনিই ছেলেকে মানুষ করেছে, পরের বাছুর পালানি দিয়ে ক্রমে-ক্রমে চারটে গাই, দুটো দুধেলা ছাগল, স-ব করেছে। বিয়ে দিয়েছে ছেলেকে, আবার ছেলের গওনার সময়ে গ্রামকে দই-চিঁড়ে-গুড় খাইয়েছে মহাজনের কাছে ধার ক'রে।

'তারপর?'

'মহাজন এখন সেই ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি নিয়ে নিচ্ছে। ছেলে যাচ্ছে শশুরাল।'

'শশুরাল' ব'লে বিখনি থুতু ফেললে। বলল, 'শশুরের ছেলে নেই। আর দুটো জামাইয়ের মতো ছেলেও তার গোলাম হবে। বললাম, "গোরু বেচে ধার শোধ করি।" ছেলে গাই-গোরু নিয়ে শশুরাল রেখে এসেছে। আমিও

বিখনি, আমি ছাগল দুটো এই হাটে বেচলাম। ছেলে জানে না। ব্যস, ট্যাঁকে কুড়ি টাকা নিয়ে চললাম।'

'কোথায় যাবি?'

'কে জানে! তোর ছেলে নামে-যশে নেই। আমার ছেলে থেকেও নেই। চ'লে যাবো ডালটনগঞ্জ, কি বোখারো, কি গোমো! ভিখ মাঙব টিশনে।'

শনিচরী নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'আমার সঙ্গে চল। দুখানা ঘর, যেন হা-হা করছে। ঘরে-ঘরে শোবার মাচান। বুধুয়া করেছিল। আজও উঠোনে ভিণ্ডি-মিরচা-বাইগন হয়।'

'আমার টাকা ফুরোলে পরে?'

'তখন দেখা যাবে। তোর টাকা তোর থাকুক। শনিচরী এখনও আধপেট কামাই করে।'

'তাই চল। হ্যাঁ রে, জলের সুখ আছে?'

'নদী। পঞ্চায়েতি কুয়োটার জল বড়ো তেতো।'

'একটু দাঁড়া।'

আবার হাটে গেল বিখনি, ফিরে এলো একটু বাদে। বলল, 'উকুন-মারা ওষুধ কিনে নিলাম। মিট্টি কা তেলের সঙ্গে মাথায় ঘ'ষে মাথা ধুয়ে ফেলব। যত মনের জ্বালা, তত কি উকুনের জ্বালা?'

পথ চলতে-চলতে বিখনি বলল, 'মাৎনিটা হয়তো রাতে কাঁদবে। আমার কাছে ঘুমোত!'

শনিচরী বলল, 'কয়েকদিন। তারপর ভুলে যাবে।'

শনিচরীর ঘর দেখে বিখনি খুব খুশি। তখনই জল ছিটিয়ে ঘরদোর ঝাড়ু দিল। নদী দেখতে গেল, জল আনল এক গামলা। বলল, 'আজ রাতে উনোন জ্বালব না। রুটি আর আচার নিয়েই বেরিয়েছিলাম।'

বিখনি ঘোর সংসারী। দু-দিনেই শনিচরীর ঘর ও উঠোন নিকোলো ও। সোডা-সাবানে নিজের আর শনিচরীর কাপড় কাচল। কাঁথা ও মাদুর রোদে দিল। নিজের সংসারের দখল বউয়ের হাতে চ'লে যাচ্ছিল ব'লে ইদানীং ও কোনো কাজকর্মে যেতো না। সেটা অভিমানে, কিন্তু বউ বলত ওর শাশুড়ি কামচোরা। সংসারের নেশা মানুষকে, বিখনির মতো দুঃখী মানুষকেও অবাস্তব স্বপ্নাশ্রয়ী করতে পারে। এখানে কতদিন থাকবে ঠিক নেই, শনিচরীর সংসার—

বিখনি একদিন কোদাল নিয়ে উঠোন কোপাতে শুরু করল। বলল, 'একটু খাটলে সবজি হবে খুব।'

উকুনের ওষুধে শনিচরীর মাথা থেকেও শরণাগত জীবগুলি নির্বংশ হ'লো। টানা ঘুমে রাত কাটিয়ে উঠে শনিচরী বুঝল, উকুনের কামড়ে ঘুম হ'তো না। মনের জ্বালায় নয়। মনে যত জ্বালা থাকুক, খাটাখাটুনির শরীরে ঘুম আসে।

বিখনির টাকায় দুজনে ক-দিন খেলো। ওদের টাকাও ফুরোলো, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল শনিচরীর। সেদিনই দুলনের ছোটো একটা বাছুরকে নেকড়ে ধ'রে নিয়ে গেল। লাকড়া তাড়াবার উত্তেজনায় সবাই যখন মেতেছে, তখনই খবর এলো স্থানীয় আরেক জোতদার ভৈরব সিংকে কে বা কারা যেন একটি জমিতে কেটে রেখে গেছে। জমিটি গোটা দশেক দেওয়ানি মামলার জন্ম দিয়েছে। ভৈরবের মৃতদেহ ধারণ ক'রে জমিটি ফৌজদারিতে প্রোমোশন পেলো। গ্রামে সবাই সব জেনে যায়। সবাই জানল ভৈরবের বড়ো ছেলেই খুনটি করিয়েছে। বৈমাত্র্য ভাইদের প্রতি বাপের অত্যধিক স্নেহ দেখে সে নিজের আখের বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই দুশ্চিন্তিত হয়েছিল। ভৈরবের বড়ো ছেলে পিতৃহত্যার দায়ে সৎভাইদের নামে মামলা আনবে ব'লে শাসাল। সৎভাইরা দাদার নামে মামলা করবে ব'লে লছমন সিঙের মদত চাইতে গেল। লছমন বলল, 'চলো, আমি যাচ্ছি।' জমিটিতে তারও সবিশেষ লোভ ছিল।

অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে লছমন অকুস্থলে দেখা দিল। ছেলেদের লজ্জা দিয়ে সে মর্মভেদী দুঃখে বলতে লাগল, 'হায় চাচা! রাজা তুমি, স্বঘরে মরবে। আজ কেন তুমি মাটিতে প'ড়ে আছো? কীসের দুঃখ তোমার?'

ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কি মানুষ? কে মেরেছে তা দিয়ে কী হবে? চাচা যে ম'রে গেল সেটাই হ'লো প্রধান ও শেষ কথা। হায় চাচা! তুমি থাকতে ছোটোজাত কখনও মাথা তোলেনি। দুসাদ গঞ্জুর ছেলে তোমার ভয়ে পড়তে যায়নি সরকারি স্কুলে। আজ কে সে-সব দেখভাল করবে?'

ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, 'এখন আসল কাজ হ'লো চাচার সম্মান রেখে সদগতি করা। ওঁকে ঘরে নাও, পুলিশকে খবর দাও। লেকিন সেখানে কোনো নাম উঠাবে না। লাশ তোহরি যাবে না, চেরাই-ফাড়াই হবে না। যেভাবে চাচা মরলেন, ও-হো-হো, বীরের মৃত্যু! কিন্তু, যেভাবে চাচা মরলেন, সেভাবে তো তাঁর মরার কথা নয়! মানুষ অনেক কথা বলবে। তাই সদগতি আর

কিরিয়াকাজ উচিত শোর মচাকে করো। চাচাকে বড়ো পালঙ্কে সাজিয়ে রাখো ওর আমাদের রাজপুত সমাজকে খবর দাও।'

তারপর ছেলেদের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'নিজেদের বিবাদ ভুলে যাও। আমার বাবা নেই। চাচা গেল তো ইন্দ্রপতন হ'লো। আমাদের সমাজের সকলকে ডাকো। এখন নিজেদের বিবাদ উঠাবার সময় নয়। মখ্‌খন সিং, দৈতারি সিং—গোল পাকাবার মানুষ অনেক আছে।'

লছমন সিং এই কাজে মেতে থাকল ব'লে শনিচরী তাকে ধরে পেলো না। ঘরে এসে গালে হাত দিয়ে বসল ও। তারপর বিখনিকে বলল, 'চল, দুলনের কাছে যাই। টেঁটিয়া বুড়া, বহোৎ কিরকিচা আদমি। কিন্তু দিমাগটা খুব সাফাই। ও ঠিক একটা পথ বাৎলাবে।'

সব শুনে মেলে দুলন বলল, 'কামাইয়ের পথ থাকতে উপোশ ক'রে মরে কে?'

—'কৈছন কামাই?'

—'বুধুয়ার মা! কামাইয়ের পথ কি থাকে? মালিক-মহাজনের থাকে, দুসাদ-গঞ্জুর থাকে? পথ তৈরি ক'রে নিতে হয়। কত টাকা লিয়ে এসেছিল সহেলি?'

—'বিশ টাকা।'

—'বি-শ-টাকা!'

—'হ্যাঁ! আঠারো টাকার খেয়েছি।'

—'আমি হ'লে এ-টাকা হাতে থাকতে-থাকতে স্বপ্নে মহাবীরজি পেতাম।'

—'কা বোলৎ? হাঁ লালুয়াকে বাপ?'

—'কায়? হমানি কে বোল সমঝৎ নায়?'

—'কা বোলৎ?'

—'টাকা হাতে থাকতে-থাকতে কুরুন্ডা নদীর পাড় থেকে আমি একখানা ভালো পাথর আনতাম। তাতে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে বলতাম, স্বপ্নে মহাবীরজি পেয়েছি।'

—'আমি যে ছাই স্বপ্নই দেখি না।'

—'আরে, মহাবীরজি পেয়ে গেলে দেওতার ল্যাজ ধ'রে স্বপ্ন আপসে আসত।'

—'হায় বাবা!'

—'তোকে সবাই চেনে। তোকে দিয়ে জুত হবে না। তোর সহেলি নতুন মানুষ, ও বললে আমরা মেনে নিতাম। তারপর মহাবীরজি নিয়ে তোহ্‌রির হাটে বসতিস। প্রণামী মিলত।'

—'দেওতাকে নিয়ে খচড়াই? এমনিতেই মহাবীরজির চেলাদের জালায় গাছে ফল থাকে না।'

—'খচড়াই মনে করলে খচড়াই। নইলে খচড়াই কীসের? তোর হ'লো মহাপাপীর মন। তাতেই ভাবছিস খচড়াই।'

—'কৈছন? আঁ লাটুয়াকে বাপ?'

—'কৈছন? বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

—'বলো?'

—'লছমনের মা বুড়ির বাত রোগ আছে?'

—'জরুর।'

—'তিনি আমাকে দশ টাকা দিয়ে বললেন, চাস থেকে দৈবী তেল এনে দে। চাস ভি গেলাম না, ঘর থেকে তেল ভি দিয়ে এলাম দু-দিন বাদে, তব্‌ভি খচড়াই হ'লো না, কেন কী আমার মনে কোই খচড়াই না-হ্যায়। সে তেল মাখল কাল, আজই বুড়ি লোটা নিয়ে অড়র খেতে পায়খানা করতে গেল। মন চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা। দ্যাখ, বুধুয়াকে মা! পেটের চেয়ে বড়ো ভগবান নেই। পেটের জন্যে সব কাজ করা যায়, রামজি মহারাজের বাত।'

দুলনের বউ ও-পাশ থেকে বলল, 'বুঢ়া যদি মালিকের খেত থেকে কুমড়ো ছিঁড়ে আনে, তখনও বলে. এ রামজি মহারাজের বাত।'

বিখনি বলল, 'আমাদের বিপদ। তার আসান কীসে হবে? বুদ্ধি দাও একটা, আমরা দুই বুড়ি।'

—'বারোহি গ্রামের ভৈরব সিং মরেছে?'

—'হাঁ। ছেলে বাপকে মেরেছে।'

—'তাতে তোমাদের কী? টাকার ঘরে মা ছেলেকে মারে, ছেলে মাকে মারে। যে মরবার সে মরেছে। আমাদের ঘরে মরলে আপনজন কাঁদে। ওদের নাতেদাররা সন্দুকের কুঞ্জি সরায়, কাঁদার কথা ভুলে যায়। যাক, আমাদের মালিক গিয়ে মাথা দিয়েছে। এখন ভৈরবের লাশ দাহ হবে। কাল দপুরে লাশ বেরোবে। ওদের চাই রোনেবালী রুদালী। দুটো রাণ্ডি এনেছে। মালিক মহাজন মরলে রাণ্ডি আসে কাঁদতে। রাণ্ডি দুটো হয়তো ভৈরবেরই ছিল কবে, এখন শুকনো কাক। তারা জুতের নয়, তোরা যা, কাঁদবি, লাশের সঙ্গে যাবি। টাকা পাবি, চাল পাবি। কিরিয়াকাজের দিন কাপড় ঔর খাবার পাবি।'

শনিচরীর ভেতরে যেন ভূমিকম্প হ'লো। সে বলল, 'কাঁদব? আমি?

তুই জানিস না ? কান্না আসে না আমার চোখে! দু-চোখ জ্ব'লে গেছে আমার!'

দুলন নিস্পৃহ কঠিন গলায় বলল, 'বুধুয়াকে মা! যে-কান্না তুই বুধুয়ার জন্যে কাঁদিসনি, তা কাঁদতে বলছি না তোকে। এ হ'লো রুজির কান্না। দেখবি, যেমন ক'রে গম কাটিস—মাটি ব'য়ে নিস, তেমনি ক'রে কাঁদতেও পারছিস।'

—'আমাদের নেবে কেন ?'

—'দুলন আছে কেন ? ভালো মতো রুদালী না-পেলে ভৈরবের মান থাকবে কেন ? মালিক-মহাজন লাশ হ'য়ে গেলেও তার সম্মান চাই। ভৈরবের বাপ রামাবতার, এরা যে-রাণ্ডিদের রাখত তাদের দেখভাল করত। সেই মমতায় রাণ্ডিয়া এসে কেঁদে গিয়েছিল ওরা মরলে। ভৈরব, দৈতারি, মখ্খন, লছমন—এদেরও রাণ্ডি আছে। কিন্তু খেতমজুর ঔর রাণ্ডি, সকলকে এরা পায়ের নিচে রাখে! তাতেই রুদালী জোটে না। খতরনাক খচড়াই সব! সবসে হারামি য়ো গম্ভীর সিং। রাণ্ডি রাখল, সে-ঘরে মেয়ে হ'লো। রাণ্ডি থাকতে মেয়েকে দুধে-ঘিয়ে রাখত। রাণ্ডি মরতে মেয়েকে বলল, "তোকে পুষব না আর। রাণ্ডির মেয়ে রাণ্ডি, কাজ ক'রে খা গিয়ে।"'

—'ছি-ছি!'

—'সে-মেয়ে তো তোহ্‌রিতে রাণ্ডি বাজারে প'ড়ে আছে। পাঁচ টাকার রাণ্ডি এখন পাঁচপয়সার রাণ্ডি। ভালো কথা, বুধুয়ার বউও তো তোহ্‌রিতে। ঐ এক হালত।'

—'তার কথা কে শুনতে চায় ?'

দুলন বলল, 'কালো কাপড় পরবি।'

—'তা-ই তো পরি।'

দুলনই ওদের নিয়ে গেল। যেতে-যেতে, বিখনি বলল, 'এ-রকম কাজ মাঝে-মধ্যে, তারপর মালিকের খেতি কাম জোটে তো ভালো, নয় পাথরভাঙার কাজ—দুটো পেট চ'লে যাবে।'

শনিচরী বলল, 'গাঁয়ে কথা হবে না ?'

—'হ'লে হবে।'

ভৈরব সিঙের গোমস্তা বচ্চনলাল দুজনকে চিনত। লছমন ওকেই শবযাত্রার আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থার ভার দিয়েছে। সবকিছু ইন্তেজাম করা চারটিখান কথা নয়। বচ্চনের নিজের সংসারে দুটো কোদাল, একটা আলনা আর পেতলের

বাটলোই দরকার দুখানা। এগুলো কিরিয়াকাজের ফর্দে ঢোকাতে হবে, মহা দুশ্চিন্তা! শনিচরীদের দেখে ও হালে পানি পেলো। বলল, 'তিন টাকা ক'রে পাবি।'

দুলন বলল, 'মহারাজ ম'রে গেল, তার রুদালী তিন টাকা! পাঁচটাকা হজৌর!'

—'কেন?'

—'যা কাঁদবে, হজৌর, আপনি শুনলে বকশিশ দেবেন। লছমনজি বলেছেন, দশ-বিশ যা লাগে, কাঁদবার লোক চাই। এ-বাবদে দুশো টাকা মঞ্জুর আছে।'

গোমস্তা নিশ্বাস ফেলল। দুলন কেমন ক'রে সব খবর জানতে পারে কে জানে।

—'পাঁচটাকাই দেবো। যা, বাইরে গিয়ে বোস।'

—'ওর চাল ভি দেবেন একপাই।'

—'গম দেবো।'

—'চাল দেবেন, হজৌর।'

—'দেবো।'

—'এখন ওদের জলপানি দিন পেট ভ'রে। ভালো ক'রে না-খেলে কাঁদতে পারবে কেন।'

—'দুলন! কটা হারামি ম'রে তুই জন্মেছিলি তা-ই ভাবি। যা, বাইরে যা। জলপানি দিচ্ছি।'

ভৈরব সিঙের বড়ো ভৈরবী ব'লে পাঠালেন, যারা রুদালী, তাদের পেট ভ'রে চিঁড়ে-গুড় দাও। প্রসাদের বাপ কোনো জিনিশের অভাব রেখে যাননি।

পেট ভ'রে চিঁড়ে-গুড় খেতে-খেতে শনিচরী বুঝল, কান্না বেচেই তাকে খেতে হবে ব'লেই চোখের জল তোলা ছিল।

রাণ্ডি দুজন প্রথমে এই দেহাতি বুড়িদের আমল দেয়নি। কিন্তু শনিচরী ও বিখনি এমন তারস্বরে কাঁদল, এমন সাজিয়ে-সাজিয়ে বলল ভৈরব সিঙের গুণের কথা, যে বাজারী রাণ্ডিরা ঘোল খেয়ে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে শ্মশানে গেল শনিচরী ও বিখনি। কাঁদতে-কাঁদতে ফিরল। এ-দিনে নগদ বিদায় পাঁচ টাকা ও আড়াই সের চাল একেক জন। বচ্চন ব'লে দিল, 'কিরিয়ার দিন আবার আসবি।'

—'জরুর আসব, হজৌর।'

কিরিয়ার দিন মিলল কাপড় ও খাবার। পুরী-কচৌরি-বেসনের লাড্ডু। শনিচরী ও বিখনি খাবার বেঁধে নিয়ে গেল বাড়ি। শনিচরী দুলনের বউকে কিছু দিয়েও এলো। দুলন সব খবরাখবর নিল। বলল, 'বচ্চন হারামি এ-বাবদ দুশো টাকা পেয়েছিল। কুড়ি টাকায় কাজ সারল।'

—'সে তো হবেই লাটুয়াকে বাপ।'

—'তোর সহেলিকে ব'লে দে, হাটে যায়-আসে নিয়মিত। হাটে যাবে, সব দোকানই মালিক-মহাজনদের। দোকানে-দোকানে ঘুরলেই খবর পাওয়া যাবে মালিকদের ঘরে কার অসুখ, কে মরছে। নইলে খবর মিলবে না। এরপর যখন যাবি, সেখানে বলবি, আমিই ওর-ওর রুদালী এনে দেবো।'

—'কৈছন?'

—'তোহ্‌রি যাবি। রাণ্ডি বাজার।'

—'হায় ভগবান!'

—'তোর সহেলি যাবে?'

বিখনি বলল, 'যাবো।'

দুলন বলল, 'এত রাণ্ডি কোথাও কি ছিল? এইসব রাজপুত মালিক-মহাজন চারদিকে? তাতেই রাণ্ডির ছড়াছড়ি।'

দুলনের বউ বলল, 'রাণ্ডি চিরকাল আছে।'

—'না, চিরকাল এখানে ছিল না। যত মন্দ জিনিশ সব ওরা এনেছে। ওরাও চিরকাল আছে।'

—'না, আগে ছিল এ-মুলুক, ছোটোনাগপুরের রাজাদের এক শরিকের। তখন এখানে পাহাড় জঙ্গল, ওর আদিবাসী লোকদের টোলি। তখন, সে অনেক অনেক আগে, তাই তহশীলে কোল লোকরা বলোয়া করে।'

দুলন যে-কাহিনীটি বলে, তা খুবই দ্যোতক। এবং কেমন ক'রে দুর্বর্ব রাজপুতরা এই আদিবাসী ও অন্ত্যজ অধ্যুষিত অঞ্চলে ঢুকে প'ড়ে জমিদার থেকে শুরু ক'রে জোতদার-মহাজন, মালিক পরোয়ার হ'য়ে বসে, তা বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক। এই রাজপুতরা ছিল ছোটোনাগপুরের রাজার শরিকের সেনাবাহিনীর লোক, শ-দুয়েক বছর আগে এদের নানাবিধ অত্যাচারে অতিষ্ঠ কোলরা বিদ্রোহ করে। কোল বিদ্রোহ দেখা দিতে-না-দিতেই রাজা দেন এদের লেলিয়ে। কোল বিদ্রোহ দমন করার পরেও এদের সামরিক জোশ কমে না। এরা মেরেই চলে নিরীহ কোলদের। জ্বালিয়ে চলে শান্ত গ্রামগুলি। হরদা এবং ভোনকা মুণ্ডা

তখন আবার কাঁড়ে শান দিতে থাকে। আবার কোল বিদ্রোহ ঘটার উপক্রম ঘটে। তখন রাজা এই রাজপুতদের নামিয়ে দেন বসতিবিরল টাহাড় অঞ্চলে। ব'লে দেন, মাথার ওপর তরোয়াল ঘুরিয়ে ছোঁড়ো। যতদূর গিয়ে তরোয়াল পড়ল, ততদূর পর্যন্ত জমির দখল নাও। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি তরোয়াল ছুঁড়ে চলো। তোমরা সাত সর্দার, এইভাবে যত জমি পেলে, তত জমি নিজে চাষবাস করো।

তখনই রাজপুতরা নেমে পড়ে টাহাড়ে। এবং সেই থেকে এখানে ওদের জোত। শতক থেকে শতকে এদের জোতজমা বেড়েছে বৈ কমেনি। এখনও ওরা জোতজমা বাড়ায়, তবে তরোয়াল ছুঁড়ে নয়। বন্দুকের গুলি মানুষের গায়ে ছুঁড়ে এবং জ্বলন্ত মশাল মানুষের বসতিতে ছুঁড়ে দিয়ে। এখন এ-অঞ্চলে যারা আছে, তারা পরস্পরের সঙ্গে একদিন সম্পর্কিত ছিল, আজ সম্পর্কের সূত্র ক্ষীণ। তবে পদমর্যাদায় সবাই সমান হ'তে চায়।

জীর্ণ খাপরার চাল-শোভিত মলিন মেটে বাড়ির টোলেতে অন্ত্যজদের বাস। আদিবাসীদের বসতিও গরিব চেহারার। এর মাঝে-মাঝে মালিকদের বিশাল মকান। মালিকদের মধ্যে মামলা ও রেষারেষি থাকতে পারে, কিন্তু মালিকশ্রেণী কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক। লবণ, কেরোসিন, পোস্টকার্ড ছাড়া এদের প্রায়ই কিছু কিনতে হয় না। হাতি, ঘোড়া, মহিষ বাথান, উপপত্নী, জারজ সন্তান, উপদংশ বা যৌনব্যাধি, 'বন্দুক যার জমি তার' বিশ্বাস—সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। গৃহ-বিগ্রহ আছে অগুনতি। দেবতারা এদের সমর্থক। এরা সকলেই গৃহবিগ্রহদের নামে জমি দেবোত্তর ক'রে রেখেছে। আবার ব্যক্তি হিশেবে আলাদা বৈশিষ্ট্যও আছে। দৈত্তারি সিংহের পায়ে ছয়টা আঙুল। বনোয়ারি সিঙের বউয়ের গয়লাদোষ। নাথুনি সিঙের বাড়িতে স্টাফ-করা বাঘ।

এদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে দুলন বলল, 'এদের মানসম্মান রাখতে রুদালী ঔরৎ চাই। বাস, লাইন ধরিয়ে দিলাম, এখন ল'ড়ে যা।'

শনিচরী ও বিখনি মাথা নাড়ল। ওদের জীবনে সহজে কিছু মেলে না। ভুট্টার ঘাটো ও নিমক জোগাড় করতে জান নিকলে যায়। কী সন্তানজন্মে কী স্বামীমরণে—এরা মহাজনের কাছে বাঁধা। স্বশ্রেণীর কাছে মান রাখবার জন্যে এরা মৃত্যু নিয়ে বর্বর খরচ করে। সে-খরচের কিছুটা শনিচরীর ঘরেও আসুক।

শনিচরী ও বিখনি ল'ড়ে গেল। সবই লড়াই এ-জীবনে। বিখনি এ-গ্রামের মেয়ে নয়। কিন্তু আশ্চর্য সহজে ও গ্রামজীবনের একজন হ'য়ে গেল। ফসল বোনা

ও কাটার সময় সুয়োন খেতমজুর খাটল লছমনের কাছে। অন্য সময়ে চ'লে গেল হাটে-বাজারে, বাসস্টপের দোকানে। ও-ই খবর আনলে কে মরছে মালিক-বাড়িতে। কার শ্বাস উঠছে। তারপর দুজনে কালো থান কেচেকুচে নিল। সেই থান পরল। আঁচলে বেঁধে নিল আটা-ভাজা চুরন।

সেই চুরন খেতে-খেতে দুই বুড়ি হনহনিয়ে হাজির মালিকবাড়ি। মালিকের গোমস্তার সঙ্গে কথা বলল শনিচরী। কথার বয়ানও বাঁধা।

'কান্না যা কাঁদব, হজৌর, তাতে রামনাম শোনা যাবে না। পাঁচটাকা ক'রে নেবো, ঔর চাল। কিরিয়াকাজের দিন খাবার নেবো, কাপড় নেবো। দর কমবেন না, দর কমবে না। আরো রুদালী চান তো এনে দেবো।'

গোমস্তাও মেনে নিল সব। না-নিলে উপায় কী? ভৈরব সিঙের শবযাত্রায় এদের দেখার পর সবাই এদেরই চায়। এরা পেশাদার। দুনিয়াদারী এখন শৌখিনের নয়, পেশাদারের। খেতমজুরদের হিশেব নয়-ছয় করতে, চক্রবৃদ্ধি সুদের অঙ্ক বাড়াতে গোমস্তাদের দক্ষতা। দশ টাকা মাসমাইনেতেই তাদের চাষ-গেরস্তি, হালবলদ, চাইলে একাধিক বউ। অনাত্মীয় মৃতের জন্যে কাঁদাও পেশাদারি কারবার। এ-কারবারে বড়ো-বড়ো শহরে পেশাদারি বেবুশ্যেরা ল'ড়ে যায়। শনিচরী এ-অঞ্চলে এ-পেশায় এসেছে। জায়গাটি শহর নয়। তোহরিতে বেবুশ্যেও অগণন নয়। তাই শনিচরী যা বলবে, মানতে হবে।

শুধু কাঁদলে একরকম রেট।

কেঁদে লুটোলে পাঁচটাকা একসিকে।

কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচটাকা দু-সিকে।

কেঁদে বুক চাপড়ে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানে লুটোপুটি খেলে ছয়টাকা দিতে হবে।

কিরিয়াতে কাপড় চাই। সে-কাপড় কালো থান হ'লেই ভালো।

এ হ'লো রেট। তারপর, রাজালোক তুমি, চালের সঙ্গে ডাল-নিমক-তেল দিলে না-হয়? লক্ষ্মী বেঁধেছ ঘরে, ও চাল-তেল তোমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু শনিচরী তোমার নামযশ গাইবে দিকে-দিকে।

সুন্দর চলতে লাগল কারবার। ভৈরব সিঙের শবযাত্রায় যারা কেঁদেছিল, তাদের আনাটা যেন মানের লড়াই হ'য়ে দাঁড়াল। ক্রমে লালা এবং সাউরাও ডাকতে লাগল শনিচরীকে। গোকুল লালার বাবা মরতে গোকুল বলেছিল, 'কিরিয়া অবধি রোজ আসবি, শনিচরী।'

রোজই গোকুল ওদের ছাতু ও গুড় দিত। বলত, তোদের দিলে পুণ্য হবে।

গোকুল কাপড়ও দিয়েছিল ভালো। মালিক-মহাজনের মতো সবচেয়ে শস্তার কাপড় খোঁজেনি। বিখনি সে-কাপড় দুটো হাটে বেচে দেয়।

গোকুলের বাড়ি পাওনা-খোওনার কথা শুনে দুলন বলল, 'এ বেশ ভালো কথা মনে হ'লো। এরপর যেখানে যাবি, সেখানে কিরিয়া পর্যন্ত যাওয়া-আসাটা রাখিস। রুদালী দেখলে তারাও কিছু-না-কিছু দেবে। এ-সময়ে কেউ অত হিশাব কষে না।'

—'হ্যাঁ, তারাও দেবে।'

শনিচরী অবজ্ঞা জানাতে তামাকে ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'নিজের বাপভাই মরলে চোখে জল পড়ে না, কিরিয়ার খরচের হিশাব কষে? গঙ্গাধর সিঙের মতো লোক জেঠা মরতে মুর্দায় ঘিউ মাখাল না, দালদা মাখাল, তা জানো?'

—'ওরা নিজেরা কাঁদলে তোদের কী হবে?'

—'একটু কাঁদতে তো পারে।'

—'যাক। কাজের কথা শোন।'

—'বল।'

—'বড়োলোকের কাণ্ড। নাথুনি সিঙের মা কিন্তু মরছে। নাথুনির ঘর তো দূরে। নাথুনি বলেছে তোদের পাত্তা লাগাতে।'

—'মরছে! মরেনি তো।'

—'আরে, নাথুনির কথা শুনলে তবে বুঝবি এদের মনে কত পাপ থাকে।'

—'নাথুন সিঙের যত জমিজমা সবই তো ওর মায়ের দৌলতে। ওর মা কে, তা জানিস?'

—'না। তোমার মতো এ-তল্লাটের সকলের কুলুজি-কুষ্ঠির খবর কে রাখে তাই বলো?'

—'ওর মা হ'লো পরাক্রম সিঙের একমাত্র বেটি। পরাক্রম সিংঙের জুলুম ছিল কত। যখন ছোটো ছিলাম তখন দেখেছি খাজনাই জুলুম উঠিয়ে ওর প্রজা, বুড়ো 'হাঁথিরাম মাহাতোকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে, ঘোড়া ছুট করিয়ে পরাক্রম সিং হাঁথিরামকে মেরে ফ্যালে।'

—'আমিও শুনেছি।'

—'পরাক্রমের সব সম্পত্তি পায় নাথুনির মা। সেই মার দৌলতে ওর যত বোলবোলা আর গরম। সেই মা আজ কতদিন হ'লো খোঁখির ব্যারামে ভুগছে। কাশলে তাজা খুন ওঠে। রোগ নাকি খুব ছোঁয়াচে।'

—'না-না, বুধুয়ার তো হয়েছিল।'

—'বুধুয়া ছিল ভালো লোক। নাথুনির মা নিশ্চয়ই মন্দ লোক?'

—সে যাক গে। কী বলছিলে?'

—'নাথুন এমন যোগ্য ছেলে, যে মাকে উঠোনের ওপাশে একটা ঘর তুলে তাতে রেখে দিয়েছে। খাটিয়ার সঙ্গে একটা রামছাগল বেঁধে রেখে দিয়েছে, বাস্, ওহিতক্ ইলাজ। না হেকিমি না কবিরাজি বৈদ্য চিকিৎসা না ডাক্তারি সুঁই-ইলাজ। এখনও বুড়ি বেঁচে। নাথুনি চন্দন কাঠ, শাল কাঠ আনাচ্ছে খুব খুব উঠাকে মাকে জ্বালাবে! মা মরলে কিরিয়াতে দানের কাপড় আসছে গাঁঠ-গাঁঠ। কিরিয়াতে ব্রাহ্মণ খাওয়াবে ব'লে ঘি-চিনি-ডাল-আটা এনে মৌজুদ করছে। বাসনও দেবে, বাসন আনাচ্ছে।'

—'হা ভগবান, এখনও তো মরেনি!'

—'মা সারাদিন হেগে-মুতে প'ড়ে থাকে। বিকেলে একবার মোতি দুসাদিন সাফ ক'রে দেয়। এখন দুসাদিন ছুঁলে মায়ের জাত যাচ্ছে না। একটা দাই ঠিক করেছে — সে রাত্রে বুড়ির ঘরে ঘুমোয়। মা বেঁচে আছে, তাকে বাঁচাতে একটা টাকা খরচ করবে না, কিন্তু মাকে দাহ করতে, মায়ের কিরিয়া করতে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করবে নাথুনি।'

—'তাই বলছে?'

—'খুব চিল্লাচ্ছে। তাই তো বলি ওদের উলটা হিশাব। জিন্দা মানুষকে দেখবে না। ম'রে গেলে ধুমধামে কিরিয়াকাজ ক'রে মান উঠাবে। এই শীতে বুড়ির গা থেকে রেজাইটা টেনে নিয়ে কাঁথা দিয়েছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি মরলে নাথুনি বাঁচে। এদের বাড়ি নিয়মিত যাস কিরিয়া অবধি।'

—'যদি কিছু না-দেয়?'

—'দেবে রে দেবে। না-দিলে নাথুনি গোকুল লালার কাছে হেরে যাবে না? নিন্দে হবে ওর জাতভাইয়ের কাছে।'

কথায় বলে, মাঘের শীত বাঘের গায়ে। মাঘের শীতে ঠাণ্ডা লেগে নাথুনির মা ম'রে যায়। কিরিয়া অবধি যায়-আসে শনিচরী। নাথুনির তিন বউ। বড়োবউ বিরস বদনে শনিচরীদের আটা ও গুড় দেয় রোজ। বলে, 'বুড়ো হ'য়ে মরেছে, তার কিরিয়াতে অত খরচ কেন?'

নাথুনির মেজোবউ অত্যন্ত ধনী জোতদারের একমাত্র মেয়ে। ধনী জোতদারের একমাত্র মেয়েকে বাপ বিয়ে করেছিল ব'লে নাথুনি মাতৃধনে ধনী। সেও অনুরূপ

বিয়ে করতে চেয়েছিল। কপাল মন্দ, বড়োবউ ও ছোটোবউ একতমা নয়। একতমা একা মেজোবউ। সে আবার স্বামীর ঘরকে গরিবের ঘর মনে করে ও সতিনদের বিষনজরে ছাখে। রাগের কারণ হ'লো বড়ো ও ছোটোবউ ছেলের মা, সে মেয়ের মা। অতএব লোকচক্ষে হেয়। বড়োবউয়ের কথা শুনে সে ধারালো হেসে বলে, 'কিরিয়াতে তিরিশ হাজার টাকা কি একটা টাকা হ'লো? শত বছর বাঁচুন আমার বাপ, কিন্তু তিনি মরলে দেখিয়ে দেবো কিরিয়া কাকে বলে?'

বড়োবউ বলে, 'তা তো খরচ করতেই হবে। তোর পিশির নাপিত দোষ হয়েছিল, সে কলঙ্ক ঢাকতে হবে না?'

—'হাসালে, দিদি। আমার পিশির নাপিত দোষ? আমার পিশের বাস যে গয়া শহরে সবাই জানে। তোমার বোন যে ভাশুরের ঘর করে বিধবা হ'য়ে, সে-কথা তো বলছ না?'

এই থেকে তুমুল কলহ বাধে, কিন্তু মেজোবউ পুণ্যবতী। তার কথা ভগবান শোনেন, এবং বসন্ত রোগে মরতে বসে মেজোবউয়ের বাপ। মেজোবউ শনিচরীকে ডেকে পাঠায়। বলে, 'শনি-মঙ্গলের মড়া দোসর খোঁজে, এ-কথা সত্যি? নইলে শাশুড়ি মরল, সঙ্গে-সঙ্গে আমার বাবার চেচক হ'লো কেন? শোন শনিচারী, এই একটা টাকা বখশিশ।'

—'চেচক?'

—'হ্যাঁ রে।'

শনিচরী খুবই হ্যাকা সাজে ও বলে, 'তবে যে শুনি আপনাদের, উঁচা জাতের, চেচক হয় না, চেচক হয় শুধু নিচু জাতে? আমাদের ঘরে? সেইজন্যে তো আমরা গোরমেনের টিকা ভি নিই, ঔর দেওতার পূজাও লাগিয়ে দিই।'

—'গোরমেনের টিকা গোরক্ত।'

এ-কথা ব'লেই নাথুনির মেজোবউ টিকা-প্রসঙ্গে ছেদ টানে ও বলে, 'তুই তো তখন ছিলি? বড়োবউয়ের সঙ্গে আমার গরম-গরম কথা হ'লো? তা, যে-কথা সে-কাজ আমার। বাপ বিনে কেউ নেই আমার। এখানে বাস করি শত্রুপুরীতে। ছেলের মা যারা, তাদেরই আদর যত, আমি তো মেয়ের মা।'

—'আপনারও আদর আছে।'

—'সে কি আমার আদর? আমার বাপ মোহর সিংয়ের টাকার আদর। বাপ আমাকে দূরে বিয়ে দিতে চায়নি, তাতেই তো সতিনের ঘর করছি। নইলে চৌহান রাজপুত আমরা, এ-ঘরে বিয়ে হয়?'

—'কপালে যা লেখা আছে।'

—'তা-ই সত্যি রে। শোন, আমি চললাম বাপের কাছে। তুই আর বিখনি তো যাবি, আরো বিশটা রাণ্ডি নিয়ে যেতে হবে। তাদের দেবো একশো টাকা, ঔর চাল। তোদের দুজনের পঞ্চাশ টাকা ঔর চাল। কিরিয়াতক ওখানেই থাকবি, খাবিদাবি, ঔর কিরিয়াতে কাপড়লত্তা নিয়ে তবে আসবি।'

—'হুজুরাইন, আপনার বাবা তো মরেননি।'

—'প'চে গেছে গা, খুব জোয়ান দেহ, অত দুধ-ঘি খাওয়া শরীর। অমন শরীর ছেড়ে প্রাণ বেরোতে চায়? আমার শাশুড়ি মরতে তোদের মোটা চাল, খেসারির ডাল দিয়েছিল।'

—'ঔর তেল, লবণ, মিরচা।'

—'কত দিয়েছিল তা আমি জানি না? আমার বড়ো সতিনের হাতটা যে কত বড়ো, সে কি আমার জানা নেই? আমি দেবো চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু আর গুড়।'

—'হুজুরাইন গরিবের মা-বাপ।'

—'তবে হ্যাঁ, কান্নার মতো কান্না হওয়া চাই।'

—'কাঁদব, ঔর মাটিতে লুটাব?'

—'মাটিতে লুটাবি।'

—'মাটিতে লুটাব, ঔর মাথাও ঠুকব?'

—'মাথাও ঠুকবি।'

—'কপাল কেটে যাবে।'

—'আরো পাঁচ-পাঁচ তোদের দুজনের। টাকাটা কোনো ব্যাপার নয়, শনিচরী, আমার বাপের দাহ ঔর কিরিয়া এমন হবে যে, গল্প র'য়ে যাবে মুল্লুকে। দেখে আমার স্বামী আর সতিনরা হিংসেয় জ'লে-পুড়ে মরবে। আমি এক বাপের এক মেয়ে। বাপ যা রেখে যাচ্ছে, তার মান রেখে কিরিয়াদাহ ক'রে দেখিয়ে দেবো। রোজ রুপোর গেলাশে দুধ খেয়েছে, জওয়ানিতে রাণ্ডি রেখেছে, বুড়ো হ'লেও রাণ্ডি রেখেছে। বিলাইতি বিনে মদ খায়নি। আমাকে দুঃখ দেবে নতুন বউ, তাই মা ম'রে গেলে বিয়ে করেনি।'

—'কিছু টাকা দিন, বাজারী রাণ্ডি লোগ্‌কে আগাম দিতে হবে। ওরা কি কম খচড়াই?'

—'নে।'

সমগ্র ব্যাপারটি বহুমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। মালিক-মহাজনের ঘরে মানুষ মরলে দাহ-কিরিয়াতে যত খরচ হয়, তার মান নিমেষে উঠে যায়। রুদালীদের সম্মানও ওঠে। ফলে বরাদ্দের বাইরে যে-খরচ হয়, তা তুলে নেয় মালিকরা দুসাদ, ধোবি, গঞ্জু, কোলদের ঘাড় ভেঙে। সর্ব অর্থেই মোহর সিংয়ের অন্ত্যেষ্টি গল্প কথা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং খরচের সিংহভাগ নিয়ে যায় ব্রাহ্মণরা। নাথুনির বউ আর স্বামীগৃহে ফেরে না। শ্বশুরের সম্পত্তি যাতে নাথুনি না-পায়, সেজন্যে মেয়েদের বিয়েতে অসাগর খরচ করতে থাকে। অবশ্য তা কয়েক বছর বাদে।

শনিচরী তার সৌভাগ্যের কথা দুলনকে বলল। দুলন ফচফচ ক'রে বিশ্রী হেসে বলল, 'কলিয়ারিতে সবাই ইউনাইন করে। তা রুদালী ওর রাণ্ডিদের নিয়ে তু ইউনাইন বনা দে এক? তু বন যা পিসিডেন।'

—'হায় রাম!'

—'এখন বাজারিয়া রাণ্ডি খোঁজ গে?'

—'কৈছন?'

বিখনি হুঁকো নামিয়ে বলল, 'এনে দেবো রাণ্ডি। মালিক-মহাজন যত মেয়েকে নষ্ট করে তারা রাণ্ডি হয়।'

—'দুর, ওরা একটা আলাদা জাত।'

—'না-না। তুই জানিস না।'

তোহরিতে হাট বারে গেলে মেলাই রাণ্ডি।

দুলনের কী মনে পড়ল, বলল, 'আরে শনিচরী, নওয়াগড়ের গম্ভীর সিংকে জানিস?'

—'বাবা! তা জানব না? হাঁথি চ'ড়ে সে দেওয়ালির মেলায় ঘুরে? এই এত বড়ো নাক আর গলায় ঘ্যাগ।'

—'খুব খারাপ কাজ করল।'

—'নতুন কী কাজ করল?'

—'ওর তো বাঁধা রাণ্ডি মোতিয়া। তাকে বউয়ের সম্মানে রেখেছিল। মোতিয়ার মেয়ে গুলবদনকে রুপার মল পরিয়ে কোলে নাচাত। মোতিয়া ম'রে যেতে গুলবদনকে শাদি দেবে বলেছিল। আজ দেখি সেই গুলবদন তোহরি যাচ্ছে। কেঁদে-কেঁদে চোখ লাল। বলল, "জনম দিতে জানে, পালপোষ করতে শেখেনি। বের ক'রে দিল আমাকে।" আমি শুধালাম, "কেন?" ও বলল, "বুড়ার ভাতিজা খুব নাখারা জুড়েছে কতদিন। বলতে গেলাম, তা আঁখ মোটা

ক'রে বলল, মা ম'রে গেছে তিন মাহিনা, তুই কেন ঘর জুড়ে ব'সে আছিস ? ভাতিজা কি বলে শুনতে হ'লে শোন, নয়তো চ'লে যা। রাণ্ডির মেয়ে, তোর ভাতের অভাব কী ?"

—'বহোৎ হারামি তো ?'

দুলন গলা ঝেড়ে কাশল। বলল, 'আমার মনে দুখ উঠে গেল। গুলবদন বলল, "ওর ভাতিজার কাছে থাকব, নিজের মেয়েকে এ-কথা বলতে পারত ? ওর থাকি যদি আমার সন্তান হবে না ? তারাও একদিন লাথ খেয়ে বেরোবে তো ? তাই হবে, বাজারে যাবো।"

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, 'অমন রূপ। ওকে কোনো শেঠ তুলে নিয়ে যাবে।'

বিখনি বিজ্ঞের মতো বলল, 'নিজের মাকে দেখেছে। ও কি আর বাঁধা রাখনি হবে ?'

বিখনি গেল তোহরি। ফিরে এসে বলল, 'বাপরে. মাইরে ! টাকা পাবে বলতে রাণ্ডিদের ভিড় জ'মে গেল !'

—'দেখলি ওদের ?'

—'দেখলাম।'

—'কেমন দেখলি ?'

—'চার আনার রাণ্ডি সব. বুড়ো হ'য়ে গেছে। কষ্ট খুব, তব ভি সুর্মা প'রে ডিবরি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। বুড়ো মরেছে জানলেই চ'লে আসবে। ভালো কথা !'

—'কী ?'

—'বুধুয়ার বউ, তোর বেটার বউকেও দেখলাম।'

—'তোহরিতে ?'

—'হ্যাঁ। তোর চেয়েও বুড়ো হ'য়ে গেছে।'

—'থাক ওর কথা।'

—'ও নিজেই পরিচয় দিল। আজ দশ বছর ওখানে আছে। ছেলের কথা শুধাল।'

—'তুই কী বললি ?'

—'কী বলব ? কেন বলব ? কথাই বলিনি।'

—'বেশ করেছিস।'

ধুঁধুলের তরকারি আর আটার লেট্টি খেতে-খেতে শনিচরীর বউয়ের কথা মনে পড়ল। খিদেটা খুব বেশি ছিল। কোন বছর যায়? সে-বছর লাইনে হাতির পাল উঠেছিল আর একটা দাঁড়ানো ইঞ্জিনও ফেলে দেয়। বুধুয়া মরার বছর। ঐ টোকো আম গাছটা ছিল এতটুকুন, এখন ফল দিচ্ছে। দশ বছর তোহরিতে। ভালো হয়েছে, হরোয়া ভেগে গেছে কোথা। মায়ের পরিণতি জেনে যায়নি।

খাওয়ার পর দুজনেই তামাক খেলো। শনিচরী বলল, 'ওর করম! বুধুয়া মরলেও ওকে আমি ফেলতাম না।'

—'না-না, তাই ফেলিস কখনও?'

—'খুব গরিব দেখলি?'

—'খুব।'

শনিচরীর মুখে আর কথা জোগাল না।

তারপর মোহর সিং মরল।

বিশাল ধুমধামে কিরিয়া হ'লো। রাণ্ডি বুড়িয়া শনিচরী আর বিখনিকেই নমস্কার ক'রে বলল, 'হজুরাইন! আবার দরকার হ'লে পাত্তা চালিয়ে দিয়ো। এসে যাবো।'

শনিচরী আর বিখনি কাপড়ের সঙ্গে ফনফনে পেতলের সরা আর বাঁশের ছাতাও পেয়েছিল। বিখনি সেগুলো হাটে বেচে দেয়। টাকা হাতে থাকতে-থাকতেই পোক-কাটা ভুট্টা কেনে বোরোবোঝাই। বলে, 'জাঁতায় পিষলে আটা হবে, ভাঙলে দালিয়া হবে, বুঝলি?'

ক্রমে জীবনটায় শৃঙ্খলা আসে। কেউ মরলে বাঁধা রোজগার। নইলে বাকি সময় আধপেটা সিকি পেটা খাও। না-জুটলে? কোই পরোয়া নেহি। বছরে একটা-দুটোর বেশি কাঁদার বরাত জোটে না। কাজেই সকলের মতো জুটলে খেত-মজুর খাটো, নয়তো মালিকের খেত গুঁড়োও, জঙ্গলে গিয়ে মূল-কন্দ খোঁজো, সকলের মতো।

বিখনিই সবাইকে অবাক ক'রে দিল। ছেলেকে দেখতে গেল না একবারও, শনিচরীর উঠোনে লঙ্কাগাছ আবজে লঙ্কা বেচল হাটে। তারপর বলল, 'রশুন বুনে দেখতে হবে। রশুন বিকোয় ভালো।'

ক্রমেই ওদের সুনাম বাড়ল। শনিচারীদের সবাই ডাকতে থাকল। হ্যাঁ, পয়সা নেয়। কিন্তু সত্যিই মাথা ঠোকে, সত্যিই গড়াগড়ি যায় মাটিতে। আর মৃতের যশোগাথা যে কতরকমে গেয়ে কাঁদে। শুনলে মৃতের আপনজনদেরও মনে

হ'তে থাকে যে মরেছে, সে হাড়বজ্জাত, শয়তানের দোসর নয়। সে স্বর্গের দেবতা, ছলতে ধরাধামে জন্মেছিল।

চমৎকার চলছিল সব। দু-বছর খুবই মন্দা যায়। নাথুনির বড়োবউয়ের ভাই শোথ জ্বরে মরতে বসেছিল, হাসপাতালে গিয়ে সেরে আসে। শনিচরীদের প্রত্যক্ষ মহাজন লছমনের বিমাতার আচরণ আরো মর্মান্তিক। বাতজ্বরে নিশ্চিত ছিল মৃত্যু, কিন্তু, কোত্থেকে এক সর্বনেশে বৈদ্য এসে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলল।

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নসিব।'

নাপিত পরেশনাথও খুব অসন্তুষ্ট হ'লো। বলল, 'এ-ধরম কি বাত না হ্যায়।'

—'কৈছন?'

—'দেখ না তু, বুধুয়াকে মা! আগে-আগে মানুষের রোগভোগ হ'লে মানুষ মরত। জনমকে সাথ-সাথ মরণ ভি চলনা চাহিয়ে। নইলে ধরতির কাম চলে? অসুখ হ'লে বুড়োমানুষ মরবে। তা না, ডাক্তার-বৈদ্য-হেকিম—সবাই বুড়ো-গুলোকে বাঁচিয়ে তুলছে! এ তো ঠিক কাজ নয়, বুধুয়াকে মা!'

শনিচরী নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তোমার কী, বলো! জন্মে-বিয়েতে-মরণে তুমি আছো। বিয়ের কথা পাড়তেও তোমাকে লাগে। কিন্তু আমার কী অবস্থা হ'লো তা বলো!'

বিখনি কিন্তু হতাশ হ'লো না। বলল, 'সময় হয়নি, তাতেই মরল না। সময় হ'লে কি কেউ থাকবে?'

দুলন বলল, 'এ কিছু নয় রে। আগের চেয়ে আজকাল বেশি খাস, তাতেই একটু এদিক-ওদিক হ'তে চিন্তা হচ্ছে। মালিক-মহাজনকে দেখিস না? লছমন সিংয়ের সৎমা তো গম বেচা টাকা দেখলে কাঁদতে বসত। এ-বছর গম হয়েছে, বেচে টাকা পেলাম। আগামী সনে যদি তেমন গম না-হয়?'

শনিচরী বলল, 'যাও, সব কথায় কি তামাশা চলে?'

তারপর শনিচরীর কপাল খুলল, এই বছর। বিখনি হাসতে-হাসতে এসে বলল, 'খুব ভালো খবর।'

—'কী?'

—'সে ব'সে বলতে হবে।'

—'খবরটা কী?'

—'রাগ করছিস?'

—'কী খবর, তা বলবি তো?'

—'গম্ভীর সিং তো মরছে।'

বিখনি সব খুলে বলল। খবরটা দিয়েছে পরেশ সাউ। নাপিতের দেওয়া খবর মিছে হয় না। নাথুনির মায়ের খোঁখির ব্যামো হয়েছিল, শনিচরীর মনে আছে নিশ্চয়।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে আছে খুব। বলুক না বিখনি।

নাথুনি তার মাকে যেভাবে রেখেছিল, সে-নিয়ম এখন ঘরে-ঘরে চলছে। খোঁখি মানে রাজযক্ষা। শিবের অসাধ্য রোগ। এ-রোগ যাকে ধরেছে, তাকে চিকিৎসা করালে স্বয়ং শিবঠাকুরকে অপমান করা হয়। গম্ভীর সিংয়ের আপন বলতে কেউ নেই। ভাতিজা সব পাবে। বুড়োর খোঁখি রোগ ধরতে ভাতিজা তড়িঘড়ি উঠোনে ঘর তুলেছে। গম্ভীর সিংকে সেখানে রেখেছে। রামছাগল এনে ঘরে বেঁধেছে। রামছাগল দেখে গম্ভীর সিং বলেছে, 'ঘরে বতু বাঁধলে কেউ তো বাঁচে না। আমি কি বাঁচব না? না-বাঁচলে এমন কিরিয়া করবি যে, দেখে সবাই তাজ্জব ব'নে যায়। সবাই শোচে যে হ্যাঁ, মানুষ একটা মরেছে বটে!'

—'তারপর কী হ'লো?' বিখনি বলুক।

—'গম্ভীর সিং খুবই আজীব লোক। এখন সে ওষুধ-বিশুধ ছেড়ে রোজ পুজো হোম যজ্ঞ করাচ্ছে। ওর বউ জেদ ক'রে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তারও ভরসা দিচ্ছে না।'

—'মরেনি তো এখনও?'

—'মরবে তো। ভাতিজার করার নেই কিছু। বুড়ো ভকিলকে ডেকে কিরিয়া-কাজে লাখ টাকা খরচ করতে বলেছে।'

—'কেন?'

—'বলছে, সব টাকা ফুরিয়ে রেখে যাবো। ভাতিজা জোতজমা চাষ করিয়ে যা পারে করুক। আমার ছেলেপিলে নেই। ঐ বজ্জাতের জন্যে নগদ টাকা রেখে যাবো না।'

—'তাহ'লে?'

—'আজ না-হোক কাল, বুড়ো মরবে।'

—'ততদিন?'

—'আমি একবার ঘুরে আসি।'

—'কোথায় যাবি?'

—'রাঁচি।'

—'রাঁচি ? কেন ?'

—'আর বলিস কেন ? হাটে আমার দেওরপোর সঙ্গে দেখা। সে বলে, "চাচি, একবার চলো।" তার মেয়ের বিয়ে।'

—'মেয়ের বিয়ে ?'

বিখনি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বলছে সে-বিয়েতে নাকি সে-হতভাগাও আসবে। আমার ছেলেটা। তুই বলবি ছেলেকে দেখতে চাস তো ঘরের কাছে তার শশুরালে যা! সে আমি যাবো না। কিন্তু দেওরপোর বাড়ি গিয়ে একবার দেখে এলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। সেও জানবে না যে তাকে দেখতে এসেছি।'

শনিচরী বলল, 'এ-কথা বললে আমি বলব না কিছু। ছেলেকে দেখবি বলছিস। তবে ঝটপট আসবি তো ? না, থেকে যাবি সেখানে ?'

—'তা থাকি কখনও ? ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, পথে তোর সঙ্গে দেখা। সেদিন তুই না-থাকলে আমি কী করতাম ?'

—'গম্ভীর সিংয়ের কথাটা মনে রাখিস।'

—'আরে, আমি চারদিনের মাথায় ফিরব।'

মাইল তিনেক হেঁটে গেলে বাসরাস্তা। শনিচরী ততখানি পথ গিয়ে বিখনিকে তুলে দিল বাসে। বলল, 'সিটে বসলে আট টাকা। মেঝেতে ব'সে চ'লে যা, দুটো টাকা দিস।'

গ্রামে ফেরার পথে শনিচরী বুঝল, এ-রকম উত্তেজনার ঘটনা তার জীবনে আর ঘটেনি। তার সহেলি বিখনি, যে হাঁটা পথ ছাড়া অন্য পথ জানে না, সে বাসে চেপে রাঁচি চ'লে গেল ? দেওরপোর মেয়ের বিয়ে দেখবে ব'লে ? মানুষের দেওরপো থাকে কাছেভিতে। রাঁচির মতো বড়ো শহরে থাকে ?

শনিচরী সকলকে গল্প করতে-করতে এলো। সবাই বলল, শনিচরীর জীবনে সবটাই হ'লো নিদারুণ দুঃখ। তবে বিখনিকে পাওয়া একটা আশীর্বাদ ওর পক্ষে। কী খাটিয়ে-পিটিয়ে বুড়ি! শনিচরীর ঘরের চেহারাটাই ফিরে গেছে এখন। একেই বলে নিয়তির খেলা। কোথায় বাড়ি, কোথাকার কে—সে-ই হ'লো আপনজন। যেন কোন গাছের বাকল কোন গাছে জোড়া লাগল।

ঘরে ফিরে শনিচরীর মন বসে না আর। অবশেষে ও গেল জঙ্গলে জ্বালানি কুড়োতে। শুকনো ডালপালা ব'য়ে নিয়ে এলো খানিক। বিখনি কখনও খালি হাতে ফেরে না। নয় দুটো শুকনো ডাল, নয় একটা পথে প'ড়ে-থাকা দড়ি, নয় একতাল গোবর, যা-হয় কিছু একটা নিয়ে ঘরে ঢোকে। এখন ওর মাথায় ঢুকেছে,

কারো একটা বকনা বাছুর পেলে পালানি নেবে। শনিচরী ভেবে পায় না, এই বুড়ো বয়সে সংসারে এত মায়া কেন ওর।

কয়েকদিন এইভাবে গেল। গম্ভীর সিংয়ের অবস্থা প্রত্যাশিতভাবে মন্দ হ'তে থাকল, সেখানে গেল শনিচরী একদিন। গোমস্তার সঙ্গে সব কথাবার্তা ব'লে নিল। কথায়বার্তায় এখন জানা গেল, বলা হচ্ছে খোঁখির ব্যামো। কিন্তু গম্ভীর সিং মরছে অন্য রোগে। অশুমার নারীসঙ্গ করার ফলে দেহে ঘৃণ্য রোগ। শরীর গ'লে-প'চে যাচ্ছে। সেই জন্যেই এত যাগযজ্ঞের ঘটাপটা। রোগের জ্বালাতেই ওষুধবিশুধ না-খেয়ে গম্ভীর সিং মরণকে কাছে ডাকছে।

—'শুক্লপক্ষে মরতে চায়।'—গোমস্তা বলল।

—'কৈছন ?' —শনিচরীও তাজ্জব। মালিক-মহাজন সব পারে, তা ব'লে ইচ্ছে হ'লে শুক্লপক্ষেই মরতে পারে ?

—'কে জানে ?'—গোমস্তা দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে বলল, 'শুক্লপক্ষে মরলে সিধে বৈকুণ্ঠ। কৃষ্ণপক্ষে মরলে যুধিষ্ঠিরের মতো প্রথমে নরকদর্শন, তার পরে স্বর্গবাস।'

পুরাণের চরিত্রগুলি সম্পর্কে শনিচরীর বিশেষ গভীর জ্ঞান নেই। তবু তাদের মহত্ত্ব বিষয়ে তার আনুগত্য আছে। ক্যালেণ্ডারে যুধিষ্ঠিরের ছবি দেখার ফলে তার মনে ত্রিলোক কাপুর ও যুধিষ্ঠির, অভি ভট্টাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি-ইত্যাদি একাকার। শনিচরী তাই অবাক হ'য়ে বলে, 'কৈছন ? হাঁ হুজুর, মালিক-পরোয়ার কা যুধিষ্ঠির হায় ?'

গোমস্তা এই অজ্ঞ স্ত্রীলোককে শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে দেয়। মালিক-মহাজন যা বলে, তা-ই হয়। পাপ এবং পুণ্য হ'লো দেখার ভুল। দুষ্ট লোকে বলবে, যে মালিক-পরোয়ার, বাপ বেঁচে থাকতে ডাকাতি করেছে আংরেজ আমলে, স্বাধীন ভারতে একাধিক লাশ স্বহস্তে ফেলেছে, লছমনের বাপের ঘোড়া চুরি করেছে, দুসাদটোলি স্বহস্তে জ্বালিয়েছে, মেয়েছেলেদের বহুজনকে নষ্ট করেছে, সে মহা-পাপী। মালিক নিজে তা মনে করে না। তাই কী পাপে তার মহাব্যাধি হ'লো, তা জানার জন্যে বাড়িতে জ্যোতিষী-গণকের মেলা বসেছে।

—'কুছ পাত্তা মিলা ?'

—'কা পাত্তা ?'

—'য়ো পাপ কা ?'

—'জরুর, গাভীন একটি গোরুকে বালককালে মালিক ঠ্যাঙা ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল, এই একমাত্র পাপ।'

—'তবুও বলি, ইচ্ছে হ'লেই মালিক গুরুপক্ষে মরবে?'

—'নিশ্চয়। এখন অবধি দেখলাম না, মালিক যা চেয়েছে যা হয়নি। তবে এও ব'লে দিচ্ছি, মালিক যা করছে, তা খুব ভালো করছে। ঐ ভাতিজার হাতে পড়লে সম্পত্তি উঠে যাবে লাটে।'

—'কেন?'

—'মালিক যা করেছে, অছুত হ'লেও সব হিন্দুঘরে। কোনো মেয়েটা অহিন্দু নয়, ভাতিজার রাণ্ডি তো মুসলমান।'

—'হায় রাম!'

—'তৈরি থাকিস বাপু। অ্যাদ্দিন চাকরি করলাম। কিরিয়া হ'য়ে গেলে আর এখানে থাকছি না। কিরিয়াও হবে, আমিও চ'লে যাবো। মালিক বলেছেন মোহর সিংয়ের দাহ ঔর কিরিয়া যেন মানুষ ভুলে না-যায়, এমন ব্যাপার করতে হবে।

—'জান লড়িয়ে দেবো, হুজুর।'

শনিচরী ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরল দুর্ভাবনা নিয়ে। দিনে-দিনে ছয়দিন হ'লো। বিখনির ব্যাপার কী? গ্রামটাও ওদের অজগ্রাম। বাইরের জগতের সঙ্গে কাজ-কারবার নেই মোটে। বাসে চ'ড়ে কেউ কোথাও যায় না। রাঁচি থেকে বিখনির খবর কে এনে দেবে? নিশ্বাস ফেলে শনিচরী কাঁথা বিছানা রোদে দিল। চারটি ভুট্টা জাঁতায় ভাঙল। তারপর গেল পঞ্চায়েতি চালাঘর মেরামত করতে। এ-কাজে মেহনত দেওয়া বাধ্যতামূলক। সর্বদা দেখাশোনা না-করলে মাটির ঘর দিমাগ লেগে ঝুরঝুরে হ'য়ে যায়। সে-কাজ সেরে চারটি ডালপালা মাথায় ব'য়ে ঘরে এসে বোঝা নামিয়ে তবে ও লোকটাকে দেখল।

অচেনা লোক। মাথা ন্যাড়া, খালি পা।

—'বিখনি ম'রে গেছে?'

শনিচরী যেন নিমেষে বুঝল সব, আর প্রশ্নটা করল। বলল, 'তুমি তার দেওরপো?'

—'জি।'

শনিচরীর ভেতরে তখনই ধস নামল। কিন্তু বহু মৃত্যু, বহু বঞ্চনা, বহু অবিচারে গঠিত ওর ধৈর্য ও সংযম। ও আগন্তুককে বসতে বলল। নিজেও বসল; চুপ ক'রে রইল বহুক্ষণ। তারপর আস্তে বলল, 'কতদিন হ'লো?'

—'চারদিন।'

শনিচরী আঙুলে গুণে দেখে বলল, 'সেদিন আমি গম্ভীর সিংয়ের বাড়িতে। কী হয়েছিল ?'

—'হাঁপানি থেকে বুকে কফ ব'সে গেল।'

—'এখান থেকে যেতে-না-যেতেই ?'

—'পথে ঠাণ্ডাই শরবৎ খেয়েছিল।'

—'তারপর ?'

মনে পড়ছে, রঙিন শরবৎ, হজমিগুলি, বেলের মোরব্বা—এ-সব কিনে খাবার দিকে বিখনির বড়ো লোভ ছিল।

—'তারপর হাঁপানি উঠে গেল। আমার শালা হাসপাতালের কাজ করে। ডাক্তার দেখলাম, সুঁই-ইলাজ করালাম।'

—'আমি কোনোদিন তা করিনি।'

বেনেতে দোকানে ঝাঁটা চালিয়ে জখম ক'রে আরশোলা ধরত শনিচরী। মেটে হাঁড়িতে আরশোলা সেদ্ধ ক'রে জলটা খেতে দিত। বিখনির হাঁপের টান ক'মে যেতো।

—'ওর ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?'

—'সে আর এলো কোথায় ? এখন তাকেও খবর দিয়ে যাবো। জেঠাইন কি আপনার কাছে কিছু রেখে গিয়েছিল ?'

—'কিছু না। জেঠাইন বলছ, মরল ও তোমার কাছে, তার কেউ আছে ব'লেই তো জানি না। পথে-পথে ঘুরছিল…'

—'আমিও জানি না। জানলে নিয়ে যেতাম।'

—'এখন এসো, বাছা। বাসে যাবে, বাসরাস্তাও দূরে।'

লোকটি চ'লে গেল। শনিচরী এখন একা ব'সে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করল, কী হচ্ছে মনে ? দুঃখ ? না, দুঃখ নয়, ভয়। স্বামী মরেছে, ছেলে মরেছে, নাতি চ'লে গেছে, বউ পালিয়েছে। দুঃখ শনিচরীর জীবনে কবে ছিল না ? তখন এমন আগ্রাসী ভয় হয়নি তো ? বিখনি ম'রে যেতে ওর পেশায় চোট পড়ল, ভাতে হাত পড়ল, তাতেই ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে কেন ? বয়স হ'য়ে গেছে ব'লে। শনিচরীদের জীবন, পারলে শেষ নিশ্বাস অবধি খেটে চলার জীবন। বয়স মানে জরা। জরা মানে কাজ করতে না-পারা। কাজ করতে না-পারা মানে মৃত্যু। শনিচরীর নিজের মাসি বুড়ো হ'য়ে গিয়েছিল। এত বুড়ো,

পোঁটলার মতো তাকে তুলে ঘরে নিতে হ'তো। শীতের দিনে রোদ পোহাতে তাকে বাইরে বসিয়ে সবাই কাজে গিয়েছিল। এসে ভাখে বুড়ি ম'রে কাঠ হ'য়ে আছে।

শনিচরী তেমন মৃত্যু চায় না। মরবে কেন? স্বামী মরল, ছেলে মরল, শনিচরী কি দুঃখে মরেছিল? দুঃখে মানুষ মরে না। প্রচণ্ড শোকের পরও মানুষ ক্রমে স্নান করে, খায়, লঙ্কাচারা খাচ্ছে দেখলে ছাগল তাড়ায়। মানুষ সব করে। কিন্তু না-খেতে পেলে মানুষ ম'রে যায়। শনিচরী এত শোকে যখন মরেনি, বিখনির শোকে মরবে না। দুঃখ আছে খুব, কিন্তু কাঁদবে না শনিচরী। পয়সা, চাল, নতুন কাপড় না-পেলে কাঁদাটা বাজে বিলাসিতা।

শনিচরী দুলনের বাড়ি গেল।

দুলন ব্যাপারটির সম্যক গুরুত্ব বুঝল। বলল, 'ভাখ, বুধুয়াকে যা। জমির দখল ছাড়তে নেই, তা তোহার লিয়ে যো রোনা-কাম জমিন হ্যায়। দখল ছাড়া চলবে না। তুই মজাটা দেখছিস না? একেকজন মরছে, তোরা যাচ্ছিস, ওরা কান্নাকাটির জাঁকজমক নিয়ে মানের লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছে। গম্ভীর সিংকেই ভাখ না। ওর যে-রোগ হয়েছে, তাতে ডাক্তারি ইলাজ করলে মানুষ সারে। ও সে-চেষ্টাই করছে না। মরলে জাঁকজমকের কথা ভাবছে।'

—'ওদের কীসে মান, কীসে লড়াই, ওরাই জানে।'

—'তোকেও জানতে হবে।'

—'জেনে কী করব?'

—'বুধুয়ার বাপ মরতে তার মজুরি-কাজ করিসনি মালিকের খেতখামারে?'

—'জরুর।'

—'বিখনি মরতে তার কামও করবি।'

—'কৈছন?'

—'নিজে যাবি।'—দুলন রেগে চেঁচিয়ে বলল, 'তোর রুটির ব্যাপার। নিজে যাবি।'

—'তোহরি?'

—'হ্যাঁ, তোহরি। যাবি, রাণ্ডি জোগাড় করবি। নইলে গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজা আর গোমস্তা সব টাকা মেরে দেবে।'

—'আমি যাবো!'

—'জরুর।'

—'সেখানে যে…'

—'বুধুয়ার বউ আছে, এই তো ?'

—'তুমি জানো ?'

—'জরুর। তো কা, য়ো ভি এক বরবাদী রাণ্ডি হায় না ? ওকেও ডাকবি।'

—'ওকেও ?'

—'জরুর। ওরও খেতে পরতে হয় না ? রাণ্ডি ডেকে কাঁদানো এক মজার খেলা। মালিক-মহাজনের টাকা পাপের টাকা। তার রয়-ক্ষয় নেই। পাক না চারটি বাজারিয়া রাণ্ডিরা। তাদেরও তো মালিক-মহাজন রাণ্ডি বানিয়ে কত-জনাকে লাথ মারে, মারে না ?'

—'মারে।'

কে কেমন রাণ্ডি হয়েছে সব কথা শনিচরী জানে না। কিন্তু মনে পড়ল পেটের জ্বালায় বুধুয়ার বউ ঘর ছেড়েছিল, গুলবদন গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজাকে 'ভাই' মনে করেছিল। কিন্তু গম্ভীর সিং বা ভাতিজা ওকে রাণ্ডি ছাড়া কিছু ভাবেনি। সব যেন বড্ড গোলমেলে। শনিচরী সব ভেবে দিশা করতে পারে না। কিন্তু দুলন কী বলছে ?

—'অত পাপপুণ্য দেখাতে যাস না, বুধুয়ার মা। পাপপুণ্য মালিকদের এক্তি-য়ারের জিনিশ। ওরাই সে-হিশাব ভালো বোঝে। তুই-আমি বুঝি খিদের হিশাব।'

—'সাচ বাত।'

—'তবে আর কী, চ'লে যা।'

—'গ্রামে সবাই মন্দ বলবে না আমাকে ?'

দুলন অতি দুঃখে হাসল। বলল, 'পেটের জন্যে কোনো কাজ করলে, তাতে বুরাই দ্যাখে কে ?'

শনিচরী ওর কথা বুঝল।

গম্ভীর সিং মারা গেল দিন সতেরো বাদে। ওর শ্বাস উঠেছে যখন, তখনই গোমস্তা শনিচরীকে খবর পাঠায়। শনিচরী ব'লে পাঠাল, 'আমি যাবো, লোক নিয়ে যাচ্ছি।'

শনিচরী কালো থানটা প'রে নিল, চ'লে গেল তোহরি। লোককে জিগ্যেস ক'রে রাণ্ডি পট্টির সন্ধান নিতে একটুও লজ্জা হ'লো না ওর। পেটের হিশাব সবচেয়ে বড়ো হিশাব। ডাকতে-ডাকতে ঢুকল ও, 'রুপা, বুধনি, সোমরি, গাঙ্গু! কাঁহা হায় তু সব ? আয়-আয়, রুদালী কাম আছে।'

চেনা-চেনা বেশ্যারা সব একে-একে এলো। ভিড় জ'মে গেল সেখানে। অনেক মানুষ। দিন পাঁচ টাকা বেশ্যা থেকে দিন একসিকের বেশ্যা।

—'হুজুরাইন, আপ ?'

—'বিখনি ম'রে গেছে যে!'—শনিচরী হাসল। তারপর ভিড়ের পেছনে মুখ দেখে বলল, 'বুধুয়ার বউ ? বহু, তুইও আয়; গুলবদন, তুইও চল। গম্ভীর সিং মরছে, কেঁদে টাকা নিয়ে ওদের মুখে নুন ঘ'ষে দে। লজ্জা কী ? যা, উশুল ক'রে নে। চল-চল। সব মাথাপিছু পাঁচ টাকা, সবাই চাল পাবি, কিরিয়াতে কাপড়।'

বেশ্যাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। যুবতী বেশ্যারা বলল, 'আমরা ?'

—'সবাই চল। বুড়ো হ'লে এ-কাজ তো করতে হবে, আমি থাকতে-থাকতে তোদের হাতে-খড়ি ক'রে দিই!'

অসম্ভব মজা পেলো সবাই। শনিচরীকে মোড়া পেতে বসাল গান্জু। রুপা চা কিনে আনল, বিড়ি। কীসের যেন উত্তেজনা। তারপর সবাই চলল নওয়াগড়।

গম্ভীর সিংয়ের ভাতিজা, গোমস্তা, সবাই দেখে তাজ্জব ব'নে গেল। গোমস্তা হিশহিশিয়ে বলল, 'রাণ্ডিটোলি ঝেঁটিয়ে এনেছিস ? প্রায় একশো রাণ্ডি!'

শনিচরী বলল, 'কাঁয় নেহি! মালিক বলেছে, কিসসা-কাহিনী হয় এমন শোর মচাবি। তা দশটা রাণ্ডিতে কি কিসসা-কাহিনী হয়! সরো-সরো, আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও। মালিক এখন আমাদের।'

গম্ভীরের লাশে খা-পচা গন্ধ। ওর পেটফোলা লাশ ঘিরে রুদালী রাণ্ডিরা মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। গোমস্তার চোখ ফেটে দুঃখে জল এলো। কিছুই বাঁচবে না গো! ঐ মাথা-কুটাকুটিটা শনিচরীর খচড়াই। মাথা কুটলে দুশো টাকা! ভাতিজা আর গোমস্তা দাঁড়িয়ে রইল অসহায় দর্শক। মাথা কুটতে-কুটতে, কাঁদতে-কাঁদতে, গুলবদন শুকনো চোখ বিশ্রীভাবে মটকে ভাতিজার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর কান পেতে শনিচরীর কাঁদা শুনে দোহার ধরল।

বরফগোলার খেলা

আখতার মহি-উদ্-দিন

গত পাঁচদিন ধ'রে সারাক্ষণ একটানা তুষার ঝরছে—ঘন তুষার। মাটির ওপর জ'মে উঠছে বরফের স্তূপ, আর শীতের কনকনে ঠাণ্ডা ভাবটা আরো দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। লোকে ঝেঁটিয়ে বাড়ির ছাত থেকে বরফ সরাচ্ছে, আর তাইতে প্রায় সবখানেই গজিয়ে উঠেছে ছোটো-ছোটো শাদা পাহাড়।

খোয়াজা মুসা তাঁর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে মন্থর আলস্যে গড়গড়ায় টান দিচ্ছিলেন, আর ভাবছিলেন নান-রুটি আর ভেড়ার গোস্ত দিয়ে এই মাত্তর যে তোফা দিলপসন্দ খানাটা শেষ হ'য়ে গেলো. এক পেয়ালা কাহ্‌ভা চা পান ক'রে তার স্বাদগন্ধের আমেজটা এক্ষুনি ধুয়ে দেয়াটা উচিত হবে কি না। তাঁর মেহমানরা তখনও এই দারুণ মশলাদার নান-গোস্তের শাবাশ ভুরিভোজটা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে চলেছে।

একজন বললে, 'শুধু এই শানদার গোস্তের জন্যেই শীতকালটাকে আমার এত ভালো লাগে। ঠাণ্ডার দিনে তোফা লাগে মাংসের এই খানাটা।'

'এমনিতেই এই জাতের গোস্ত জোগাড় করা কঠিন—শুধু আলিকাদালের কশাই-দের কাছেই এ-রকম গোস্ত মেলে।' মুখভর্তি নান আর গোস্ত চিবুতে-চিবুতে আরেকজন বললে। জাঁক দেখিয়ে সে আরো জুড়ে দিলে, 'আমি একাই এই গোস্ত পাঁচ-ছ সের খেয়ে ফেলতে পারি, তার পরেও হয়তো আরো চাইবো।'

খোয়াজা মুসার খাশ খিদমদগার রেহমানা এক কোণা থেকে এটা-ওটা জোগাচ্ছিলো। অপেক্ষা করছিলো হুকুমের। বড়ো সরকারের দরাজ দিল আর অতিথিপরায়ণতা দেখে সে দারুণ প'টে গিয়েছে; এ-বাড়িতে গত বিশ সাল ধ'রে চাকরি করার সময় সে অনবরত কেবল এই প্রার্থনাই করেছে যাতে প্রভুর ধনসম্পদ আর মানসম্ভ্রম ক্রমাগত বেড়েই চলে। খোয়াজা মুসা তাকে জিগেশ করলেন, এই উপলক্ষে সব কারিগরদের সে ডেকে পাঠিয়েছে কি না।

'হ্যাঁ, হুজুর, ফজির ছ-টার মধ্যেই সব্বাই এসে যাবে,' রেহমানা নরম স্বরে, বিগলিতভাবে, জানালে।

'আচ্ছা, এই আলবোলার খোলেটা ভরেছিস কী দিয়ে বল তো?' বড়ো সরকার জানতে চাইলেন।

'জি, দুধ দিয়ে, হুজুর।'

যদিও খোয়াজা মুসা বেশ ভালোই জানেন যে খানাপিনার দিনগুলোয় জলের বদলে দুধ দিয়েই গড়গড়ার ডাবাটা ভরা হয়, তবু শুধু অভ্যাগতদের শোনাবার জন্যেই এ-প্রশ্নটা তিনি করলেন। এ-রকম সব উপলক্ষে দিনে তিন-তিনবার পালটানো হয় দুধ। খানা শেষ হ'লে অতিথিরা সব হাতমুখ ধুয়ে মৌজ ক'রে আয়েস ক'রে বসলো। খোয়াজা মুসা জানতে চাইলেন, কী তাদের পছন্দ, এমনি চা, না এক পেয়ালা করে কাহ্‌ভা। অমনি রেহমানা মেহমানদের পছন্দমাফিক পানীয় আনতে ছুটে গেলো।

অতিথিদের একজন জানতে চাইলে: 'ক-জন কারিগর আসবে আজ রাতে?'

'আমি প্রায় জনাবিশেকের জন্য আয়োজন করেছি,' মৃদু হেসে জবাব দিলেন খোয়াজা মুসা।

'বিশজন!'— অতিথিরা তাজ্জব।

'সত্যি, অতজন লোককে শামলানোও বেজায় কঠিন, শুধু আপনার দ্বারাই এ-কাজ সম্ভব। সত্যি, শুধু আপনিই পারেন!'

এই তোয়াজ তারিফ বেশ ভালোই লাগলো খোয়াজা মুসার। 'আমি এই হঠাৎ-নবাবগুলোকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। কী ক'রে একটা মজলিশ বসিয়ে মেহমানদের বিনোদন করতে হয়, সেটা একটা খানদানি আর্ট—এরা তো তার নিছকই নবিশ। নাক টিপলে দুধ গলে, এ-সব লোকের কাছে কী-ই বা আশা করা যায়,' খোয়াজা মুসা কথা বলতে বলতে-হাত নেড়ে বেশ মেজাজি ভঙ্গি করলেন। তাঁর অতিথিরা তাতে সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লে।

'আমার আব্বাজান বরফগোল্লা খেলা এতই পছন্দ করতেন যে তিনি একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটজন খেলোয়াড় ডেকে আনতেন, আর আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থাও করতেন দেদার—পেল্লায় আর জমজমাট।' তাঁর পিতার গুণপনায় খোয়াজা মুসার বেজায় দেমাক। আরো বললেন, 'তবে সে-সব দিন কি আর এখন আছে। ওঁর মতো মানুষ আপনারা আজকের দিনে পাবেন কোথায়, বলুন!'

অতিথিদের একজন গৃহস্বামীর এখনকার আপ্যায়ন-ব্যবস্থারও তারিফ করার চেষ্টা করলে। 'কিন্তু আপনি যা ইলাহি আয়োজন করেছেন, তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী করা যেতো?' ব'লে সে অন্যদের কাছ থেকে সমর্থন পাবার আশায়

চারপাশে তাকালে, আর অন্যরাও তার কথায় সায় দিয়ে বললে, 'এটা মানতেই হয় আপনি যে-রকম ইলাহি আয়োজন করেন, সে-রকম আর কেউই করে না, সে-মুরোদই তাদের নেই। আমরা কি আর জানি না যে সৌজন্য-ভদ্রতার খাতিরে কোনো কার্পণ্যই আপনি করেন না।'

ইতিমধ্যে রেহমানা আর আরো দুই খিদমদগার রুপোর সামোভার ভর্তি চা আর কাহ্‌ভা, আর চিনেমাটির বাসনে চিনি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। বাইরে বরফের ওপর ক্ষীণ একটা রুপোলি আভা, তাছাড়া কোথাও আর-কোনো আলো নেই। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে খোয়াজা মুসা ঠিক করলেন, বরফগোল্লার খেলা শুরু হ'তে এখনও যখন ঢের বাকি, তখন নামাজটা সেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁর অতিথিরা এতে আপত্তির কিছুই দেখলে না। সত্যি-বলতে, এক ঢিলে দুই পাখি শিকার হ'য়ে যাবে, বিবেক খোলশা করার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনাটাও করা হবে, আবার বিস্তর মশলা দেয়া নান-গোস্তকে বেশ আরামে ও শান্তিতে হজম ক'রে ফেলাও যাবে।

খোয়াজা মুসা আর তাঁর মেহমানরা বাকি রাতটা নামাজ প'ড়েই কাটালেন। সকালবেলায় অতিথিরা যখন মারবেল নিয়ে গুলি খেলতে শুরু ক'রে দিলে, তখন তিনি চ'লে গেলেন নিচে, আজ দুপুরে যে-খানাপিনা হবে তারই তদারক করতে। কশাই আর বাবুর্চিকে ডেকে তিনি হরেক রকম হুকুম দিলেন, বিশেষ-বিশেষ খানা পাকাবার জন্যে।

অভ্যাগতরা তাদের গুলি খেলায় একেবারেই ম'জে গিয়েছে। চারপাশের জগৎটাকেই তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। কতবার যে রেহমানা তাদের ছিলিম ভ'রে দিয়েছে আর কতক্ষণ ধ'রে যে তারা গড়গড়া টেনেছে, তার কিছুই তাদের খেয়াল নেই। বৈঠকখানার নরম পুরু গালচে বেশ মোলায়েমভাবে গরম ক'রে রাখছে তাদের হাত-পা, আর কাংরির হালকা আগুন সাহায্য করছে রাতের রোস্ট-মাংসকে হজম ক'রে ফেলতে। দেয়ালের সবুজ-লাল রংগুলো তাদের আরক্তিম গালে কী যে সব অদ্ভুত ছায়াবাজি ফেলেছে, সেদিকে তাদের নজরও ছিলো না, তারা তন্ময় হ'য়ে খেলাতেই শুধু মত্ত, ভালো ক'রে হিশেব রাখছে সব—কে কতটা জিতলো, কাকে কত দিতে হবে। জানলার কাচ কখন জলের ফোঁটায় ভিজে গেলো, তবু তারা খেলেই চললো।

নিচে রসুই ঘরে এক জমকালো ভোজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাবুর্চি আর খানশামারা এদিক-ওদিক ছুটছে রুদ্ধশ্বাসে, ডেকচি-কড়াই হাতা-খুন্তির আওয়াজে

সারাক্ষণ ঝমঝম ক'রে উঠছে জায়গাটা। কারিগরদের কেউ-কেউ খোয়াজা মুসার গা টিপে দিচ্ছে, অন্তরা ধৈর্য ধ'রে ঠায় ব'সে আছে কখন তাদের পালা আসে। তাঁর প্রমোদের জন্ত বরফগোল্লা খেলার ভার দেয়া হয়েছে এই কারিগরদেরই ওপর, এরা সব পশম দিয়ে শাল বানায়। বাইরের এই হাড়কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডায় বরফের ওপর দিয়ে ছোটাই মুশকিল—তার পর তো ডাইনে-বাঁয়ে বরফের গোল্লা পাকিয়ে ছুঁড়তে হবে। সম্ভাবনার কথাটা ভাবতেই তাদের আতঙ্ক হচ্ছিলো। কাংরিগুলোকে গায়ে জড়িয়ে, আল্লাহ্‌র কাছে একমনে দোয়া চাচ্ছিলো তারা, যাতে খোয়াজা মুসা এখনও তাঁর মত পালটে দিনের খেলাটা বাতিল ক'রে দেন।

বুড়ো নবীরা প্রতি পাঁচ মিনিট পর-পর খকখক ক'রে কাশছে আর খাবি খাওয়ার মতো হাঁফাচ্ছে, তার হাঁপানি আছে। সে খুব কাতর মুখ ক'রে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বড়ে সরকারের দিকে তাকাচ্ছিলো যাতে অন্তত তাকে রেহাই দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু খোয়াজা মুসা নানা অছিলায় তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খুব ভালোই জানেন যে এদের একটাকেও যদি ছেড়ে দেয়া যায়, তবে পুরো দলটাই সারাক্ষণ তাঁর পেছন-পেছন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনি গাইতে থাকবে। নবীরাকে অবিশ্যি তার বয়েস আর স্বাস্থ্যের দরুন ছেড়ে দেয়া যেতো, কিন্তু তাহ'লে তো আদপেই খেলার কোনো আয়োজন না-করলেই হ'তো। বুড়ো নবীরার করুণ-কাতর মুখভঙ্গিকে কোনো পাত্তাই দিলেন না তিনি—বরং আরো-সব জরুরি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। সেদিনকার মতো খেলা মুলতুবি রাখবার জন্তে সব মজুরদের কাছ থেকে একযোগে একটা দরখাস্ত আসতে পারে আন্দাজ ক'রে তিনি শেষটায় তাঁর বৈঠকখানা ছেড়ে অন্দরমহলেই চ'লে গেলেন। যাবার আগে অবিশ্যি খাশ বাবুর্চিকে ডেকে আরো-সব হরেক রকম হুকুম ও উপদেশ দিতে ভুললেন না। মেহমানরা তখনও খেলাতেই মত্ত, তাদের তিনি ডেকে পাঠালেন, জিগেশ করলেন এবার দুপুরের খানা-পিনার জন্তে তারা খেলাটা বন্ধ করবে কি না।

অতিথিদের দুজন একসঙ্গেই ব'লে উঠল, 'জি, হাঁ, খেলা বন্ধ করাই উচিত এখন।' খোয়াজা মুসা তাঁর খাশ খিদমদগারকে ইশারা করলেন আর তক্ষুনি উঠোনের দিককার জানলাগুলো খুলে দেয়া হ'লো। অতিথিরা তাদের গায়ে গরম কম্বল জড়িয়ে নিয়ে কাংরিগুলোকে আরো কাছ ঘেঁষে রাখলেন। জানলাগুলো খুলেছিলো মস্ত-এক চওড়া উঠোনের দিকে তাকিয়ে, চারপাশে মস্ত সব দেয়াল। সেখানে বরফ জ'মে-জ'মে প্রায় একটা পাহাড়ের মতো হ'য়ে উঠেছে। খেলা যদি শুরু করতেই হয়, সে ভবে এক্ষুনি—অতিথিদের আর তর সইছিলো না। পুরু-পুরু

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসতে-না-বসতেই খানশামারা হাত ধোবার জন্যে গরম জল নিয়ে এলো। আর তারা গরম জলে হাত ধুতে-না-ধুতেই বিশজন কারিগর ছুটে বেরিয়ে এলো উঠোনে, বরফের ওপর; আগে থেকেই একটা দাগ কেটে দুটো দল-কে ভাগ ক'রে দেয়া হয়েছে, ঐ দাগের দু-পাশে তারা যে যার জায়গায় দাঁড়ালো। বুড়ো নবীরা তেমনি খকখক ক'রে কাশছে, আর চারপাশে দলা-দলা থুতু ফেলছে।

রেহমানা মেহমানদের কাছে ভাতের থালা রাখতেই খেলা শুরু হ'য়ে গেলো। দু-দলই পরস্পরকে তাগ করে বড়ো-বড়ো বরফের গোল্লা পাকিয়ে ছুঁড়ছে। একটা দল দাগটা পেরিয়ে এসে বিপক্ষকে তাড়া ক'রে যেতেই অতিথিরা সোল্লাসে চীৎকার তারিফ আর তাড়া লাগিয়ে দিলে। সবচেয়ে মজার রকম-শকম হ'লো বুড়ো নবীরার। দাগটা পেরিয়ে যাবার জন্যে ছুটতেই ঢিলে পাগড়িটা তার গোল মসৃণ-কামানো মাথাটায় লাফিয়ে-লাফিয়ে নাচতে শুরু ক'রে দিলে, আর তাইতে তাকে দেখাতে লাগলো কোনো মেলার কোনো সঙের মতো। তার নাকের ডগা ঠাণ্ডায় জ'মে লাল, আর যখনই দাগের ওপাশে বিপক্ষের লোকেরা তাকে তাড়া ক'রে আসে, সে শুধু চিৎপাত শুয়ে পড়ে বরফের ওপর, নড়নচড়ন কিচ্ছু নেই, আর তারা তাকে ডিঙিয়েই চ'লে যায় ধুলোর ঝড়ের মতো। এই দেখে খোয়াজা সাহেব আর তাঁর মেহমানরা হো-হো হেসেই কুটিপাটি। তুষার কিন্তু ঝ'রেই চলেছে, সারাক্ষণ, একটানা, একবারও না-থেমে। দেখে মনে হচ্ছে খোদাতালা স্বয়ং বুঝি খোয়াজা সাহেবের আমোদে ভাগ নিচ্ছেন আর অন্তহীন বরফ পাঠিয়ে যাচ্ছেন।

শেষটা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেলো যেন। উঠোনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে দেখা গেলো ঢিলেমির লক্ষণ। তাদের জামাকাপড় সব ভিজে একশা, ঠাণ্ডায় তারা হি-হি ক'রে কাঁপছে। খোয়াজা সাহেব এই দেখে হুকুম দিলেন ডেকচিভরা গুশ্‌তাবা আনতে। উঠোনের ঠিক মাঝখানে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিয়ে সহাস্যে তিনি মজা দেখতে লাগলেন। কারিগররা সবাই মাংসের চাকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আরেক টুকরো মাংস ছুঁড়লেন তিনি, আরো-এক টুকরো, আর অমনি খেলায় আবার আগের উৎসাহ আর ছন্দ ফিরে এলো। কারিগররা একে-অন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে। সপারিষদ খোয়াজা সাহেব হাততালি দিয়ে-দিয়ে হেসে চেঁচিয়ে শাবাশ জানালেন, বাহবা দিলেন।

খানাপিনা শেষ হ'তেই খেলা থামাবার হুকুম দেয়া হ'লো। কারিগরদের সবাই-কে বলা হ'লো মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে তাদের খানা খেতে। বুড়ো নবীরা কিন্তু পেছনেই থেকে গেলো। সে মিনতির ভঙ্গিতে করুণ মুখ ক'রে বড়ো সরকারের

দিকে তাকিয়ে আছে, অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছে এতক্ষণ হিমজমাট বরফের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করার পর ছুটির হুকুম। খোয়াজা মুসা তখন সবে তাঁর হাসির দমকটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন। বললেন, 'ভেতরে আয়, তারপর খেয়ে-দেয়ে বাড়ি চ'লে যা।' নবীরা তার প্রভুর দরাজ দিলকে শুক্রিয়া জানিয়ে খুব মোলায়েম ভদ্রভাবে আমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করলে। খোয়াজা মুসা ভেবেই পেলেন না এই এতলোক থাকতে এই নবীরা বুড়বাকের এত সাহস কী ক'রে হয় যে এমন-কী তাঁর মুখের ওপরই তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে। সে কি ইচ্ছে ক'রেই, বদমায়েশি ক'রেই, বেয়াদপি করছে, না কি মাটির তলার ঘরটায় অন্যসব কারিগর-দের সঙ্গে তার মেশবার ইচ্ছে নেই?

'এখানে তুই খাবি না কেন, পাজি,' চোটপাট ক'রে জিগেশ করলেন খোয়াজা মুসা।

'জি, ঠাণ্ডায় আমি হি-হি ক'রে কাঁপছি, হুজুর। আমি বরং বাড়ি গিয়ে একটু জিরিয়ে নি,' নবীরা তো-তো ক'রে বললে।

খোয়াজা মুসার মনে হ'লো তার আচরণ বেজায় বেপরোয়া। 'ভেতরে যা, কুত্তা,' তিনি ফশ ক'রে জ'লে উঠলেন, 'বড্ড বাড় বেড়েছে তোর, কুত্তির বাচ্চা, না?'

নবীরা প্রায় আঁৎকে-ওঠা ইঁদুরের মতো ভেতরে গিয়ে খেতে ব'সে গেলো। মাটির তলার সেই স্যাঁৎসেঁতে ঘরে কার যেন চোখে পড়লো তার রাঙা-হ'য়ে-ওঠা শুকনো মুখটা, বললে, 'তোমার তো দেখছি জ্বর এসেছে, নানা।'

সে যখন বাড়ি ফিরলো, তখন সত্যি তার তেড়েফুঁড়েই জ্বর এসেছে। চোখ দুটো কোটরে ব'সে গেছে, ঠোঁট শুকনো, বিবর্ণ। ক্রমেই কথা বলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে সে। তার স্ত্রী প্রাণপণে চেষ্টা করলে কোনো রকমে তাকে সারিয়ে তোলবার, কিন্তু কোনো দাওয়াইতেই কোনো কাজ হ'লো না। এমনকী ঝাড়ফুঁক তাগাতাবিজেও কোনো ফায়দা না। ক-দিন পরেই তার শেষ এলো।

খোয়াজা মুসা যখন নবীরার ইন্তেকালের কথা শুনলেন, তিনি খুব মুষড়ে পড়লেন। বুড়বাকটার দোষ যা-ই থাক, সে ছিলো সত্যিকার শিল্পী, কারিগরদের মধ্যে সকলের সেরা। মৃত্যুটা বড়ো আকস্মিক হ'লো, বিলকুল অপ্রত্যাশিত।

যখন তিনি নবীরার আত্মীয়স্বজনদের কাছে দুঃখ জানাতে তাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন, যারাই সেখানে ছিলো, সকলেই খোয়াজা মুসার দীনতা আর গরিবগুরবোদের জন্যে এমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখে প্রশংসা ক'রে আর শেষ করতে পারে না।

'বাদশা স্বয়ং এসেছেন গুলামকে-গুলাম বান্দাকে বান্দার-ইন্তেকালে,' বাড়ির একজন মন্তব্য করলে।

অন্তরা আরো-একধাপ এগিয়ে গেলো। 'তাঁর দীনতার যোগ্য ইনামই তিনি পেয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর ওপর সদয়। এই তো, এই সেদিনও তিনি বরফগোল্লা খেলবার একটা আয়োজন করেছিলেন, সেখানে বিশ-বিশজন কাজের লোককে তোফা খাইয়ে-দাইয়ে বখশিশ দিয়েছিলেন।'

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অলৌকিক

কর্তার সিং দুগ্‌গাল

…'আর তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার পর গুরু নানক পৌঁছলেন হাসান আব্দালের জঙ্গলে। ভয়ংকর গরম তখন। মনে হচ্ছিল, সূর্যের প্রখর তেজে যেন কাকগুলোরও চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। চারদিক শুনশান। দিগন্ত জোড়া ধু-ধু বালি। পাথরের চাঁই, ঝলশে-যাওয়া ঝোপঝাড়, শুকিয়ে-যাওয়া গাছপালা—কেবল এইই যা দেখা যাচ্ছিল। একটা মানুষও চোখে পড়ছিল না।'

'তারপর কী হ'লো মা?' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলেন গুরু নানক, নির্ভাবনায় হেঁটে চললেন তিনি। হঠাৎ মর্দানার বড়ো জল তেষ্টা পেল। কিন্তু কোথায় জল? গুরু নানক মর্দানাকে অপেক্ষা করতে বললেন। পরের গাঁয়ে পৌঁছলেই যত-প্রাণ-চায় মর্দানা জল খেতে পারবে।

'কিন্তু মর্দানার আর তর সইছিল না। গুরু নানক খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। জঙ্গলে বহু দূর পর্যন্ত জল পাওয়া যাবে না। কিন্তু মর্দানা একবার বেঁকে বসলে, আর সবাইকে তার ঝক্কি পোয়াতে হ'তো। গুরু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ভ্যাখো মর্দানা, এখানে কোথাও জল নেই। একটু অপেক্ষা করো। এটাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব'লে মেনে নাও।"

'তবু মর্দানা একচুলও নড়তে রাজি হ'লো না। সোজাসুজি সেইখানেই সে গেড়ে ব'সে গেল। এওবার আর কোনো উপায় ছিল না। গুরু মুশকিলে পড়লেন। মর্দানার রকমসকম গোঁয়ার্তুমি দেখে তাঁর হাসি পেল, সেই সঙ্গে বিরক্তিও। মর্দানার এই একগুঁয়েমি দেখে গুরু ধ্যানে বসলেন। যখন চোখ খুললেন, দেখলেন মর্দানা জল বিনা-মাছের মতো নিদারুণ কষ্টে ছটফট করছে। সদগুরু এক কোমল হাসি হেসে বললেন, "ভাই মর্দানা, এখানে এক টিলার চুড়োয় বালি কান্দাহারি নামে এক দরবেশ কুটির বেঁধে থাকেন। তাঁর কাছে গেলে তুমি জল পাবে। ওখানে একটা কুয়োয় কানায়-কানায় ভর্তি জল আছে। এ-জঙ্গলে একমাত্র ঐখানেই তুমি জল পেতে পারো।" '

'তারপর কী হ'লো, বলো।' মর্দানা জল পেল কিনা জানবার জন্তে আমার তর সইছিল না।

মর্দানার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল। টিলাটার দিকে সে দৌড়ে গেল। একে তেষ্টায় কাতর তায় মাথার ওপর সূর্য—ঐভাবেই তাকে টিলা বেয়ে উঠতে হ'লো। সে হাঁফাতে লাগলো। ঘেমে নেয়ে গেল। কিন্তু শেষতক কঠিন কাজটায় সফল হ'লো।

বালি কান্দাহারিকে সালাম জানিয়ে সে খাবার জল চাইলে। কুয়োর দিকে এগুচ্ছে, এমন সময় বালি কান্দাহারির মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন খেলে গেল। মর্দানাকে তিনি জিগেশ করলেন, 'কোত্থেকে আসছিস তুই?'

মর্দানা উত্তর দিলে, 'আমি পীর নানকের অনুচর। আমার বড়ো তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু নিচে একদম জল নেই।' নানকের নামটা কানে যেতেই বালি কান্দাহারি তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মর্দানাকে তাঁর কুটির থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মর্দানার এক গণ্ডূষ জলও জুটল না। সে নেমে এসে গুরু নানকের কাছে নালিশ জানালে, গুরু কেবল হাসলেন। মর্দানাকে তিনি ফের বালি কান্দাহারির কাছে ফিরে গিয়ে নম্র-নত ভাবে জল চাইবার পরামর্শ দিলেন। তাকে বলা হ'লো এবারে সে যেন দরবেশ নানকের অনুচর ব'লে নিজের পরিচয় দেয়। তৃষ্ণার্ত মর্দানার জল জোগাড় করার অন্ত কোনো পথ ছিল না। তাই রাগে-দুঃখে নিজের মনে বিড়বিড় করতে-করতে সে ফের টিলাটা বেয়ে উঠলো। কিন্তু বালি কান্দাহারি তাকে আবার হাঁকিয়ে দিলেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, একটা কাফেরের চেলাকে তিনি একটি ফোঁটাও জল দেবেন না। মর্দানা যখন ফিরে এলো তখন তার ভয়ংকর অবস্থা। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে গেছে, সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। মনে হচ্ছিল মর্দানার যেন হয়ে আসছে।

গুরু নানক সব শুনলেন। বললেন, 'যাও, চীৎকার ক'রে বলো "জয় নিরঙ্কার" আর তাঁর কাছে ফের দৌড়ে যাও।' মর্দানা তাঁকে অমান্য করতে পারলে না। সে আবার রওনা দিলে, যদিও তার মনে হচ্ছিল, পথেই হয়তো প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এই তিনের দফায় চুড়োয় পৌঁছেই বালি কান্দাহারির পায়ের ওপর সে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু তাও ক্রুদ্ধ বালি কান্দাহারির মন গললো না। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'ঐ নানকটা নিজেকে পীর ব'লে জাহির করে অথচ নিজের চেলাদের জন্তে সামান্ত খাবার জলেরও জোগাড় ক'রে উঠতে পারে না।'

মর্দানা ফের নেমে আসে, একেবারে গুরু নানকের পায়ে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে।

মর্দানার পিঠে গুরু হাত বুলিয়ে দেন। তাকে সাহস জোগান তিনি, প্রবোধ দেন। মর্দানা চোখ মেলে চায়। গুরু তাকে তার সামনের একটা পাথর তুলতে বলেন। মর্দানা পাথরটা তোলে আর ঠিক তার তলা থেকে জলের ফোয়ারা বেরিয়ে আসে—এক প্রবল প্রবাহ। এক লহমায় চারদিক জলে জলাকার।

আর তখন হয়েছে কী, ঠিক সেই সময়, বালি কান্দাহারির জলের দরকার পড়েছে। তিনি চোখ ছানাবড়া ক'রে দ্যাখেন যে তাঁর কুয়ো শুকিয়ে গেছে। আর অবাক কাণ্ড, টিলার পায়ের কাছে ভরা জোয়ারে জল বইছে, মরুভূমির বালি ফুঁড়ে একটা নদী দেখা দিয়েছে। প্রচণ্ড খেপে উঠে, বালি পাথরের এক বিশাল চাঙড় টিলার নিচে ছুঁড়ে দেন। বিশাল পাথরটাকে তাদের দিকে গড়িয়ে আসতে দেখে মর্দানা চেঁচিয়ে ওঠে। শান্ত সমাহিত স্বরে মর্দানাকে গুরু 'জয় নিরঙ্কার' ব'লে ধ্বনি দিতে আদেশ দেন, আর পাথরটা যখন তাঁদের খুব কাছে এসে পড়েছে, এক হাত বাড়িয়ে তিনি সেটা থামিয়ে দেন। গুরু নানকের হাতের ছাপ-সহ সেই পাথরটা হাসান আব্দালের জঙ্গলে আজও আছে। জায়গাটার নাম 'পাঞ্জা সাহেব'।

...

ধর্মকাহিনীটা শুনতে আমার বেশ লাগছিল, কিন্তু হাত দিয়ে পাথর থামানোর ঐ অংশটা মেজাজ বিগড়ে দিলে। এটা কী ক'রে হ'তে পারে? আর নানকের হাতের ছাপ-মারা পাথর—এ-সব কী উদ্ভট ব্যাপার? আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি মায়ের সঙ্গে তর্ক করি। ঐ ছাপটা হয়তো পরে মেরে দেওয়া হয়েছে। পাথরের তলা থেকে জল বেরিয়ে আসার অংশটা আমি মেনে নিতে রাজি ছিলাম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে জলের গোপন উৎসমুখ আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারিনি যে কোনো মানুষ টিলা থেকে গড়িয়ে-পড়া একটা পাথরকে থমকে থামিয়ে দিতে পারে। মা চুপ ক'রে যায় কেননা আমার মুখের ভঙ্গিতে আমার মনের ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। ব্যঙ্গের এক হালকা হাসি আমার ঠোঁটের চারপাশে সারাক্ষণ ঘিরে থাকত।

এই ধর্মকাহিনীটি আমি গুরদোয়ারেও শুনেছি। কিন্তু পাথর থামানোর ঐ বৃত্তান্তটি এলেই আমি অবিশ্বাসভরে মাথা ঝাঁকিয়েছি।

কিছুদিন পরে শুনি, পাঞ্জা সাহেবে একটা 'শাকা' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সে যুগে এ-রকম অনেক 'শাকা' হ'তো। 'শাকা' মানে বাড়িতে সেদিন রান্নাবান্না হবে

না। আর রাত্তিরে শুতে হবে মেঝেতে। তবে 'শাকা' বলতে যে ঠিক কী বোঝায় আমি তখন তা জানতাম না।

পাঞ্জা সাহেব থেকে আমাদের গাঁ খুব বেশি দূরে ছিল না। এই শাকার খবরটা পৌঁছুলে মা পাঞ্জা সাহেবের দিকে রওনা দেয়। আমার ছোটো বোন আর আমি মায়ের সঙ্গে যাই। সারাটা পথ মা কাঁদছিল। এই 'শাকা' ব্যাপারটা যে কী আমি সারাক্ষণ তাই ভাবতে থাকি।

পাঞ্জা সাহেবে পৌঁছুলে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি।

কিছুদূরে একটা শহরে, নিরস্ত্র কিছু ভারতীয়র ওপর গুলি চালিয়ে ব্রিটিশ তাদের অনেককে খতম ক'রে ফেলেছে। মৃতদের মধ্যে জোয়ান-বুড়ো সবাই আছে। যারা বেঁচে আছে তাদের অন্য-একটা শহরের জেলে চালান করা হচ্ছে। হুকুম জারি করা হয়েছে, কয়েদিরা যদিও সব মরো-মরো তবুও যে-সব ট্রেনে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলো যেন কোথাও না-থামে। খবরটা পাঞ্জা সাহেবে পৌঁছুতেই লোকেরা খেপে ওঠে। গুরু নানক তাঁর শিষ্য মর্দানার তেষ্টা এই পাঞ্জা সাহেবেই মিটিয়েছিলেন। আর খিদে-তেষ্টায় কাতর কয়েদিতে ভরতি একটা ট্রেন কিনা সেই পথ দিয়েই যেতে চলেছে। ঠিক করা হয়, ট্রেনটাকে থামানো হবে। স্টেশান মাস্টারের কাছে আবেদন করা হয়। টেলিফোন কাজে লাগানো হয়, টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। কিন্তু ব্রিটিশ স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেয় যে ট্রেন মোটেই থামানো চলবে না। কিন্তু সবচেয়ে যা অসহ্য ছিল সেটা হ'লো মুক্তির জন্য তৃষিত সেই সব তৃষ্ণার্ত ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের জন্য ট্রেনে জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পাঞ্জা সাহেবের লোকজন ট্রেনটাকে সেখানে থামাতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে। চাপাটি, ডাল, পুরি আর পায়েস স্টেশনে ডাঁই ক'রে জমা করে স্থানীয় লোকেরা।

কিন্তু ট্রেনটা তো এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্টেশন পার হ'য়ে চ'লে যাবে। কী ক'রে থামানো যায় ট্রেনটাকে ?

মায়ের বন্ধুরা বলতে থাকে তারপরে কী হ'লো। 'তারা তখন ট্রেনের ট্র্যাকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। আমার সবাই ছিলাম, আমাদের মরদরা আর তাদের যত সঙ্গীসাথী। তারপর আমরা মেয়েরা যোগ দিলাম। বাচ্চারাও যোগ দিলে। ট্রেনটা এলো, চিলের মতো তীক্ষ্ণ শিষ দিতে-দিতে। অনেক আগেই তার গতি ক'মে এসেছিল। তবু, গতি কমার মুখেও ট্রেন অনেকখানি এগিয়ে যায়। এক পলকে ট্রেনের চাকা তাদের বুকের ওপর চ'লে এলো, তারপর তাদের সঙ্গীসাথীদের বুকের ওপর···আমরা যখন চোখ খুললাম, দেখি ধোঁয়ামুখো দানবটা আমাদের

মাথায় ঢুঁ মারছে। আমাদের পাশে শুয়ে-থাকা অন্ত-সব মেয়েরা "জয় নিরঙ্কার" ব'লে ধ্বনি দিয়ে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে শুয়ে-থাকা লোকগুলোকে একে-একে দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে দিয়ে ট্রেনটা পেছোতে লাগলো।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি একটা রক্তের নদী খালের ওপরে যে-কংক্রীটের সেতুটা আছে সেদিক পানে চ'লে যাচ্ছে···'

আমি বিহ্বলের মতো সেখানে ব'সে রইলাম। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না। প্রচণ্ড বিস্ময় আমার জিভ নাড়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। সেদিন এককোঁটা জলও আমি গলা দিয়ে নামাতে পারিনি।

সন্ধেবেলায় আমরা যখন ফিরছিলাম, মা আমার ছোটো বোনটিকে গল্পটা বলছিল। গুরু নানক মর্দানার সঙ্গে কীভাবে এই পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। মর্দানার কীভাবে জল তেষ্টা পেয়েছিল। বালি কান্দাহারি যে মর্দানাকে এক কোঁটা জল না-দিয়ে তিন-তিন বার ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গুরু কখন মর্দানাকে পাথর তুলতে বলেন। কীরকমভাবে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো অঝোর জল বেরিয়ে আসে। কী ধরনের টান কুয়ো থেকে সব জল নিচে নামিয়ে আনে। তারপরে কীরকমভাবে বালি কান্দাহারি খেপে গিয়ে পাথরের এক বিশাল চাঙড় গড়িয়ে দেয়। মর্দানা কীভাবে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে। কিন্তু গুরু নানক "জয় নিরঙ্কার" ব'লে ধ্বনি দেন আর এক হাত দিয়ে পাথরটাকে থামিয়ে দেন।

আমার বোন বাধা দেয়। 'কিন্তু একটা মানুষ এক হাত দিয়ে একটা পাথর কী ক'রে থামিয়ে দিতে পারে?'

'কেন পারে না?' মাঝখানে আমি ব'লে উঠি। 'ঝড়ের বেগে ছুটে-আসা একটা ট্রেনকে যদি থামানো যায় তাহ'লে একটা পাথরকে নয় কেন?'

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। যারা কোনো কিছু পরোয়া না-ক'রে তাদের জীবন দিয়েছে, যে-সব বীরেরা খিদে-তেষ্টায় কাতর স্বদেশবাসীদের রুটি জল জুগিয়েছে, ঐ চোখের জল ছিল তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ।

অনুবাদ : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবিতরা

আনন্দ যাদব

আজ শনিবার। হাতের কাজ করতে-করতে সবারই একটু ফুর্তির ভাব। পাভাতে-সাহেব, ধর্মাধিকারি, গ্রেট গাভাণ্ডি, ক্যাশিয়ার ডাটে—সবাই আজ ভালো মেজাজে। পিয়নেরাও—মারুতি সিন্ধে, ববন ঘুগারে আর পনবল—প্রত্যেকেই আজ একটু অতিরিক্ত গ্যাঁজাচ্ছে। যাদবসাহেব আজ আসেননি, সুতরাং এদের উপর চাপটাও একটু কম। ব্যাঙ্ক আজ কেবল সকালে খোলা। বারোটা তিরিশে কাওয়াড়ি বন্ধ···সোমবার পর্যন্ত নিশ্চিন্দি। আর মাসেরও প্রথম হপ্তা। হয়তো বিকেলে সিনেমা। হয়তো কোনো কাফেতে বিশেষ একটু-কিছু···ছোট্ট-ছোট্ট ভাবনা এ-সব—মাথার মধ্যে শুধু বুড়বুড়ি কাটছে।

ঠিক সাড়ে-এগারোটায় পাভাতে সাহেবের ফোন বাজলো। যাদবসাহেবের চাকরদের একজন: 'যাদবসাহেবের মা মারা গেছেন। পনবলকে সোজা পাঠিয়ে দিন। ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আগে অন্য পিয়নদের আসার দরকার নেই। সাহেব বলছেন অন্য ব্রাঞ্চগুলোয় ফোন করতে আর যদি সম্ভব হয় সবাইকে খবরটা দেয়ার জন্যে ববন ঘুগারেকে সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে।'

সব ভেস্তে গেলো। পাভাতে সাহেব সবাইকে তখুনি খবরটা দিলেন আর সবাই মুখ হাঁড়ি ক'রে ব'সে রইলো যেন তাদের হিশেব মিলছে না। পনবল খচেছে। বিশেষ-কিছু বলতে পারেনি ঠিকই। বসের ব্যক্তিগত কাজ! তা না-হ'লে সে এতক্ষণে পাভাতেসাহেবের পায়ে ঘ্যানঘ্যান করতো: 'ববন বা মারুতিকে পাঠাতে পারেন না, সার?' সিন্ধে শুধু অল্পের উপর দিয়েই রেহাই পেয়েছে, কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'লে বাড়িতে তো যেতে হবেই। মনে-মনে যথেষ্ট বললেও খুলে কেউই কিছু বলতে পারছে না। তাহ'লেও গাভাণ্ডি আর ধর্মাধিকারি দুজনে দুজনের কাছে বিড়বিড় করছে।

গোটা শনিবারের বিকেলটা মাটি। ববন তার সাইকেল নিয়ে বেরুলো চার-দিকে খবর দিতে।

···'ফিরতে সেই একটা হবে। পাভাতেসাহেব তো এর-মধ্যেই সবজায়গায়

ফোন করেছেন। একঘণ্টায় ক-জায়গায়ই বা যেতে পারবো? যা পারি ক'রে সাড়ে-বারোটার মধ্যে আমি ফিরছিই।'

'তাতেই বা কী? বাড়ি যে ফেরা আর হবে না। খেতে বাড়ি গেলে অন্তত দেড়টা বাজবে। ততক্ষণে আদ্ধেক কাবার। খবরটা দিয়ে সোজা বসের বাড়িতে যেতে হবে। খোদায় মালুম বাড়িতে ফিরতে পারবো কটায়। কীচান হ'য়ে গেলো। নাঃ, যাওয়ার পথে নানা দত্তেকারের কাফেতে একটু "মিসাল" মেরে দেবো। পেটে একটু ভালো-মন্দ পড়লে তবু থোড়া জুত পাব। টাকা খানেক নিশ্চয়ই আছে পকেটে। দু-তিন স্লাইসও হ'য়ে যেতে পারে। দুটো-তিনটের আগে বাড়ি পৌঁছুবো না। ওঃ শালা! যাদবসাহেবের মা-কে তো আবার মালা ঠেকাতে হবে একখান। বারো আনা অন্তত···এক টাকার বেশির ভাগটাই গয়া। দেখতে ভালো হওয়া চাই, নইলে তো যাদবসাহেব দাঁত কিড়িমিড়ি করবে। সারা জীবন ধ'রে ক্ষার থাকবে। বেটা কনফিডেন্সিয়ালটা খারাপ ক'রে দেবে। দত্তেকারে যাওয়ার আগেই মালাটা কিনে নেওয়া ভালো।'

'ওয়েটার!'

'বলুন, সাব, কী দেবো?'

'একটা স্পেশাল "মিসাল", আর দুটো স্লাইস। একটু এক্সট্রা তরকারিও দিয়ো তো, বুঝলে!'

'ঝাল-মশলার জবাব নেই। ভালো কিছু সাঁটো। একটু মিসাল আর রুটি মানে প্রায় দুপুরেরই খাওয়া। তখন একটা কেন দুটো শ্মশানযাত্রাও করতে পারি।'

তাও যাদবসাহেবের বাড়িতে পৌঁছুতে সেই দেড়টা। সামনের দিকটা নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই। দড়ি-দড়ার টুকরো, জোয়ার এবং খড়, শব ধোবার গরম জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। দাঁড়িয়ে চোখ বোলালো চারদিকে, লাশগুলোকে গরমজলে ধোয়ায় কী চমৎকার! মারা গেলে একটু গরম হ'তে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই। অসুখ হ'য়ে ছিলো···হয়তো বহুদিন চান হয়নি···পরিষ্কার জলটা বেশ ভালোই লাগবে··· দূর হ গাধা। মড়ার কী আসে যায়। যাদবসাহেবের যাতে একটু ভালো লাগে। তাই না? তেনার মনটা শান্তিতে থাকলে তেনার বুড়ো মনটাই শান্তিতে থাকে। তাই? যাকৃগে, ও-সব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবো না।

সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিলো। রাস্তায় লাল ফুলের পাপড়ি প'ড়ে আছে। সেই দেখে-দেখে সে প্যাডল ক'রে চললো। ভেবেছিলো রাস্তায়ই হয়তো শববাহক-

দের ধ'রে ফেলবে কিন্তু শেষ অব্দি শ্মশানে পৌঁছে গেলো। লোকে ইতিমধ্যেই চিতার জন্যে ঘুঁটে জোগাড় করছে।

প্রায় ষাট-সত্তর জন লোক রয়েছে। কিছু যাদের ববন খবর দিয়েছে আর সে খবর দেয়নি এমনও বহু। ববন অবাক হ'লো। যাদবসাহেবের সঙ্গে তো বহু লোকের জানচিন। ব্যাঙ্কের সূত্রে অবশ্যই, কিন্তু অন্য লাইনেরও বহু। সবাই যাদবসাহেবের জন্যেই এসেছে। খুব ভালোবাসে তাঁকে নির্ঘাৎ। যখনই চেয়েছে তাঁর কাছ থেকে লোন পেয়েছে, ক্যাশ-ক্রেডিট, নানা সুযোগ-সুবিধে। আসল কথা হ'লো যাদবসাহেবের হাতে ক্ষমতা আছে। কিছু লোক সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছে, মুষড়ে আছে। যাদবসাহেবের মাকে কেউ চক্ষে দ্যাখেনি ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেই এত দুঃখীভাবে আছেন সেটা দেখেই সত্যি খারাপ লাগছে।

অনেক লোকেই মৃতদেহে মালা দিলে, এক চোখ যাদবসাহেবের উপর রেখে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে লোকগুলো ভাবছে দেয়ার সময় নাম জানান দেয়া হ'লে আরো ভালো হ'তো। তারা একটু অপ্রস্তুত চেহারা ক'রে মালা দিলে, গুটি কয় সান্ত্বনাবাক্যও আউড়ে এলো।

যাদবসাহেবের দুই ভাই একধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। তাদের দিকে কেউ খুব-একটা মনোযোগ দিলে না। যারা শ্মশানে এসেছে তারা কেউই প্রায় এদের ভালো ক'রে চেনে না। যদি চিনতো তাহ'লে অবশ্যই অনেকেই গিয়ে তাদেরও সান্ত্বনা দিতো।

বেশ কয়েকটা বক্তৃতা হ'লো। যখন প্রথমটা শেষ হ'লো কেউ-একজন নিশ্চয়ই খেয়াল করেনি কোথায় এসেছে তাই বেমক্কা হাততালি দিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু তারপর নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলো, কেননা পরেরবার সে বেমালুম চেপে গেলো। বেশির ভাগ বক্তৃতাতেই প্রকাশ পেলো যে যাদবসাহেব একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী ম্যানেজার, অসম্ভব খাটিয়ে, দারুণ ভদ্র অথচ দৃঢ়চেতা। তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত ভালো এবং অধীনস্থ লোকজনের প্রতি তিনি কেমন দয়ালু। শেষের দিকে গোটা দুই ক'রে বাক্য অবশ্যই থাকছিলো এই প্রতিভাবান ব্যক্তিটির মায়ের অকালমৃত্যু এবং তার ফলে যে-বিরাট জোরটা তিনি হারালেন সেই সম্পর্কে।

পনবল মড়ার চালির পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মালাগুলো তুলে একপাশে সাজিয়ে রাখছিলো। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার পুরোহিত যখন রিটায়ার করছিলো সেই ফাংশানেও সে ঠিক এইভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো—ঠিক

এইভাবে মালাগুলো সাজিয়ে রাখছিলো। যখন দুগারে তাকে একটা সবজান্তা দৃষ্টি দিলে। পুরোহিত যখন রিটায়ার করে বোকা বেজন্মাটা তখন বেজায় তেল মারছিলো কিন্তু কিস্সু লাভ হয়নি। এখন যাদবসাহেবকে চুষ মারছে। 'তোকে কি ম্যানেজার বানিয়ে দেবে ভাবছিস নাকি ছোঁড়া? কেন সবসময়ে হামাগুড়ি দিস্, তেল মারিস? যাদবসাহেব দিদিকে একটা "সীরিয়স" গোছের তার পাঠিয়েছিলেন। তিনি সোজা শ্মশানে এসে গেছেন। 'মা' ব'লে চীৎকার ক'রে তিনি ভীষণ জোরে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

অমনি যাদবসাহেবের সমস্ত ছোটো-ছোটো ভাইবোনেরা যারা এখনও কলেজে পড়ছে 'আক্কা! আক্কা!' ব'লে কাঁদতে শুরু করলো। মালার আর বক্তৃতার গুরু-গম্ভীর আবহাওয়াটি গেলো। বড়োবোন চালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যাদবসাহেব এইবার বাড়ির লোকেদের শোকে অভিভূত হ'য়ে হাঁ ক'রে কাঁদতে থাকলেন। তিনি যখন কেঁদে বললেন, 'মা, আমায় ছেড়ে গেলো কেন?' লোকে খুবই আশ্চর্য হ'লো।

'মা।'

'মা।'

মার নানা স্মৃতি বড়ো বোনের মনে ভিড় ক'রে এলো। আর সেই সব পুরোনো কথা শোকের দমকে-দমকে বেরিয়ে আসতে থাকলো আর তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন—একটার পর একটা পুরোনো ঘটনা—তিনি তাতে ডুবে গেলেন।

মার চেহারাটা তাঁর চোখে ভাসে আর একটার পর একটা পুরোনো কথা মনে আসে। পুরোনো কথা ভেবে কাঁদেন।

মা তাকেই বিশেষ একটু স্নেহ করতেন। যেই এখন মনে পড়লো, সেভাবে ভালোবাসার আর কেউই রইলো না—চোখের জল আর বাঁধ মানে না। যারাই ওকে দেখছে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে যাচ্ছে। পনবল একটিও কথা না-ব'লে প্রহরীর মতো অচঞ্চলভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে। যাদবসাহেব বোনের পিঠে হাত রাখলেন।

'উঠে পড়ো এবার।'

'কেন। আর তো বা-ড়ি রইলো না।'

'কে বলেছে নেই। আমি তো আছি। দুঃখ কোরো না। এদিকে এসো। উঠে পড়ো। শুয়ে থেকো না। লোকে কী বলবে?' বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

নাপিত পাশের শ্মশানযাত্রীদের কাজ সম্পন্ন ক'রে ব্যস্তভাবে এসে হাজির হ'লো।

পনবল বললে, 'সাহেব, জামা ছাড়ুন।'

যাদবসাহেব কেবল তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কোনো-এক বয়স্ক ব্যক্তি তাঁকে সামনের দিকে ঠেলা দিলেন, 'মার জন্যে চুল ফেলতে হবে। জামা খুলে নাপিতের সামনে বোসো।'

যাদবসাহেব কথাটিও না-ব'লে বহির্বাস ত্যাগ করলেন। ববন ঘুগারে জামা-কাপড় ছাড়া সাহেবকে বেশ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করলো, যাদবসাহেব স্যুট-বুট ছাড়ছেন তার মতো একজন পিয়ন আর আরো ষাট-সত্তর জন লোকের সামনে! ববন দু-চোখ ভ'রে দেখলো ময়লা অন্তর্বাস, তাঁর ভুঁড়িতে আর হাতে-পায়ে ঘন কালো লোম। পাশে দাঁড়ানো মারুতির কানে ফিশফিশ না-ক'রে পারলো না: 'হা ভগবান, লোকটার গায়ে কী লোম!'

'সঙ্গে বিড়ি আছে নাকি এট্টা?' সে কী বলছে মারুতি কান দিলে না। 'প্রায় দুটো। বাড়ি-ফাড়ি যাবো না নাকি।' 'আরেট্টু চেপে থাক। এট্টু বাদে কেটে পড়তে পারবো।' তারপর একটু নিচু গলায় যোগ করলো, 'গাভান্দি, ধাবালে আর নারায়ণপেথের জোশিসাহেব বক্তৃতা শেষ হ'তেই স'রে পড়েছে।"

'ওদের আর কী। আমরা গেলে যাদবসাহেব জুতিয়ে ছাল তুলে নেবে।'

'কে আর এখন ওকে বলতে যাচ্ছে?'

যাদবসাহেব মার পায়ের কাছে নাপিতের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন। নাপিতের সামনে ঘাড় হেঁট করলেন। নাপিত এমনকী গলায় একটা চাদরও বেঁধে দেয়নি তাঁর। নাপিত তাঁর মাথার উপর নদী-থেকে-আনা জলের পাত্রটা কাৎ ক'রে লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে-চালিয়ে নরম ক'রে নিতে থাকলো। তারপর ঘষতে-ঘষতেই মাথাটা হাঁটুর উপর নামিয়ে এনে চাঁদির উপর থেকে কপাল পর্যন্ত প্রথম লম্বা ক'রে ক্ষুরের টান দিলে। 'মার পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো হাতে ধ'রে থাকো। তাঁর কথা মনে ক'রে চুল উচ্ছুণ্য করবে। তাই-ই নিয়ম।' বুড়ো লোকটি বললে।

যাদবসাহেব খুব শক্ত ক'রে মায়ের পায়ের আঙুল ধ'রে থাকলেন। মনে-মনে তাঁর কথা ভাবতে থাকলেন···ফলত মনটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো। মাকে চুল উৎসর্গ ক'রে তিনি তৃপ্ত। তাঁর চুল যখন কামানো হচ্ছে বহুজোড়া চোখই অধীর আগ্রহে তাঁর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করছে। ববনের তো খুবই মজা লাগলো।

আর মায়ের শব দৃক্‌পাতবিহীন। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয়। কিছুতেই তার কিছু এসে-যায় না—শুধু অপেক্ষা ছাই হ'য়ে যাবার, বাতাস আর আগুন আর মাটিতে মিশে যাবার। চারদিকে এত কাণ্ড আর সে সম্পূর্ণ নিজেতে নিমগ্ন, যেন এ-সবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

'কোথায় একটু পেচ্ছাপ করা যায়,' পাভাতেসাহেব, যিনি তাঁর সবচেয়ে ভালো স্যুটটা প'রে এসেছেন, মারুতি সিন্ধেকে জিগেশ করলেন।

'দাঁড়ান, দেখছি।' মারুতি হন্তদন্ত হ'য়ে চ'লে গেলো। একটু খোঁজাখুঁজি ক'রে সে ফেরৎ এলো। 'কোনো পেচ্ছাপখানা তো নেই, সাহেব।'

ববন খবরটা দিলে। 'সাহেব, গুদোমটার পেছনে একটা ছোটো গলি দেখতে পাচ্ছেন?' পাভাতেসাহেব মাথা নিচু ক'রে গুটি-গুটি চললেন।

ববন আর মারুতি বিড়ি খাওয়ার জন্যে একটু আড়াল খুঁজে নিলে। অল্প দূরেই একটা ধ'সে-পড়া দেয়াল। তারা অতএব তার উপরে গিয়ে বসলো। তার উপর থেকে পুরো শ্মশানটাই পরিষ্কার দেখা যায়।

রাস্তার দিক থেকে একটা চীৎকার আসতে ববন সেদিকে ঘুরলো। দু-তিন জন মেয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদছে আর একটা মড়াকে তাদের শাড়ির আঁচল দিয়ে বাতাস করছে। নিশ্চয়ই কোনো বস্তির মড়া! সামনে-সামনে একটা পাগড়ি-পরা লোক হেঁটে আসছে, তার হাতে একটা মাটির মালশায় আগুন। আর তার চারদিক ঘিরে রয়েছে শোকপ্রকাশকারীরা। সে সমানে আড় চোখে তাকাচ্ছে যেন জানতে চায় কেউ তাকে এইরকম শোকসন্তপ্ত অবস্থায় দেখছে কিনা। আর বহু লোকেই তাকে দেখছে। তার বাঁ হাতটা খামচে ধ'রে পাশে-পাশে একজন হাঁটছে। বা বলা যেতে পারে সে তার হাতটা খামচে ধরতেই দিয়েছে যদিও তার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে তার হাঁটতে অসুবিধেই হচ্ছে। মাথা ঘুরে যাওয়ার বা দুর্বল লাগার কোনো সম্ভাবনাই তার নেই। তা সত্ত্বেও লোকটা তাকে ধ'রে আছে, কেননা তার মনে হচ্ছে এই অবস্থায় তাকে ধ'রে থাকাই উচিত। আরেকজন ঠিক পিছনে-পিছনেই আসছে। দলের অনেকেই ঢাক-ঢোল বাজাতে আর ভজন গাইতে ব্যস্ত। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে।

যখন শববাহকেরা শ্মশানের একদম ধারে এসে পড়লো তখন কোথা থেকে একটা গান্ধিটুপি-পরা লোক উদয় হ'য়ে সেটাকে থামালো।

'থামো ওখানে।'

'কেন?'

'ফোটো নিতে।'

গোটা মিছিলটা দাঁড়িয়ে গেলো। প্রত্যেকে ফোটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে। গান্ধিটুপি-পরা লোকটা তাদের সাজিয়ে দাঁড় করাতে লাগলো।

'চালিটা নাবাও।'

চালিটা নামানো হ'লো।

'চারজন এখানে দাঁড়াও।'

'চারজন বাহক চালির একেক পাশে দাঁড়ালে।

'টিপ্পা, তুমি বোসো।'

যার হাতে মালশাটা ছিলো সে-ই টিপ্পা। সে মাটিতে ব'সে পড়লো। সন্তর্পণে সে মালশাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে, তারপর পাগড়িটা আবার বেঁধে নিলে। তারপর মালশাটা আবার ডান হাতে তুলে নিলে। তার কাছের লোকটি আবার যেমনটি করা উচিত সেই ভাবে তার হাতটা ধ'রে কাছে ঘেঁষে এলো। এবং এইবার ঠিক মাঝামাঝি হ'য়ে তারা ক্যামেরার দিকে মুখ ক'রে বসলো।

শেষ মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে কোনো-একজন মেয়ে একটা কান্নার রোল তুলে দিলে। সবারই যেন কিছু মনে প'ড়ে গেলো। তাকে সামনে এনে মালশা-ওলার অন্য পাশে বসিয়ে দেওয়া হ'লো। 'চুপ করো এখন, থামলে?' গান্ধি-টুপি তাকে একধমক লাগালে। 'ঢের কান্নাকাটি হয়েছে। দেখছো না অন্যেরা কেমন চুপ ক'রে আছে?'

তার দুঃখ উবে গেলো। সে চুপ ক'রে ছবি ওঠার জন্যে ব'সে রইলো। গান্ধি-টুপি অন্যদের চারজন শববাহকের পিছনে সাজালে। তারপর মেয়ে তিনজনকে মড়ার মাথার কাছে বসিয়ে হাওয়া করাতে লাগলো। এতে ক'রে পিছনের জনতার মধ্যে একটা আন্দোলন হ'লো। তারপর ন-দশ বছরের অনেক কটা বাচ্চা বেরিয়ে এসে শক্তভাবে মেয়ে তিনজনের পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে চেয়ে রইলো। একটা বাচ্চার হাত পিছন থেকে কেউ খপ্ ক'রে ধ'রে ফেলেছিলো, কিন্তু একটা সংক্ষিপ্ত ঝগড়ার পর সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিলে। গান্ধিটুপি শার্টের তলাটা সামনে-পিছনে ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে ক্যামেরার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে।

'ঠিক আছে। নোড়ো না কেউ। রেডি?'

গোটা শ্মশানযাত্রীরা নিস্তব্ধ। মূর্তির মতো স্থির। কেউ কাঁদলো না। কেউ

নড়লো না। ফোটোগ্রাফার এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিলে। বললে, 'স্টেডি প্লীজ,' ব'লেই বোতাম টিপে দিলে।

'থ্যাঙ্ক ইউ' ব'লে সে একপাশে স'রে যেতেই ফের শোরগোল শুরু হ'লো। কান্না আর ভজন শুরু হ'লো আবার। মিছিলটা উঠে এগিয়ে চললো।

ববনের মাথায় একটা চিন্তা বিদ্যুতের মতো খেলে গেলো, 'যাদবসাহেবের মা বেঁচে থাকতেই ছবি উঠেছিলো নিশ্চয়। নইলে এ-সব দেখে হিংসে হ'তো।'

'ববনিয়া, এ-সব কখন শেষ হবে রে?' মারুতি বললে, 'আমার তো বেজায় পেট চুঁইচুঁই করছে।'

'দ্যাখে বাছা, একজন বড়ো মানুষি মারা গেছে, এমন সময় তোমার পেট চুঁইচুঁই করে কী ব'লে?'

'কী করবো। দুটো পার হ'য়ে গেছে। আর তাছাড়া পেট পেটই আর মড়া মড়াই। কার তাতে মাথাব্যথা?'

'সাম্‌লে খোকা। যাদবসাহেবকে লাগাবো।' ববন হাসে।

'তোর তো ঠিক আছে। আসার আগে কিছু সাঁটিয়েছিস নিশ্চয়ই। মিসালের গন্ধ পাচ্ছি মুখে।'

ববন হাসি লুকোয়, 'আড়াইটে প্রায় বাজে। এতক্ষণ কেউ টিঁকতে পারে? আসার পথে তাই একটু মেরে দিয়েছি।'

মারুতি দেয়াল থেকে নেমে পড়ে। 'আমিও কিছু-একটু মেরে তারপর তেনার মায়ের কাছে ফিরে আসছি।' ইতি-উতি তাকিয়ে সে সাবধানে কেটে পড়ে।

ববন একা প'ড়ে থাকে। বিড়িতে একটা শেষ টান মারে সে।

পনবল, ঘামতে-ঘামতে, চারদিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজতে-খুঁজতে আসে।

'ববন,' ডাকে সে। ববন বিড়িটা চেপে নিবিয়ে দেয়। 'এখানে আয়। সিন্ধে কোথায় গেছে?'

'জানি না। এক মিনিট আগেও এখানে ছিলো। কেউ নিশ্চয় সিগ্রেট কিনতে পাঠিয়েছে।'

'তাড়াতাড়ি আয়। চিতা সাজাতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

যাদবসাহেবের গোটা মাথাটাই কামানো হ'য়ে গেছে। তিনি কেবল দাঁড়িয়ে আছেন। আর সবাই তাঁকে ঘিরে। তাঁর ভাই-বোনেদের একটু পাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা নীরবে কাঁদছে।

যখন চিতা হাঁটুসমান হ'লো, পনবল যে-দড়িদড়া দিয়ে যাদবসাহেবের মায়ের দেহটা বাঁধা ছিলো সেগুলো খুললো। প্রত্যেকেই দেহটা তুলে সুন্দর ক'রে চিতায় শোয়াতে হাত লাগালে। তারপর চুড়ো ক'রে খুঁটে সাজানো হ'লো। মুখটা কেবল খোলা রাখা হ'লো। খোলা মুখে জল দিতে ডাকা হ'লো সবাইকে। কিছুটা কষ বেয়ে গড়িয়ে গেলো, কিছুটা ভিতরে গেলো। জল দিয়ে কোনো ফল হ'লো না কিন্তু তাও জল দিতে পেরে সকলেই একটু আরাম পেলে, যেন দেহটার একটা মহা উপকার করা গেছে। মুখের উপর জ্বালানি স্তূপ করা হ'লো। জ্বালানো হ'লো। শোককারীদের মধ্যে থেকে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'মা! মা! সত্যিই চ'লে গেলে?' বড়ো বোন আবার শুরু করে।

'আর কান্নাকাটি নয়,' বৃদ্ধটি উঁচু গলায় বলে, 'ওঁর যাওয়ার পথ কেঁদে ভাসিয়ো না। ঠাণ্ডা হও। তাহ'লে উনিও শান্তিতে যাবেন। তোমাদের জন্যে আর কত-কাল কষ্ট ভোগ করবেন?'

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে মুখে আঁচল গুঁজে দেয় বড়ো বোন, তারপর চুপ ক'রে যায়। সত্যিই তো মায়ের যাওয়ার পথ তো সে কেঁদে ভাসাতে পারে না।

যাদবসাহেবকে কাঁধে মাটির ঘড়া নিয়ে নদীতে নিয়ে যাওয়া হ'লো। তাঁকে চান করানো হ'লো। ঘড়াটা ভর্তি ক'রে তাঁর কাঁধে চাপানো হ'লো। একটিও চুল নেই মাথায়···এমনকী ছুঁচলো গোঁফটাও গেছে। কেবল আণ্ডারওয়্যার পরা, আর ভিতর দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছে! আর সেই ভেজা ত্যানা প'রে কাঁধে ঘড়া নিয়ে তিনি উঠে এলেন···স্বপ্নেও কখনও এমন করার কথা ভাবেননি! কিন্তু এ-সবই তাঁর মায়ের আত্মা যাতে শান্তি পায় তার জন্যে করা, তাঁর কোনো খেদ নেই।

ভিজে চুপ্পুর অবস্থায় তাঁকে আনা হ'লো। তিনি চিতার দিকে পিছন ক'রে দাঁড়ালেন আর পনবল একটা সরু পাথর দিয়ে ঘড়ার তলায় একটা ফুটো ক'রে দিলে। সরু একটা জলের ধারা বের হ'লো।

'ওদিক দিয়ে আসুন,' পনবল সাহেবকে বলে। সাহেব, চোখ নিচের দিকে, চিতার চারদিকে একটা জলের পথরেখা আঁকেন। সবাই তাকিয়ে থাকে। আটবার ঘোরা হ'য়ে গেলে পনবল তাঁকে থামায়।

'থামুন এবার। চিতা পেছনে রেখে পেছন দিকে না-তাকিয়ে ঘড়াটা ছুঁড়ে দিন। জোরে করবেন বেশ। পায়ে যাতে না-পড়ে।'

সাহেব ঘড়াটা ছেড়ে দেন। মাটিতে প'ড়ে সেটা চুরমার হ'য়ে যায়।

'চমৎকার! এইবার নিজের মুখে মারুন।' এখনও পনবলই সাহেবকে নির্দেশ দিচ্ছে। সাহেব তার দিকে একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন।

বৃদ্ধ আবার এগিয়ে আসে। 'আওয়াজ না-ক'রে নিজের মুখে মারলেই হবে।' পিছনে তাঁর ভাই আবার কাঁদতে শুরু করে। সকলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

যাদবসাহেব একটা তোয়ালে দিয়ে নিজেকে বেশ ক'রে রগড়ান। জামাকাপড় পরেন, তারপর তোয়ালেটা মাথায় বাঁধেন। তোয়ালের জন্য আর ক্ষৌরির জন্যে তার মুখটা স্পষ্টতই একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মা মারা গেলে মনের যা ভাব হয় ঠিক সেইরকম একটা ছাপ—এর ফলে দর্শকদের মনে তৈরি হচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষ হ'লে পনবল চিতাটি ভেঙে দেয়। বাঁশগুলো প্রথমে ভাঙছিলো না, কিন্তু সে হাঁটুতে বাধিয়ে আর একটা দেয়ালের কোণার সাহায্যে ব্যাপারটা সমাধা ক'রে ফেললো। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো আগুনটা খোঁচানোর জন্য একটা লম্বা বাঁশ সে আলাদা ক'রে রেখে দিলে। চিতাটা ভাঙা হ'য়ে গেলে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

সবাই চ'লে যায়।

'আগুন দিয়েছে। এবার চ'লে যাওয়া যায়।' ঠাটে ধর্মাধিকারীকে বলে।

'আর-কেউ যখন যাচ্ছে না যাই কী ক'রে?'

'বড্ড দেরি হ'য়ে যাচ্ছে কি না।'

'জানি, কিন্তু···'

অতএব সকলে চুপ ক'রে ব'সে চিতার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে, ঠিক সময়ের। কয়েকজন একটু ছায়া খুঁজে নেয়। কয়েকজনের প্যান্ট কড়া ইস্ত্রি করা, সুতরাং তারা চালাটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কেউ-কেউ সাইকেলের ক্যারিয়ারের উপর ভর দিয়েছে। যাদের পা বেশি ব্যথা করছিলো তারা সোজা বসবার চালাটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে ধুলোভর্তি সিঁড়ি বা মেঝের উপরই ব'সে পড়ে। হেদিয়ে গেছে তারা। তাদের পেট খালি। প্রাণ খুলে কথা বলারও উপায় নেই। একটু আরাম করার উপায় নেই। চা নেই। কেবল সিগারেট খাওয়া ছাড়া কাজ নেই। বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

ববন আর মারুতি ফিরে গিয়ে দেয়ালের উপর বসে। অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে যে-বাজনদারদের দল এসেছে তারা এখন পুরোদমে চালাচ্ছে। ভজন গায়ক, ঢাকি, তাল রাখছে যে-ঢোলবাদক তারা নিজেদের একটা শব্দের জগতের মধ্যে ডুবে গেছে। শ্মশানযাত্রীদের অনেকেই শুনছে। সুরের সঙ্গে যখন সুর মিলে যাচ্ছে

তাদের মনগুলোও একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। ভালোই লাগছে তাদের। আর মৃত বস্তুটির সঙ্গে আত্মীয়স্বজন এসেছে যারা তারা এমন ভাব করছে যেন এইসব গানটানের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই।...চিতা বানাচ্ছে, মৃতদেহ তুলছে চিতায়, নিকটাত্মীয়দের আগুন দিতে বলছে, কাঁদছে, চিতার চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে...সেই নিয়েই তারা সম্পূর্ণ ব্যস্ত। মৃতেরাও নিজেদের মধ্যেই নিমগ্ন।

সমানে নতুন মড়া আসছে। ভিড় বাড়ছে, শ্মশানযাত্রীদের কর্মব্যস্ততা বাড়ছে। নতুনদের জায়গা ক'রে দেবার জন্যে বেশ কয়েকজন ডোম পুরোনো চিতার ছাই ঝেঁটিয়ে ফেলছে। প্রত্যেকেই ব্যস্ত। প্রত্যেকেরই খেয়াল আছে যে কাজ জ'মে উঠছে। সকলেই চায় ঝটপট কাজটা সেরে ফেলতে। এত রকমের ক্রিয়াকর্মাদি সারতে-সারতে এমনকী মৃতদেহগুলো পর্যন্ত যেন একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে। কিন্তু যাই হোক, এ-সবের মধ্যে দিয়ে যেতে তাদের হবেই, নাহ'লে তাদের আত্মীয়রা শান্তি পাবে না। চিতার উপর মৃতদেহগুলির চোখ আকাশে স্থির হ'য়ে আছে, কিন্তু এই গোলমালে সেদিকে নজর দেওয়ার সময় কারু নেই।

নদী আর ব্রীজ পেরিয়ে যে-রাস্তাটা গেছে তার উপর লোক চলাচল আর গাড়িঘোড়ার বিরাম নেই; উঁচু-উঁচু বাড়ি, উজ্জ্বল, খুশিয়াল রঙিন শাড়ির দোকান, নানা রঙের গাড়ি। গোলমাল, ঘুরন্ত চাকা, ব্রীজের উপর দুই দিকে যাতায়াত-করা যাত্রীদের শশব্যস্ততা, জীবনের স্পর্শ, অনুভব। তার এপারে শ্মশানঘাট। এইসব লোকের দুঃখের জায়গা, প্রতীক্ষার জায়গা। সার-সার মৃতদেহ জ্ব'লে ওঠে। কয়েকজনের ভস্মের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় এই আশায় যে কাকেরা সেগুলো খাবে। সকলের চোখ কাকগুলোর উপর। উঁচু-উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে কাছেই নদীর ধারে, চিতার আগুনে ঝলসে গেছে, কিন্তু তাও বেঁচে আছে, আর তাদের উপরে দল বেঁধে এসে জড়ো হয় কাকেরা। দশ-বিশজনের ঝাঁক বেঁধে তারা জড়ো হয়। চার বা পাঁচটা গাছ, চার বা পাঁচটা ঝাঁক। যখনই কোনো কাক একা উড়ে যায় সে কিন্তু অন্য-কোনো ঝাঁকে ফেরে না—সবসময় নিজের পরিচিত ঝাঁকটিতে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ঝাঁকেরই নিজস্ব নিয়মকানুন রয়েছে। তা না-হ'লে ওরা নিজেদের এভাবে সংগঠিত করতে পারতো না। তারা নৈবেদ্যের খাবারের দিকে নেমে আসে, তাদের স্পর্শে মৃতেরা মুক্তি পায় আর জীবিতেরা ভারহীন মনে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। ফিরে যেতে-যেতে তারা আবার পুরোনো কথা স্মরণ করে, এবং পুরোনো কথা মনে ক'রে কাঁদে।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা বাদে যাদবসাহেবের মায়ের চিতা থেকে একটা ফটাশ

আওয়াজ আসে। তারা সবাই শোনে—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রবণে উন্মুখ ক'রে শোনে।

যাদবসাহেব চিতার দিক থেকে হেঁটে এসে সকলে চ'লে যেতে শুরু করে।

'সব ছাই হওয়া অবধি আমি এখানে আছি, সাহেব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

পনবল একাগ্রভাবে চিতার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। যাদবসাহেব তার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকান এবং পরিবারের লোকজনদের নিয়ে চ'লে যান।

সকলেই বাড়ির কথা, খাওয়ার কথা, বৌ-ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে থাকে। কেউ-কেউ সাইকেল আনে। কেউ বাসে যায়, কেউ রিক্সায়।

এই জনতা ব্রীজের উপরের জনতার সঙ্গে মিশে ব'য়ে যায় আর মড়াগুলো শান্তিতে পুড়তে শুরু করে।

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

পোটরাজ

শঙ্করন খারাট

গ্রামের পোটরাজ দামার বাড়ির আবহাওয়া ভারী। সমস্ত জায়গায় কেবল লোকেরা হাঁটুর উপর মাথা রেখে ব'সে। দামার বৌয়ের চোখ জল ভরা। থেকে-থেকেই সে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা আসছে, একটুক্ষণ থেকেই চ'লে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই কেউ-না কেউ এসে দোরে দাঁড়াচ্ছে।

লোকে এসে শুধোচ্ছে, 'দুরপত, পোটরাজ কেমন আছে?'

'এখনও প্রাণটুকু আছে খালি. বাবা।' করুণ মুখে জবাব দিচ্ছে সে।

'ভেবো না, ভালো হ'য়ে যাবে, ভালো হ'য়ে যাবে। কাঁদছো কেন? সারা গাঁয়ে একই অবস্থা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একজন অন্তত বিছানায়।'

'জানি, বাবা। তাও ভয় লাগে।'

'দুরপত, কারু যাওয়ার সময় হ'লেই সে যাবে। আর যার সময় হয়নি, যা-ই রোগ হোক-না কেন, সে টিকে যাবে।'

'জানি, বাবা। ঠিক। কিন্তু বড়ো কঠিন রোগ।'

'কেউ না বলেছে? এখন ঠাকুরের মুখে চাওয়ার সময়। হয়তো এবার মা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর কাছে সক্কলে সমান।'

ঠিক এইসময়ে বাড়ির সামনের নিমগাছে একটা কাক চেঁচিয়ে ওঠে। দুরপত বলে, 'এই বাচ্চারা! মার্ বেজন্মাকে। পোটরাজকে ডাকে রে।'

কাকটা ডেকেই চলে। দুরপতের ছেলে তার দিকে ঢিল ছোঁড়ে। ডাকতে-ডাকতেই কাকটা উড়ে পালায়।

'সবসময় বেজন্মাটা আমাদের শাপমন্যি করছে।' দুরপত গজগজ করে আপনমনে।

এ হ'লো আষাঢ় মাস। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। সমানে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। মাটি কাদায় আঠাল হ'য়ে এলো। গুমোট। গাছের পাতা একটুও নড়ছে না, স্থির। তা থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে।

দামার বাড়ির দরজায় একটা কুকুর টানা চীৎকার জুড়ে দিলে। শুনে দুর-

পত্তের প্রাণ শুকোয়। সেই আওয়াজের উপর দিয়ে সে চ্যাচায়, 'হে ভগবান, গোর দেয় না কেন কেউ কুত্তাটাকে।'

'ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতের কথা বলছে গো।' হুরপত্তের পাশে বসা বৌটি বলে। তখন হুরপত্তের অন্য পাশে বসা বঙ্কলা বলে, 'হুরপা, মারী-আই-এর যাত্রায় গিয়েছিলি তো?'

'যেতে ভুলি কী ক'রে?'

'তা বলিনি। ভাবলাম এই বিপদের সময়ে যদি ভুলে গিয়ে থাকিস?'

'না, মেয়ে, মা যদি নিদয়াও হন তাঁকে তো কিছু দিতেই হবে।'

'ছাড়্ তো। হঠাৎ কথাটা মাথায় এলো ব'লে বললাম।'

'সব দেবতার মধ্যে ওঁরে তুচ্ছি করি সাধ্যি কী। ওঁরে কেউ হেলা করেছে কি টেরটি পেয়েছে। ক্রোধ তেনার বর্ননার বাইরে। ওঁরে তুষ্ট রেখে ভালো করেছিস। এবার সে ভালো হ'য়ে যাবে।'

মেয়েটি হুরপত্তের মুখে তাকিয়ে যোগ করে, 'এই ছাখো, কাঁদিস কেন? কাঁদলে অমঙ্গল হয়। হুরপা, তোর সোয়ামির কিছু হবে না রে। মা ওকে দেখবেন।'

'সে তো বটেই। ওর বাপ-মা মায়ের কাছে মানত করেছিলো ওকে। সে-জন্যেই তো ও পোটরাজ।'

বঙ্কলাবাঈ বলে, 'তাহ'লে? এই তো বুঝেছো। দামা হ'লো গিয়ে মায়ের পোটরাজ। তাঁর ভক্ত। নিত্যি তাঁর পুজো করে। মা কি তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন না? তাঁর রোষে সে পড়ে কী ক'রে? ব্যাপারটা কী? উনি কি দেখতে পান না এ-ঘরে ছোটো ছেলেপিলেরা রয়েছে?' হুরপা বলতে শুরু করে, 'এ-সব কথাই মনে জেগেছে গো। হে মা, তোমার রোষে পড়লাম কেন? এ-বাড়িতে ঢোকা ইস্তক মঙ্গলবারে শুক্রবারে তোমার নামে উপুশ করেছি। হে মা, বছর-বছর তোমার যাত্রা করি। তোমায় দুধে, দই-এ চান করাই। সবুজ শাড়ি পরাই। কপালে হলুদ, কুমকুম দিই। তোমার সুমুখে ভোগ দিই, নারকেল দিই। প্রতি আষাঢ়ে অমাবস্যায় তোমার সামনে স্নানের পর ভেজা শাড়িতে গড়ান দিই। বছর-বছর যেমন পারি তোমায় দিই। ছাগল দিতে না-পারলে কুঁকড়ো দিই। তোমার দোরে রক্তের ছড়া দিই।

'মা, এ-বাড়িতে যেদিন থেকে বৌ হ'য়ে এসেছি তোমার সামনে পিদিম দিয়েছি। কখনো তোমায় আঁধারে রেখেছি, বলো মা? তোমারে এত ভক্তি করি তবু আমার কপালে এমন কেন মা?

'মা, তোমার লিলে বুঝি না।'

দুরপত ব'লেই চলে, ব'লেই চলে। তার গলায় আর্তি। শেষে মারী-আই-এর মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে হাত জোড় ক'রে সে প্রার্থনা করে।

'দেবী, আমি কি কোনো ভুল করেছি? কী ভুল করেছি? ভুল ক'রে থাকলে শাস্তি দাও। কিন্তু আমার সোয়ামিকে বাঁচাও। তার হাগা বমি বন্ধ ক'রে তাকে ভালো ক'রো মা।'

আবহাওয়া থমথমে। গাঁয়ের সর্বত্র কান্না আর চীৎকারের আওয়াজ। আর দুরপতের বাড়ির বাইরের নিমগাছে ব'সে একটা কাক ডাকছে।

শুনে তার হাত-পা স্থির।

রাতে একটা ফেউ বাড়ির চাদ্দিকে চক্কর দিতে-দিতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে অন্ধকারকে চেরে। আর দুরপতের বুকের ধুকধুকি পলকের জন্য থমকায়।

তারপর নতুন দিন হয়।

আকাশে মেঘ ঘন ক'রে আসে। চাদ্দিক অন্ধকার, খাঁ-খাঁ লাগে। সমানে বিষ্টি পড়ছে। সূর্য উঁচু হ'য়ে যায়, কিন্তু মেঘের জন্য চোখে পড়ে না। এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল আর তার চেলা দুয়ারে আসে। চেঁচিয়ে বলে, 'দামা, বাড়ি আছো নাকি, দামা?'

পোটরাজের বাড়ির ভিতর থেকে কোনো জবাব আসে না। এমনকী ফিশ-ফিশানিও না। তাতে মোড়ল গলা চড়ায়, 'ওহে দামা, পোটরাজ বাড়ি আছে?' শেষ পর্যন্ত কেউ-একজন উঁকি মারে এবং লোক চারজনকে দেখে বলে, 'গ্রামমণ্ডলের লোকেরা এয়েছে গো।'

বঙ্কলাবাঈ বলে, 'সে তো সত্যি। পোটরাজ কেমন আছে দেখতে লোকে তো আসবেই। তিনদিন হ'য়ে গেলো পোটরাজ রোঁদে বেরোয় না।'

'তাছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই একজন ক'রে বিছানায়।'

'কে যে কাকে বলে।'

'কে কী বলবে : কেউ জানে না আজ তার কপালে কী ঘটবে।'

'তা ঠিক। তাও সবাই অন্যকে জিগেশ করে।'

'ভুলো না, দামা গাঁয়ের পোটরাজ। আর এখন যখন মা খেল শুরু করেছেন যে-ই তাঁর সামনে পড়বে সে-ই তাঁর কোপে পড়বে। তাই এই দোরে লোককে আসতে হবেই।' মেয়েরা যখন কথা বলছিলো দুরপত দরজার কাছে গেলো। বাইরে আসতে-আসতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো দুরপত। মোড়ল-এর সামনে

দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'পেন্নাম হই।'

তার অবস্থা দেখে মোড়ল শুধোলে, 'দামা কোথায় এ-কদিন?'

'ঘরে বিছানায়।'

'বিছানায়? কেন?'

'মায়ের দয়া।' বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফ্যালে। মুখ ঢাকে সে।

'বলো কী, মা নিজের ভক্তকেই হেনেছেন?' মোড়ল অবাক হয়।

আরেকজন বলে, 'নয় কেন? মানুষ তো সে।'

'তা ঠিক, কিন্তু তার সকাল-সাঁঝ মায়ের ছায়ায় বসবাস।'

'কিন্তু দেবীর চক্কর যখন শুরু হয়েছে কে যে কোপে পড়বে আর কে পড়বে না তার ঠিক নেই।'

'তা ঠিক,' মোড়ল বলে। তারপর দুরপতের দিকে ঘুরে তাকায়, 'দুরপত, আমাদের আরেকবার যাত্রা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ। করতেই হবে। মাকে খুশি করতেই হবে।' কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে বলে দুরপত।

'কিন্তু আমাদের সেবাইৎকে না-হ'লে যাত্রা করা যাবে কী ক'রে?'

'ঠিক, কিন্তু মরদটা আমার প'ড়ে আছে যে।'

'দুরপত, মাকে গাঁয়ের সীমানায় নিয়ে যেতে হবেই।'

'ঠিক। না-হ'লে মার চক্কর গাঁয়ের উপর থেকে কাটবে না।' আরেকজন যোগ করে। 'তাই দেবীকে মিছিল ক'রে গাঁয়ের সীমানার বাইরে রেখে আসতে হবে তো।'

'জানি, কিন্তু পোটরাজ যে বিছানায় প'ড়ে আছে। কী ক'রে করবে?'

মোড়ল এই কথা বলতে দুরপত বললে, 'যদি শুধু পোটরাজ বিছানায় প'ড়ে থাকে সারা গাঁ "যাত্রা"য় যাবে না কেন?'

'তা কী ক'রে হয়? সে হ'লো দেবীর পোটরাজ। তাকে ছাড়া "যাত্রা" হবে কী ক'রে?'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সে তো উঠতেই পারছে না। নড়তেই পারছে না।'

দুরপত এই কথা বলতে গাঁওবুড়োরা নিজেদের মধ্যে শলায় লাগলো। হঠাৎ মোড়লের মাথায় একটা কথা খেললো, 'আরে! তোর বড়ো ছেলে তো বাড়িতেই আছে, আছে না?'

'ওই হাইস্কুলে পড়ছে এখন যে-ছেলেটা? হ্যাঁ, আছে।'

'ওর কথাই বলছি।'

'হ্যাঁ, বাড়িতেই ব'সে আছে।'

'তা ওর বাবার জায়গায় ও যদি "যাত্রা"টা করে তো ক্ষতি কী!'

'অতটুকু বাচ্চা পারবে কী? ওকে কি এখনই পোটরাজ বলা যায়?'

'পোটরাজ যদি নাও হয় এখন ওকেই পোটরাজ ব'লে ধরতে হবে। ওর বাবা না-থাকলে তোর বাড়িতে তো একজন পোটরাজ থাকতে হবেই।'

'তা তো হবেই। কিন্তু শুধু বাক্যিতে কি পোটরাজ হয়। তার জন্যে দরকার "যাত্রা" করা। তাছাড়া দেবীর কাছে কিছু-একটা মানত করাও দরকার।'

'করুক-না ও, কী এসে-যায়! তাছাড়া গাঁয়ের জন্যে একজন পোটরাজ তো দরকারই।'

দুরপতের বড়ো ছেলে আনন্দ সব কথাই শুনতে পেলে। সে যতই শোনে ততই ঘামে। বাকিটা জীবন দেবীকে পিঠে ক'রে ব'য়ে বেড়াতে হবে ভাবতেই তার রাগ হ'তে থাকলো। নিঃশ্বাস ঘন হ'য়ে এলো। বুকের ওঠাপড়া দ্রুত হ'লো।

ইতিমধ্যে মোড়লের সঙ্গে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে একটা লোক সবজান্তার মতো ব'লে উঠলো, 'ও রাজি না-হ'লে গোটা গাঁটাই মায়ের কোপে পড়বে।'

'হ'তে পারে, কিন্তু একবার পোটরাজ হ'লে সারা জীবনই তো ওকে পোটরাজ থেকে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, তো সে খারাপ কী? ভালোই তো।'

'তোমরা বলছো! ছেলে আমার হাইস্কুলে ইংরেজি পড়ছে।'

'তো? পোটরাজ হ'লে স্কুল কি পালিয়ে যাবে?'

'তুমি তা বললে কী হবে, কিন্তু ওর কেমন লাগে, তা তো ভাবতে হবে।'

'বাঃ, কেবল ছেলের কথাই ভাবছিস, বাকি গাঁ-টার কী হবে?'

'দুজনের কথাই ভাবতে হবে।'

হঠাৎ মোড়লের সঙ্গে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে একজন একরোখা গোছের লোক কর্কশভাবে ব'লে উঠলো, 'ছাড়্‌ তো, ওকে পোটরাজের পোশাক পরিয়ে পাঠাচ্ছিস কি না? হ্যাঁ, না, না? গাঁয়ের ধারে মিছিল নিয়ে যেতেই হবে!' এই ধমকানোর স্বর শুনে আনন্দ রাগে কাঁপতে শুরু করলে। লাফিয়ে উঠে সে হাত মুঠি করলে। রাগে তার চোখ ঠেলে বেরুচ্ছে। দুরপত ঠিক সেই সময় জবাব দিলে, 'এ-র'ম কথায় মায়ের রাগ কি পড়বে?'

মোড়ল দুরপতকে বলে, 'কথা ঘোরাস না। কাজের কথা বল্। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বল্ হ্যাঁ কি না?' ভয় দেখিয়ে গ্রামমণ্ডলের লোকেরা ফিরে গেলো। দুরপত বোঝে না কী করবে। ঘরে গিয়ে কপাল চাপড়ে মেঝেতে পড়ে সে। দামা শূন্যদৃষ্টিতে বৌ-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর আনন্দ দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দুরপত ভাবে ছেলেটা দৌড়ে গেলো কেন? ভাবতে-ভাবতে উঠে সে দরজায় যায়। ছাখে সে মারী-আই-এর থানের দিকে হনহনিয়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে ডাকে, 'আনন্দ, আনন্দ।'

কিন্তু আনন্দ দ্রুত চ'লে যায়।

সেদিন অনেক রাত্রে সে বাড়ি ফিরে আসে। তাকে দেখে মনে হয় কোনো একটা ঘোরের মধ্যে আছে। রাত্রি যায়। সকাল আসে। সূর্য উঠলে সে চুপচাপ কাছের নদীতে চান করতে যায়। চান সেরে ধীরে-ধীরে বাড়ি ফিরে বাবার পাশে এসে বসে। বাড়িতে তখনও যারা আছে তাদের কথা শোনে সে। মন দিয়ে শোনে।

'শুনেছো! মা নিজে গাঁয়ের ধারে গিয়ে ব'সে আছেন।'

'হা ভগবান! গেলেন কী ক'রে?'

'বলিস কী রে, গেলেন কী ক'রে! দেবতা তো। আজ এখানে, কাল ওখানে। বিশ্বসংসার ওনারই হাতে।'

'ঠিক কথা! দেবীর লীলা!'

'পেত্যয় যায় না।'

'যা বলিস বল্। দেখে মনে হ'লো মা খুশিতে ব'সে। নতুন একটা সবুজ শাড়ি পরেছেন। গলায় অনেকগুলো সবুজ বালা দিয়ে তৈরি একটা নতুন হার। রুপোর চক্ষু সামনে চেয়ে আছে।'

'তা-ই কী খালি! সারা গাঁ সেখেনে ভেঙে পড়েছে।'

দুরপত মাঝে এসে পড়ে, 'সত্যি? সত্যি নাকি?' তার এখনও সন্দেহ যায়নি।

'সত্যি তো বটেই। মা নিজেই গাঁয়ের ধারে চ'লে গেছেন। বসার জায়গাটাও নিজে বেছেছেন। গাঁয়ের লোকের বিশ্বেস দেবীর চক্কর এবার কেটে যাবে।'

'ঠিক। এতেই বোঝা যায় দামাকে দেবী কী চোখে ছাখেন। পোটরাজ বটে!'

'বলছো তাই?' দুরপতের আর খুশি ধরে না, 'লোকে বলছে বটে দামার ভক্তির জোরেই মা গাঁয়ের ধারে গেছেন।'

'লোকে বলছে দামা বড়ো পুণ্যবান।'

দামা, যে এতক্ষণ মড়ার মতো শূন্যচোখে শুয়েছিলো, শুনতে পেলো। দেহে যেন সে বল ফিরে পেলো। উঠে ব'সে জল চাইলো সে। খুব তেষ্টা পেয়েছে এইভাবে জল খেলো। তারপর একটু গরম ভাতের পায়েস খেলো। বেশ ভালো বোধ করতে লাগলো সে।

তাকে উঠে বসতে দেখে দুরপত একটু ঠাণ্ডা হ'লো। তার স্বামী হঠাৎ খাড়া হ'য়ে উঠেছে। এবার বেশ লাগছে তার। আকাশের দিকে স্পষ্টতই ভক্তি-ভরা চোখে তাকিয়ে সে হাত জোড় করলে।

'হ'তে পারে, কিন্তু সকাল-সাঁঝ দেবীর ছায়ায় বাস।'

'সে-কথা ঠিক। আর দেবীর চক্কর যখন শুরু হয়েছে কে তাঁর কোপে পড়ে ঠিক কী!'

'সে তো বটেই। সবাই থালায় নারকোল আর নিভোদ নিয়ে গাঁয়ের ধারে চলেছে। যে-কোনো জায়গা থেকে পুজোর আওয়াজ শুনতে পাবে।'

'সবাই খুশি।'

ইতিমধ্যে মিছিল দামা পোটরাজের বাড়ির সামনে পৌঁছোয়। ঢাক বাজছে, ঘণ্টা বাজছে, গান হচ্ছে। দেবীর পূজা সেরে মিছিল ফিরছে। ভক্তেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মারী-আই কি জয়!'

উল্লাসের চীৎকার শুনে দামার হাতে পায়ে বল ফিরে আসে। তার মনে হয় ফের শরীরে রক্তচলাচল শুরু হ'লো। উঠে সে আস্তে-আস্তে দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজার কাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরো মিছিলটা এখন তার বাড়ির সামনে। নারী-পুরুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় উল্লাসধ্বনি: 'মারী-আই কি জয়! দামা পোটরাজ কি জয়!'

সেই চীৎকারে দামার মুখ আলো হ'য়ে যায়। তারপর মিছিল থেকে একজন এগিয়ে এসে তার গলায় হলুদ ফুলের মালা পরিয়ে দেয়, আর আবার সকলে তার নামে জয়ধ্বনি দেয়—'দামা পোটরাজ কি জয়!'

আনন্দও দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। অন্যমনস্কভাবে সে মিছিলটাকে লক্ষ করে। তার মুখ শক্ত হ'য়ে যায়। মিছিল গাঁয়ের দিকে এগোয়। দামা ঘরে ঢুকে আসে। দুরপত বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে! আনন্দ মায়ের কাছে এসে ফিশফিশ ক'রে বলে, 'মা, মারী-আই-কে আমি গাঁয়ের ধারে রেখে এসেছি।'

চমকে ওঠে দুরপত, গভীর আতঙ্কে জিগেশ করে : 'সত্যি ? সত্যি করেছিস নাকি, বাবা ?'

'হ্যাঁ, মা। মিছিলকে গাঁয়ের ধারে নিতেই হবে, তাই না ?'

আনন্দর কথা শুনে দুরপতের মাথা নেমে আসে। পা কাঁপে। ছেলেকে হঠাৎ কাছে টেনে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'আনন্দ, ভুলিস না। কাউকে কখনো বলবি না, আমার মাথার দিব্যি। কাউকে না।' এই ব'লে তাকে আবার জড়িয়ে ধরে।

এবারে হাসে আনন্দ।

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

বাঘ

অশোকমিত্রন

আমাদের লাঞ্চের ছুটি বেলা একটা থেকে দুটো। এই কিছুদিন আগেও, যখন সবাই কাজে আসতো বেলা এগারোটায়, ছুটিটা শুরু হ'তো আড়াইটেয়। একটু অদ্ভুতই লাগতো ব্যাপারটা। সাড়ে-দশটা পৌনে-এগারোটায় দুপুরের খাবার খেয়ে নিতো সবাই, যাতে সাড়ে-এগারোটার সময় আপিশে পৌঁছে যাওয়া যায়, তার পরেই খানিকক্ষণ যেতে-না-যেতেই ফের একটার সময় টিফিনের ছুটি! সেই জন্যেই ক্যানটিনে সবচেয়ে বেশি ভিড় থাকতো দুটোর সময়। এখন আপিশ বসে সকাল সাড়ে-দশটায়, মাঝখানে একটা থেকে দুটো ছুটি। যদিও আপিশ বন্ধ হবার কথা বিকেল পাঁচটায়, এখন সেখানে কাজ থাকে সন্ধে ছ-টা অব্দি।

কিন্তু কাজ বলতে সেই যেমনকে সেই, খাড়াবড়িথোড়। সকলের জন্যই আট ঘণ্টার দিন এখন: ছুতোরদের কারখানা ঘরে, বিদ্যুৎ বিভাগে, ল্যাবরেটরিতে, হিশেব দপ্তরে—সর্বত্রই এখন আট ঘণ্টার দিন। অবশ্য এই শেষ দপ্তরটায় সারা বছরই হিশেবের কাজের কমতি থাকে না, তা সে অন্যত্র কাজ কিছু হোক, চাই না-হোক। তারপর আছে টেলিফোন অপারেটর। টেলিফোনের তো আর কোনো যতি বা বিরতি নেই, নেই দম ফেলবার কোনো ফুরসৎ। শুধু যারা এ-সব দপ্তরে কাজ করে না তারাই এই আপিশে মাঝে-মাঝে বিশ্রাম করার সময় পায়। একসময় আমাদের স্টুডিও পাক্কা দেড় বছর কোনো সিনেমা তোলেনি। সেই আঠারো মাস কোনো কাজ না-ক'রেই আমরা মাইনে পেয়েছিলাম, আর বেশ আলস্যেই দিনগুলো কেটেছিলো টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ব'সে-ব'সে, চুলে আস্তে-আস্তে পাক ধরিয়ে, আর উদরের কাছে নির্ভুলভাবে মেদ বাড়িয়ে। ডায়াবেটিস ধরেছিলো আমাদের, চোখে গজিয়ে উঠেছিলো অস্থিরতা, আর মুখ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় বাক্যগুলো বেরুতো দায়িত্বজ্ঞানহীন গুজবে। আঠারো মাস পরে স্টুডিও যখন আবার সক্রিয় হ'য়ে উঠলো, বেশ সাড়াই প'ড়ে গিয়েছিলো চারধারে, যদিও এতদিনকার অব্যবহারে মরচে ধরেছিলো ব'লে কাজ এগুচ্ছিলো থেমে-থেমে, ধীরে-ধীরে। এ-রকম একটা সময়েই আমরা যখন কোনো-একটা উত্তেজনার জন্য

ঘুমিয়ে আছি, লোকটা এসে হাজির হয়েছিলো এখানে। টিফিনের ছুটির পর আমরা তখন ব'সে-ব'সে পানদোক্তা চিবুচ্ছি।

'কী করতে পারি আপনার জন্যে ?', শর্মা জিগেশ করলে।

শর্মা আগে ছিলো পুলিশের দারোগা, এককালে সবাইকে দেখিয়ে দারুণ সব ট্রাউজার্স পরতো। এই স্টুডিওতে চিত্রনাট্যলেখক হিশেবে সে পাকা আসন ক'রে নিয়েছিলো, তার আগে নাট্যকার আর ছোটোগল্পলেখক হিশেবে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলো কিছুকাল। আমাদের প্রযোজককে সে তার মোটরবাইকের পেছনে চাপিয়ে বেরিয়ে যেতো লোকেশন খোঁজায় তাকে সাহায্য করতে। এখন তাকে সারাক্ষণ দেখা যায় ধুতি-পরা, চোয়াল সবসময়েই খৈনির ডেলা নিয়ে ব্যস্ত। যখন সে খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন তার চওড়া কাঁধ আর বুকের খাঁচাই ব'লে দেয় যে সে কত বছর বিশ্বস্তের মতো জিমনাসিয়ামে কাটিয়েছে।

ছোটো ঘর। ছোটো-বড়ো সব টেবিল পাতা, তার মধ্যে শর্মাই সবচেয়ে বড়ো টেবিলটার পেছন থেকে দৃশ্যটায় একটা ভারিক্কি প্রভাব ফ্যালে। চেয়ারগুলো প্রায় কোনোটাই মানায় না, বেশির ভাগেরই এক-আধটা পায়া খাটো, কেউ বসলেই এক পাশে হেলে যায়, আর তাতে সবাই বেশ ঘাবড়েও যায় গোড়ায়। যে-লোকটা ঘরে ঢুকেছিলো, সে একটা চেয়ার ধ'রে দাঁড়িয়েই রইলো।

'কী করতে পারি আপনার জন্যে!' বললে শর্মা।

'আমি শনিবার আপনার ওখানে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সার', সে বললে।

'কিন্তু শনিবার তো আমি শহরেই ছিলুম না!' বললে শর্মা।

'আমি, সার, সকালবেলায় এসেছিলাম। আপনি একটা ছাতা সারাবার চেষ্টা করছিলেন।'

'ও, আপনিই তাহ'লে সে-ই ? আপনি তো বেলায়ুদম, তা-ই না ?'

'না, সার, কাদের, "শের" কাদের।'

'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, সার, বেল্লাই আমাকে আপনার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে বলেছিলো।'

'বেল্লাই আবার কে ?'

'বেল্লাই, সার। এজেন্ট বেল্লাই।'

শর্মা এতক্ষণে আস্তে-আস্তে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারলে। বেল্লাই হ'লো আমাদের স্টুডিওর আড়কাঠি: ভিড়ের দৃশ্যে যত লোক চাই, শয়ে-শয়ে স্ত্রী-পুরুষ জোগাড় ক'রে আনার ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করা যায়। ভিড়ের

দৃশ্যে তাদের কারুরই কোনো অভিনয় করার দরকার হয় না। দুপুরের খাওয়া আর দিনে দু-টাকার বদলে একটা ভিড় বানিয়ে তুললেই চলে। এই দু-টাকা ফি থেকেও বেল্লাই তাদের সকলের কাছ থেকে একটাকা ক'রে নেয়।

'কিন্তু আমরা তো কোনো ভিড়ের দৃশ্য তুলছি না।' বললে শর্মা।

'সে জানি, সার। বেল্লাই বলেছে আমাকে মুখোমুখি দেখলে আপনি হয়তো আমাকে একটা পার্ট দেবেন।'

'কে বলেছে?'

'ও-ই, সার, ঐ বেল্লাই।'

শর্মা আমাদের দিকে তাকালে। আমরা ফিরে তাকালুম লোকটার দিকে। মানুষটা বেঁটেখাটো। এককালে হয়তো শক্তপোক্ত হট্টকট্টা ছিলো. এখন তার চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়েছে কাঁধের হাড়, কণ্ঠা। তার চোয়ালও উগ্রভাবে ফুটে বেরিয়েছে, মুখে কেমন একটা কালো ছায়া, আর তাইতে তার ভাঙা স্বাস্থ্যের ঘা-দশা আরো দগদগে হ'য়ে ফুটে উঠেছে। বেল্লাই যত লোককেই জোটায়, তাদের প্রায় সকলেই এইরকম শুকনো, চিমশে দেখতে। এমনকী ছবিটা যদি রামরাজ্য নিয়েও হয়, সেই ভাবী পৃথিবীর লোকজনও প্রায় এইরকমই দেখতে হয়।

'আমি বেল্লাইর মারফৎ খবর পাঠাবো,' শর্মা বললে। আমরা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলুম। যাক, ইণ্টারভিউটা শেষ হ'য়ে গেছে।

'তাই হবে সার,' লোকটা বললে, তারপর স্বর নামিয়ে নিয়ে যোগ করলে, 'আপনি যদি, সার, আমার জন্যে তাড়াতাড়ি কিছু পান তাহ'লে ভালো হয়।'

'এখন তো ফ্লোরে কোনো ছবিই নেই। তাছাড়া বেশির ভাগ ভিড়ের দৃশ্যই তো একেবারে শেষে নেয়া হয়।'

'আমি জানি, সার। আমাকে একটা ভূমিকা দিয়ে দেখুন-না, সার।'

'আমি তোমাকে কী ভূমিকা দেবো, বলো তো? ওই যে ওঁকে দেখছো ওখানে, উনিই কাস্টিং ঠিক করেন। যাবার আগে ওঁর কাছে সব খবর দিয়ে যেয়ো।'

কাস্টিং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হচ্ছি আমি। এ-লোকটার মতো হাজার লোকের নাম-ধাম, বয়েস, উচ্চতা, ঠিকানা আমি টুকে নিয়েছি। দরকারের সময় যখন চারজন লোকের কাছে চিঠি পাঠানো যায়, তিনটে চিঠিই নির্ঘাৎ ফিরে আসে আমাদের কাছে, খাম না-খোলাই। ওপরে লেখা থাকে: অ্যাড্রেসি নট ফাউণ্ড। তারপরেই বেল্লাই পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

কিন্তু লোকটা আমার দিকে একবার তাকালোও না। সে ঠিক জানে যে,

ঘরের মধ্যে আমরা যে-তিনজন আছি, তার মধ্যে মিস্টার শর্মাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

'সার, শুধু আপনিই কিছু করতে পারেন, সার।'

'সাঁতার জানো?' শর্মা জিগেশ করলে।

'সাঁতার?' উত্তরে সে বললে, একটু পরে, 'একটু-একটু জানি, সার।'

'একটু জানলে চলবে না। একটা দৃশ্যে হয়তো এমন-একজন লোকের দরকার হবে, যে উঁচু থেকে একটা ঝিলের ওপর লাফ দিয়ে পড়বে, তারপর সাঁৎরে পাড়ে চ'লে যাবে। তোমাকে তো সেই দৃশ্যে নেয়া যাবে না।'

'আমি ট্যাগার-ফাইটিং জানি, সার। সেই থেকেই তো আমার নাম হয়েছে "ট্যাগার-ফাইট কাদের"।'

'তার মানে? "ট্যাগার-ফাইট" কাকে বলে?'

'ট্যাগার-ফাইট, সার ট্যাগার, ট্যাগার, বুঝলেন?'

আমরা খুবই মন দিয়ে শুনছিলাম, কিন্তু সে যে কী বলতে চাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শেষটায় সে বললে, 'বাঘ, হুজুর, বাঘ, বাঘ···'

'ওঃ, তুমি বাঘের লড়াইয়ের কথা বলছো? বাঘের সঙ্গে লড়াই? তুমি বাঘের সঙ্গে লড়তে পারো?'

'না, সার। আমি নিজেই বাঘের সাজ প'রে বাঘ হ'য়ে যাই, বাঘের মতো নাচি। বাঘের লড়াই বলতে তা-ই তো বোঝায়, সার, তাই না?'

'ওঃ, বাঘের সাজ প'রে বাঘের অভিনয় করো তুমি? কিন্তু সিনেমার জন্য তো আমরা ও-রকম পোশাক-পরা সাজা বাঘ চাই না! বাঘের সাজ! আচ্ছা, ঠিক আছে, বেল্লাই বরং এখানে খবর দেবে। যদি কোনো সুযোগ হয়, তবে আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

'আমি দারুণ বাঘের লড়াই করতে পারি, সার, একেবারে সত্যিকারের বাঘের মতো দেখতে হয়।'

'না, না, শোনো। সত্যিকারের বাঘ দরকার হ'লে তো আমরা সত্যিকার বাঘই জোগাড় ক'রে নেবো, তা-ই না?'

'না, সার। আমিই সত্যিকারের বাঘ হ'য়ে উঠতে পারি। হুবহু। আপনি একবার দেখবেন, সার, আমি কেমন করি?'

'আরে না-না। এখন না।'

'একবার দেখুনই-না, সার। এই যে এতজন ভদ্রলোক এখানে আছেন,

এঁরা কোত্থেকে বাঘের লড়াই দেখবেন!'

'দেখবে না কেন? কত লোকই তো পরবের সময় মিছিলে বাঘের সাজ প'রে খেলা দেখায়।'

'কিন্তু আমি একটু অন্যরকমভাবে করি, স্যার। একেবারে ঠিক-ঠিক বাঘের মতো হবে দেখতে। হুবহু শেরের বাচ্চা যেন!'

কোত্থেকে সে একটা বাঘের মাথা বার ক'রে আনলে। এবার খেয়াল ক'রে দেখলাম তার সঙ্গে একটা কাপড়ের ঝোলা ছিলো। ব্যাঘ্রমুণ্ডটি একটি মুখোশের মতো, বাইরের চামড়াটা বাঘেরই চামড়া। মুহূর্তের মধ্যে সে সেটা মাথায় এঁটে দিয়ে চিবুকের তলায় ফিতে বেঁধে দিলে। অথচ যখন মুখোশের ফোকরের মধ্য দিয়ে তার চোখ আমাদের দিকে তাকালে, তাকে দেখতে হ'লো একটা চিতাবাঘের মতো। সে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ঘরের ওপর।

'বাঃ, শাবাশ!' বললে শর্মা। আমাদের সকলেরই নজর তখন তার ওপর।

হাত তুললো সে একবার, আর তক্ষুনি তার সারা শরীরটাই কেমন যেন শিথিল হ'য়ে এলো। পরমুহূর্তে সে ব'সে পড়লো হামাগুড়ি দিয়ে, তারপর মাথাটা তুলে অনায়াসেই এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে দেখতে লাগলো।

'ভালো তো! চমৎকার!' শর্মা আবার বললে।

বেড়ালের মতোই লোকটা তার পিঠটা ফুলিয়ে তুললো, চিতার মতো শ্রী দেখা গেলো শরীরে, তেমনি বাঁকিয়ে তুললো, টান-টান। তারপর সে মুখ খুললো, হা ক'রে। আমরা সবাই বেজায় ঘাবড়ে গেলাম! এত কাছে থেকে আমরা কখনোই কোনো বাঘের এমন রক্ত জমাট-করা গর্জন শুনিনি।

আরো-একবার সে গর্জন করলে বাঘের মতো, শুধু তার শরীরের পেছন-দিকটাই কাঁপছে। পরক্ষণেই সে তার 'চারটে থাবা' গুটিয়ে এনে ক্ষিপ্রভাবে লাফিয়ে উঠলো একটা ফাঁকা চেয়ারে, তারপর বসলো গুটিশুটি মেরে, শরীরটা যেন গুটিয়ে সে ছোটো ক'রে ফেলেছে। তার পায়ের নড়াচড়ায় চেয়ারটা দোল খেতে লাগলো, বাম থেকে ডান দিকে। 'আরে ব্বাস!' আমি ব'লে উঠলাম।

আচমকা সে আমার দিকে ঘুরে গেলো, তারপর আমার দিকে তাক ক'রে এক লাফে আমার টেবিলে এসে নামলো। চোখের পাতা ফেলবার আগেই সেখান থেকে আর-এক লাফে গিয়ে নামলো শর্মার টেবিলে। কাগজপত্তর, বই পুঁথি খাতা, এক প্যাকেট পান শর্মার টেবিলে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো। বাঘের পা কিন্তু অদ্ভুত কৌশলে সব কিছুকেই এড়িয়ে গেছে, একটাকেও ছোঁয়নি। শর্মার টেবিলে

উবু হ'য়ে ব'সে বাঘ এবার পেছনটা গুটিয়ে আবার ছোটো হ'য়ে গেলো, আর আড়-চোখে শর্মার দিকে তাকাতে লাগলো। শর্মার দিকে তাকিয়ে সে গরগর করলে জোরে, বিশাল একটা হাঁ করলে, তারপর হিংস্র রাগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ফের গর্জন ক'রে উঠলো যতক্ষণ-না আমাদের স্নায়ুগুলো সব থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। আর সেখান থেকে, সে যেন শূন্যেই ছিটকে এলো উড়ে। আর আমরা সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলাম, 'ওঃ!'

বাড়িটা পুরোনো। মাটি থেকে প্রায় দশ ফিট উঁচু, তার চার দেয়ালের সব ক-টাতেই দু-ইঞ্চি ক'রে বেড় আছে, কার্নিশের মতো খাঁজ। একদিকে, এই বেড়-এর একটু ওপরে, একটা ছোটো জানলা, তাতে আড়াআড়ি একটা শিক গেছে, এ-ঘুলঘুলিটা দিয়েই ঘরে আলো-হাওয়া আসে। এর মধ্যে যে কতরাজ্যের ধুলো-বালি জমেছে তার ঠিক নেই।

একটা পুরো প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়েও উঁচু একটা লাফ দিয়ে সে ঐ দু-ইঞ্চি চওড়া কিনারটা ধ'রে ঝুলে রইলো একটুক্ষণ, তারপর ঘুলঘুলির শিকটা আঁকড়ে ধরতে থাবা বাড়ালো, ঘরটা আবার বাঘের হিংস্র গর্জনে গমগম ক'রে উঠলো।

'সাবধান! সাবধান!' শর্মা চেঁচিয়ে উঠলো। বাঘ যেখান থেকে ঝুলছে তার একটু ওপরেই একটা সিলিং ফ্যান ভয়াবহভাবে ঘুরছে, ঠিক তার মুখের ওপরেই। ফ্যানের ব্লেড আর তার মধ্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান।

ঐ উঁচু থেকেই সে আবার একটা চেয়ারে লাফিয়ে নামলে, তারপরেই ওৎ পেতে ব'সে হঠাৎ আবার লাফ দিলে একটা, এবার ঘরের মেঝেয়।

আমরা আঁৎকে কেমন অভিভূতের মতো বসেছিলাম। বাঘের চোখ দুটি ভয়ানক ঝকঝক করছে। আবারও বিশাল হাঁ ক'রে প্রকাণ্ড একটা গর্জন করলে সে, আমাদের বুকগুলো ধুক ক'রে লাফিয়ে উঠলো। পরের মুহূর্তেই তার শরীর কেমন যেন অবশ হ'য়ে গিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়লো। তারপর নিজেকে টান ক'রে সে উঠে দাঁড়ালে।

শাবাশ দেবার মতো আওয়াজও আর করতে পারছিলো না শর্মা। লোকটা তার বাঘের মুখোশটা খুলে ফেললে।

আমরা তখনও ভেতরে-ভেতরে কাঁপছি, কারু মুখে কোনো সাড়া নেই। সে-ই বরং সকলের আগে তার সাড়া ফিরে পেলে।

'আমি তোমার জন্য খুবই চেষ্টা করবো,' শর্মার গলার স্বর একেবারে বদলে গিয়েছে। লোকটা দু-হাত জোড় ক'রে বললে, 'নমস্তে।'

'তুমি থাকো কোথায় ?' শর্মা শুধোলে।

'মিরসাহেব পেট্রাইতে,' সে বললে, একটা গলির নাম ও বাড়ির নম্বরও জুড়ে দিলে তারপর। আমি তা টুকে নিলুম। তো-তো ক'রে সে বললে, 'কিন্তু ক-দিন যে আর ওখানে থাকতে পারবো, জানি না।'

'কেন ?' শর্মা জিগেশ করলে।

'সার'···সে কী-একটা বলতে শুরু করলে, কিন্তু কথাটা শেষ না-ক'রেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শর্মার পা জড়িয়ে ধরলে।

শর্মা খুবই উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। 'ওঠো, কাদের, ওঠো।' কেন জানি না আমরাও সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে তার চোখ মুছলো। বললে, 'আমার বিবি বলেছে এই কালা মুখ তাকে যেন আর না-দেখাই।' এই লোকটা কয়েক মুহূর্ত আগেও এই ঘরে একটা বাঘ ছিলো, তেজি একটা শেরের বাচ্চা, বড়ো হচ্ছিলো, লাফিয়ে পড়ছিলো, গর্জন করছিলো···সে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'সে যে কত মাস হ'য়ে গেলো এক পয়সাও কামাই নেই, রোজগার নেই। বিবিই বা কী করবে! এদিকে চার-চারটে কাচ্চাবাচ্চা, সবাই এত ছোটো··· এত ছোটো···'

শর্মা হঠাৎ তাকে জিগেশ করলে, 'আজ কিছু খেয়েছো তুমি ?'

'না, সার।' সেদিন তো নয়ই, কাল বা গত পরশুও···তাকে খুঁটিনাটিগুলো জিগেশ করারই কোনো মানে হয় না।

শর্মা তার পকেটে হাত ঢোকালে। আমরাও আমাদের পকেট হাৎড়ালাম। সব খুচরো পয়সা জড়ো ক'রে তুললে দুটো টাকা পাওয়া গেলো। 'যাও, এ-টাকা দিয়ে প্রথমে ক্যানটিনে গিয়ে ভালো ক'রে খেয়ে নাও!'

'ওঃ, না, সার,' সে মাথা নাড়লে।

শর্মা বললে, 'না কেন ? তোমার ভালো ক'রে খাওয়া উচিত।'

'দয়া ক'রে, সার, একটা পার্ট দিন, যে-কোনো একটা ভূমিকা,' কাঁদতে-কাঁদতে সে বললে অনুনয় ক'রে।

শর্মাকে ওভাবে ফেটে পড়তে আমি কখনো দেখিনি। 'তোমাকে টাকা জোগাড় ক'রে দেবার পর তুমি তা ফিরিয়ে দাও কী ক'রে, অ্যাঁ ? টাকা কি গাছ থেকে পড়ে ব'লে তুমি ভেবেছো ? এ হয়তো খুবই অল্প টাকা, কিন্তু টাকা তো! তার মানেই স্বয়ং লক্ষ্মী। এটা না-নেয়াটাই অমঙ্গল। তোমার কি ধারণা লক্ষ্মী তাহ'লে তোমার কাছে কখনো আসতে চাইবেন ? যাও, এই টাকা নিয়ে

গিয়ে চটপট কিছু খেয়ে নাও।' শর্মার গলার স্বর চড়ছিলো।

সে কান্না থামিয়ে হাত-পেতে টাকাটা নিলে। এবার একটু নরম সুরে শর্মা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে : 'কাকে কোন্ ভূমিকা দেয়া হবে, সেটা ঠিক করার দায়িত্ব আমার নয়। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। যাও, এবার গিয়ে কিছু খেয়ে নাও।' তারপর আমার দিকে ফিরে শর্মা বললে, 'ওকে ক্যানটিনে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিন তো।'

'না, সার, তার দরকার হবে না। আমি নিজেই গিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। নিজেই যাচ্ছি,' এই ব'লে আবার হাত জোড় ক'রে আমাদের 'নমস্তে' জানিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

কেউ কিছুক্ষণ কিছু বললে না। শেষে শর্মা যখন কথা বললে, মনে হ'লো নিজের সঙ্গেই সে কথা বলছে : 'এর জন্যে কী করা যায় তাহ'লে? যে-ছবিটা তোলা হচ্ছে সেটা তো সেকেলে ধাঁচের, রাজারানীর গল্প।'

কিন্তু শর্মা তার কথা রেখেছিলো। কয়েক হপ্তা বাদে যখন কাহিনী দপ্তর আর চিত্রনাট্য বিভাগ সভা করলে, শর্মা সরকারিভাবে কতগুলো দৃশ্যের অনুমতি নিলে। নায়ক দেয়াল টপকে ঢুকবে শত্রুপক্ষের কেল্লায়, একটা বাঘের ছদ্মবেশে। কাদের নায়কের ডাবল হ'য়ে কাজ করবে। অন্তত শ-খানেক টাকা সে পাবেই।

আমি ভূমিকাটার কথা উল্লেখ ক'রে কাদেরকে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। যথারীতি চিঠিটা ফিরে এলো : 'প্রাপককে পাওয়া যায়নি।'

শর্মা বেল্লাইকে সঙ্গে নিয়ে তন্নতন্ন ক'রে পুরো এলাকাটা খুঁজলো। আমরাও খুঁজতে বেরুলাম, নানা জায়গায় খোঁজ নিলাম। এদিকে শুটিঙের দিন এগিয়ে আসছে—সেই যে-দৃশ্যে নায়ক বাঘের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াবে। আস্তে, চুপিসাড়ে বাঘ চলেছে, গুঁড়িমেরে লাফিয়ে টপকে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের দুর্গের দেয়াল। সত্যিকার এক শের, সত্যিকার বাঘ। কাদের।

কাদের যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে—কোথাও তার কোনো পাত্তা নেই।

অবশ্য সে এলেও খুব-একটা কাজ হ'তো না। সে-মাসেই আরেকটা ছবি দেখানো শুরু হয়েছিলো, যাতে গাঁয়ের দৃশ্যে নায়ক কাঁধে কলস নিয়ে যেতে-যেতে লোকসংগীত গেয়েছিলো। সে-ছবি তামিলনাড়ুর সর্বত্র হৈ-হৈ ক'রে দেখেছে লোকে।

স্টুডিও দপ্তর ঠিক করেছে আমাদের ছবিতে নায়ক কাঁধে একটা কলস নিয়ে গান গাইবে।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাজি মর্দ

গুলাম আব্বাস

যখনই রাত্তিরে মহল্লার কোনো কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠে অথবা কোনো মোরগ আচমকা কোঁকর-কো হাঁক পাড়ে, চিরাগবিবির পাৎলা ঘুমটা দুম ক'রে ভেঙে যায়। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে, তার ছোট্ট ঘরটায় হালকা পায়ে ঘুরে বেড়ায়, পা টিপে-টিপে দেয়াল ধ'রে-ধ'রে চ'লে আসে দাওয়ায়, তার স্বামীর খাটিয়াটার পাশে। টু শব্দটি না-ক'রে আলগোছে সন্তর্পণে ব'সে প'ড়ে সে আলিয়ার পা টিপে দিতে থাকে : যতক্ষণ-না তার আবার ঢুলুনি আসে আঙুল-গুলো একটানা না-থেমে কাজ ক'রেই চলে। আলিয়া তার হাতের উষ্ণ নরম স্পর্শে এতটাই অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে যে এই ছোট্ট নড়াচড়ায় তার ঘুম তো ভাঙেই না, বরং সারাদিনের খাটুনির পর এই পা টিপে দেয়ায় তার এতটাই আরাম লাগে যে, সে আরো গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, অবশ্য মাঝে-মাঝে সেও জেগে থাকে, আর তখন সে তার ঢাকার তলায় তার শ্বাস চেপে রাখে, ঢাকাটা নেহাৎই তার লুঙ্গি, মশার কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে লুঙ্গিটা রাত্তিরে তার গা-মাথা ঢেকে টেনে নেয়, কিন্তু লুঙ্গিটা কিছুতেই তার সারা গা ঢাকে না। মাথা যদি ঢাকা থাকে, তবে তার পা দুটি বেরিয়ে থাকে উদ্‌লা।

আলিয়া যখন সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠে, চিরাগবিবি তার কত আগেই উঠে পড়েছে। আলিয়া শুনতে পায় চিরাগবিবি উঠোনে, কিংবা তার ছোট্ট ঘরটায়, ফজিরের নামাজ পড়ছে। চিরাগবিবি নামাজই পড়ুক বা জপই করুক, সবসময়ে গুনগুন করে আওয়াজ ক'রে, শুধু শেষ কথাগুলোই শোনা যায় স্পষ্ট।

'ইয়া খোদা! লাইল্লাহা ইল্লালাহা! সবসময়েই এই অন্ধ আতুর বেচারা মেয়েছেলেটার মালিককে রক্ষা কোরো, খোদা মেহেরবান। রসুলের দোহাই, তার সব দুশমনকে বরবাদ কোরো! ইয়া খোদা! তার আগে যেন আমার মরণ হয়, সে যেন আমার পরে মরে—আমি শুধু এই দোয়াই জপ করি।'

আলিয়া তার খাটিয়া থেকে উঠে পড়ে। লুঙ্গিটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে কোমরে বাঁধে। তার উঠে পড়ার আওয়াজ শুনে চিরাগবিবি তখুনি তার ঘর

থেকে বেরিয়ে আসে, আর খুব নরম দীন গলায় বশম্বদভাবে তাকে জিগেশ করে : 'ডাকছিলে ?'

মাঝে-মাঝে আলিয়া কাছাকাছি হাজির থাকলেও চিরাগবিবি মনে-মনে ভেবে নেয় সে যেন কাছে নেই, আর আপন মনেই আওড়ায় : 'ও আমায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে পাপ করেছিলো। আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলই ওকে ইনাম দেবেন। আমি আর কোন ছার, নেহাৎই অন্ধ আতুর মেয়েছেলে! আমি ওকে আর কী এমন দিতে পারি ? আমি আগুন জ্বালাতে পারি না, উনোন ধরাতে পারি না, ঘরে-বাইরে কোনো কাজেই আমি লাগি না। আমি শুধু তার পা টিপে দিতে পারি। তবে, তাতে আর কী ফায়দা হবে ?'

চিরাগবিবি গাঁয়ের মসজিদের আগেকার ইমামের লেড়কি। কচি বয়সেই বেচারা তার আম্মাজানকে হারায়। ইমাম নিজে মোটেই অন্ধ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর লেড়কির আঁখ দুটি নিকাল গেছে গুটি বসন্তে। ইমাম ভারি যত্নআত্তি ক'রে এই মা-মরা মেয়েটিকে মানুষ করেছেন। গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সকলেই তাঁকে দারুণ রেয়াৎ শ্রদ্ধা করতো, কারণ গাঁয়ের ছেলেছোকরারাই শুধু নয়, তার বাপ-দাদা-চাচারাও তাঁর কাছে অন্তত 'রোগদাদি কিতাব' পড়তে শিখেছে। যখন বুড়ো ইমামের ইন্তেকাল ঘনিয়ে এলো, গাঁয়ের সব মুরুব্বিদের ডেকে নিয়ে তিনি খুব নরমভাবে দীন স্বরে বলেছিলেন :

'আমি তো এই মা-মরা মেয়েটিকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। মেয়ে অ্যাদ্দিনে ডাগর হয়েছে। শাদির বয়েস হ'য়ে গিয়েছে তার, অথচ তবু তার বিয়েশাদির কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। বেচারা যদি বিয়েশাদি ছাড়াই এমনি আলাভোলা থেকে যায় তবে আমার আত্মা কক্‌খনো কোথাও কোনো শান্তি পাবে না। সারা জীবন ধ'রে আমি তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য পালন ক'রে গিয়েছি—তা সে ভালো-মন্দ যাই হোক-না কেন। এই লেড়কির জন্যে তোমরা যদি একটা বর দেখে দাও, তবে শুধু-যে আমার আত্মাই পরলোকে শান্তি পাবে তা নয়, তোমরাও এই দোয়ার জন্যে ইনাম পাবে—শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকেও।'

এই ব'লে ইমাম মারা গিয়েছিলেন। গোর দেয়া হ'য়ে গেলে, মুরুব্বিরা সবাই পঞ্চায়েতের কাছে প্রস্তাবটা পেশ করেছিলো, তবে আর্জিটা প্রধানত ছিলো গাঁয়ের ছোকরাগুলোর কাছে। 'তোমাদের মধ্যে কে এমন গাজি মর্দ আছে যে খোদার মর্জিমাফিক কাজ ক'রে ইমাম সাহেবের দোয়ার প্রতিদান দেবে ?'

পুরো মজলিশটা চুপ ক'রে গিয়েছিলো। তারপর এক ছোকরার দাঁতে দাঁ

লাগলো। এক গরিব জমিনদারের সে লেড়কা, কিন্তু ফুর্তিতে-উৎসাহে সে সবসময় টগবগ ক'রে ফুটছে; সব কাজেই সে অন্য ছেলেছোকরাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে। এগিয়ে এসে এবারও সে এই বেদম তারিফ করার কাজে নিজেকে পেশ করেছিলো। সে-ই হ'লো আলিয়া।

বিয়েশাদি দেবার মতো ডাগরডোগর সব মেয়ের বাপেরা অনেকেই মনে-মনে আলিয়াকে সম্ভাব্য জামাই ব'লে ভেবে রেখেছিলো—তারা সবাই কেমন হতাশ হ'য়ে গেলো। মুরুব্বিরাও সবাই কেমন চুপ মেরে গিয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো গাঁয়ের ছোকরাগুলোর মধ্যে হাবাগোবা না-লায়েক কাউকে বলি হিশেবে পাওয়া যাবে—এমন-কোনো শাদাশিধে ছোকরা গাঁয়ে যার কোনো গুরুত্বই নেই, নেহাৎই তুচ্ছ কেউ, আলিয়ার কথা কারু মাথায় আসেনি—তার সব গুণপনা তাকে গাঁয়ের বাছাই যুবক ক'রে তুলেছিলো।

তো, এইভাবেই চিরাগবিবি এসেছিলো আলিয়ার কুঠিতে।

বাপের একটুকরো ছোট্ট জমি পেয়েছিলো আলিয়া। বেজায় খাটাখাটুনি ক'রে সেই জমিটুকু সে চাষ করে, যেটুকু ফসল ফলে, সে আর তার বিবি তার ওপরই নির্ভর ক'রে দিন গুজরান করে। বিবির কোনো খাইখরচা নেই, নতুন-নতুন গয়নাগাটির বায়নাক্কা নেই তার, নতুন জেল্লাদার পোশাকেরও কোনো আব্দার নেই। সে বড়ো হয়েছে মসজিদের মধ্যকারই ছোট্ট একটা ঘরে, বাচ্চা বয়েস থেকেই পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে অভ্যস্ত। যখন সে এইটুকু এক বাচ্চা মেয়ে, শুনে-শুনেই সে জপ করতে শিখেছিলো। শিখেছিলো রমজানের মাসে তিরিশ দিন রোজা রাখতে। অন্ধ ব'লে আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের নাম জপ করা ছাড়া তার আর-কোনো কাজই ছিলো না। আব্বাজানের কাছে সে অনেক রকম প্রার্থনা করতে শিখেছিলো, কোরানের বিস্তর সুরাও সে শুনে-শুনে মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলো। আলিয়ার কুঠিতে এসেও তার ভক্তিশ্রদ্ধা এককোঁটাও কমেনি, বরং অনেকগুণ বেড়েই গিয়েছে। তার ছোট্ট ঘরটায় জায়নামাজ বেছানো থাকে আট ঘণ্টা, তসবী হাতে জপ করা ছাড়াও হররোজ সে তাতে ব'সে নামাজ পড়ে। তার ঘর থেকে ভুরভুর ক'রে বেরোয় চন্দন আর ধূপের গন্ধ, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটানা গুঞ্জন: 'ইয়া খোদা! ইয়া আল্লাহ্! ইয়া মেহেরবান!…' ক্রমেই সুর চড়তে থাকে। মাঝে-মাঝে বাড়ি ফিরে এসে আলিয়ার মনে হয় সে বুঝি ভুল ক'রে কোনো পীরফকিরের দরগাতেই এসে পড়েছে। চিরাগবিবির জপতপ নামাজকে সে বেশ রেয়াৎই করে, তবে নিজে সে এইসব রোজানামাজের কোনো দাম আছে

ব'লে বিশ্বাস করে না। নিজেকে সে এই ব'লে সান্ত্বনা দেয় যে এ-রকম কোনো নিষ্পাপ মেয়ের সঙ্গে শাদির নৈতিক দায়িত্ব পালন করাটাও এক অর্থে জপতপ করারই শামিল।

গাঁয়ের এক বিধবার মেয়েকে আলিয়া কিছু গম আর জাবনা দেয়, বাড়ির কাজ করার জন্যে। মেয়েটির নাম রহমতী, সে খানা পাকায় আর টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটে। রহমতীর বয়েস এগারো-বারো, তবে গায়ে-গতরে বেজায় খাটতে পারে। কিন্তু বড্ড ফাজিল আর রংবাজ। সাধারণত সে গোটা দিনটাই চিরাগবিবির সঙ্গে-সঙ্গে কাটায়। বেশ কাটে দুজনের। চিরাগবিবি তাকে আল্লাহ্‌র দোয়া আর পীর রসুলের কথা শোনায়, আর রহমতী তাতে ফোড়ন কাটে রঙ্গরস ক'রে, গাঁয়ের যত কেচ্ছাকেলেঙ্কারির সাতকাহন ফেঁদে। শুধু তার সঙ্গেই চিরাগবিবি তার প্রাণের কথা বলাবলি করে।

'রহমতী, আব্বাজান আমায় বলতেন, "লেড়কি, ভরসা রাখ। আল্লাহ্‌র দোয়ায় তোর জন্যে কোনো খরিদ্দার আসবেই। নিশ্চয় আসবে। তোকে ধুলো থেকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে।"...আব্বাজানের কথাই ঠিক হ'লো। শেষটায় আমার শাহজাদা এসে হাজির।

'রহমতী, আমার শাহজাদা ইউসুফের চাইতেও খুবসুরৎ। তার ধরনধারণ ঠিক কোনো পয়গম্বরের মতো—সত্যিকার গাজি মর্দ, বেশখ, আমার খাতিরেই সে গরিবি মেনে নিয়েছে। গাঁয়ের নম্বরদার তার লেড়কির সঙ্গে তার শাদি দিতে চেয়েছিলো, দেড়শো বিঘে জমি তার নামে লিখে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু নেহাৎই আমার খাতিরে, অন্ধ নাচার পাপী আমি, আমারই জন্যে সে এইসব ধনদৌলত উপেক্ষা করেছে। ধনদৌলত জমিজমা কত আসে, কত যায়। ইন্তে-কাল এলে কেউ আর তার সম্পত্তি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় না—সঙ্গে যায় শুধু দেয়াথোয়া দোয়া-দান।'

রহমতী তা শুনে বলে, 'চিরাগবিবি, আল্লাহ্‌র দোয়া, চৌধুরী আলিয়া জোয়ান মরদ। তোমার নসিব ভালো। কালো সুতো থেকে তার গলায় যে রুপোর মাদুলি ঝোলে, কী সুন্দরই যে দেখায়, তোমায় কী বলবো!'

চিরাগবিবি জবাবে খুশি হ'য়ে বলে, 'সারা গাঁয়ে আর-কেউ আছে এমন শানদার ঘোড়সোয়ার, এমন বাহাদুর কুস্তিগির, এমন আচ্ছি কবাডি খেলনেদার? ফসল কাটার সময় তার হাত এমনই চটপট চলে যেন পানির মধ্যে মছলি। ফসল তোলার সময় সে একাই চার মরদের কাজ হাঁসিল করে। তার রেশমি

বাল কোঁকড়া, শরীর মজবুত, এলেমদার। তার পা টিপে দিতে আমার কী যে ভালো লাগে!'

এ-রকম কথাবার্তা সবচেয়ে ভালো জমে যখন রহমতী উঠোনে চৌকিতে ব'সে চাপাটি বানায় আর চিরাগবিবি আরেকটা চৌকিতে তার পাশে ব'সে থাকে। চিরাগবিবি যখন আলিয়ার দেখনশাহ্ গুণপনা বিশদ ক'রে শোনায়, রহমতী সব খুশি হয়ে শোনে। 'সত্যি, চিরাগবিবি?'

চিরাগবিবি যখন কথা ব'লে-ব'লে হয়রান হ'য়ে যায়, তখনই রহমতী তার ফোড়ন কাটতে শুরু করে। 'শুনেছো, বিবি, আজ রসুলানের এক লেড়কি হয়েছে। এইটুকুনি, পুঁচকে, একরত্তি—যেন এক ইঁদুরছানা। শুনেছো, নম্বরদার তার লেড়কির শাদির জোগাড়যন্তর করছে। ওরা বলছিলো, শহর থেকে রওশনচৌকি আসবে, নহবৎ বসবে! শুনেছো, কাল রাত্তিরে মিঠুয়ার দোকান থেকে পাঁচ সের তামাক হাপিশ হ'য়ে গিয়েছে।'

একদিন রহমতী হন্তদন্ত হয়ে হাজির। উত্তেজনায় সে টগবগ ক'রে ফুটছে। আলিয়া কাজ করতে খেতে চ'লে যেতেই সে ফেটে পড়ে।

'শুনেছো, চিরাগবিবি, পাশের গাঁ, ধুপচরিতে, জমিনদার উমরু ফের শাদি ক'রে বসেছে। বেশরম বদমায়েশটার বয়েস হবে ষাট, আর নয়াবিবির উমর সবে সতেরো। গাঁ শুদ্ধু লোক তার নামে ছি-ছি করছে, গালমন্দ করছে, কিন্তু সে তার তোয়াক্কা করলে তো! তাদের আরো চটিয়ে দেবার জন্যে সে নয়া বিবির বোরখা খুলে মুখ দেখিয়েছে, পর্দা মানেনি, আরো-সব কত-কী তাজ্জব কাজকারবার করেছে! শুনেছি দু-দুটো ধবধবে শাদা ঘোড়া কিনেছে। একটা তার নিজের জন্যে, দুসরা তার বিবির জন্যে। রোজ ভোরে দুটিতে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে বেরোয়। বুড়োর হাতে যদি জরুরি কাজ থাকে তো গুলনার বিবিকে একা-একাই ঘুরতে পাঠায়। কাল এই গুলনার ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের গাঁ অব্দি এসেছিলো, গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে যেচে-যেচে কথা বলেছে, কী আজাদী! কতগুলো ছোকরা তার ঘোড়ার পেছন নিয়েছিলো। সবাই তাজ্জব হ'য়ে তার কাজ-কারবার দেখেছে। কী টকটকে ফর্শা গায়ের রং, ঠিক যেন মেমসাহেব, আর সোনালি চুল! সবাই বলছিলো ঠিক হুরি-পরির মতো খুবসুরৎ। রেশমি সালোয়ার কামিজ পরেছিলো, গায়ে মস্ত সব ফুলকারির গোলাপ বসানো, পায়ে ছিলো জরির চপ্পল। রুপোলি জরির আঁচল বসানো দুপাট্টা বাঁধা ছিলো বুকে। এমনই তার ঘোড়া ছোটাবার ভাবগতিক যেন সে কোনো বেগমসাহেবা।

সটান আমাদের খেতির মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলো। চিরাগবিবি, চৌধুরী আলিয়া শুধু যে তাকে চোখেই দেখেছে তা নয়, তার সঙ্গে কথাও বলেছে! বোধ হয় শুলনার বিবি তাকে দেখে তার কাছে রাস্তার হদিশ জানতে চাচ্ছিলো।'

'কী বললি? চৌধুরী তাকে চোখে দেখেছে? তার সঙ্গে কথা বলেছে?'

'জি, চিরাগবিবি!'

'আমার শাহজাদা?'

'জি, আলিয়া চৌধুরী।'

'দোহাই তোর, আর কিছু বলিসনে। আমার মগজে ভারি কষ্ট হচ্ছে। আমি অন্দর যাচ্ছি।' চিরাগবিবি তার চৌকি থেকে উঠে তার ছোট্ট ঘরটায় চ'লে গেলো। রহমতীর সঙ্গে চিরাগবিবি সেদিন আর একটাও কথা বলেনি।

সন্ধেবেলায় আলিয়া তার খেতের কাজ সেরে রোজকার মতো বাড়ি ফিরলো। বাড়ির মধ্যে সাধারণত সে চুপচাপই থাকে, কিন্তু এদিন সন্ধ্যায় সে অন্য দিনের মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরঘুরও করলো না, চুপচাপ ব'সে রইলো তার খাটিয়ায়, চুপচাপ খানা খেলো, তারপর গড়গড়ায় তামাক সেজে খানিকক্ষণ ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানলো। চিরাগবিবিও চুপচাপ ব'সে রইলো; তারপর আলিয়া যখন শোবার তোড়জোড় করলে, লুঙ্গিটা টেনে চাদরের মতো গায়ে বিছিয়ে দিলে, চিরাগবিবি রোজকার মতো তার কাছে ব'সে পা টিপে দিতে শুরু করলো। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট যেতে-না-যেতেই আলিয়া বললে, 'এবার থামো চিরাগ, আমার নিদ পাচ্ছে।'

আলিয়ার ব্যবহারে চিরাগবিবির দিল যেন দু-টুকরো হ'য়ে গেলো। হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে চুপচাপ নিজের ঘরে চ'লে গেলো।

শিগগিরই, 'ইয়া খোদা! ইয়া মেহেরবান! দীন দুনিয়ার মালিক! ইয়া আল্লাহ্!' ইত্যাদি শোনা যেতে লাগলো তার ঘর থেকে। এই জপ চললো ঘণ্টাখানিক। তারপর চিরাগরিবি আস্তে চুপিসাড়ে আলিয়ার খাটিয়ার কাছে চ'লে এলো, আস্তে স্নেহভরে তার পা দুটো ছুঁলো। খাটিয়ার পাশে ব'সে আগেকার মতো পা টিপে দিতে ইচ্ছে করছিলো তার, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠলো না, পা টিপে-টিপে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো আবার।

ফের তার ঘর থেকে নরম গুনগুন উঠলো। 'সে আমায় বুকে জড়িয়ে পাপ কাজ করেছে! আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল তাকে দোয়া করবেন। আমি কোন্

ছার ! নেহাৎই অন্ধ বেচারা মেয়েছেলে। খোদাতালা, রসুলের নামে আমার মালিককে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্, তাঁর দুশমনদের সব বরবাদ ক'রে দাও। ইয়া খোদা ! সব গোলপয়জার থেকে তাঁকে বাঁচাও ! ইয়া আল্লাহ্, ইয়া খোদা, ইয়া মেহেরবান ! যে-জেনানা তাকে সুরৎ দেখিয়ে ভোলাতে চাইবে, তাকে খতম করো। ইয়া খোদা, ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রসুল ! আমার আর্জি যেন মঞ্জুর হয় ! ইয়া আল্লাহ্, তাঁর আগে যেন আমার ইন্তেকাল হয় ! আল্লাহ্‌র দোয়া !'

দু-ঘণ্টা পরে সে আবার দেয়াল হাৎড়ে-হাৎড়ে ঘর থেকে বেরুলো। আলিয়ার পা ছোঁবার পর বেশ স্বস্তি লাগলো তার। অন্তত সে শুয়ে-শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তাকে ছেড়ে চ'লে যায়নি, লুঙ্গি দিয়ে গা ঢেকে রেখেছে। সে তার ঘরে ফিরে গেলো।

আবার যখন চিরাগবিবি তার ঘর থেকে বেরুলো, তখন ফজির হ'তে অল্পই বাকি আছে। ছায়ার মতো চুপিসাড়ে সে আলিয়ার খাটিয়ার কাছে এসে হাজির হ'লো। তার উষ্ণ হাত দুটি আলিয়ার পা দুটিকে ছুঁলো, খাটিয়ার পাশে মাটিতে ব'সে সে আলতো ক'রে চুমু খেলো তার পায়ে। আলিয়া ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলো, ঢাকার তলায় পা দুটি টেনে নিলো।

যখন দিনের আলো ফুটলো, আবার চিরাগবিবির ঘর থেকে বিড়বিড় কথা ভেসে এলো। গলায় এখন বেদম উত্তেজনা, স্বর উঠেছে রোজকার চেয়ে বেশি।

'এক অন্ধ পাপী মেয়েছেলের খাতিরে সে গরিবি বেছে নিয়েছে। সে আমায় জড়িয়ে ধরেছে বুকে, পাপের ঘোরে। আমার শাহজাদা ইউসুফের চেয়েও সুন্দর, তার সম্ভ্রমবোধ সব কোনো···'

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বলি

অবিনাশ দোলস

আজ পাঁচ দিন হ'লো শয্যাশায়ী মায়ের পাশে একনাগাড়ে ব'সে থেকে-থেকে আমার পিঠে অসহ্য ব্যথা হয়েছে। প্রথম দিনে আমাদের চোখ দিয়ে জল ঝরেছিলো। এখন শুকিয়ে গেছে। মায়ের কষ্ট আর ছটফটানি সত্যিই আমাদের সহ্যের সীমার অতীত। পর-পর পাঁচ দিন ধ'রে ভোর থেকে রাত অব্দি মা-র শেষ মুহূর্তের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। ব্যথা বা আবেগের অতীত এখন আমরা; তাই মা-র যন্ত্রণাকাতর গোঙানি আর আমাদের নাড়া দেয় না। গলা শুকিয়ে গেছে বোঝাতে মাঝে-মাঝে মা জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটে। মুখে জল দিলে একটুমাত্র জল খেতে পারে। মাংসের তালের মতো মেঝেয় প'ড়ে থাকে, অনড়। যে-মেয়ে-পুরুষরা মা-কে দেখছে, পাশে ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কিছু করার নেই তাদের। এই একঘেয়ে কাজে ক্লান্ত হ'য়ে বাহি কুঁড়েঘরের বাইরে ব'সে সময় কাটাচ্ছে বিড়ি মুখে দিয়ে। ইতিমধ্যে গাঁয়ের দু-একজন লোক একটু দেখে যায় অসুস্থ মা-র অবস্থা কী দাঁড়ালো; এই ধারণা নিয়ে ফিরে যায় যে আরো-কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাদের, তার পর যা ঘটবার তাই ঘটবে। আর-কিছু নয়।

সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুমি-ই মা-র বেশি প্রিয়। প্রথম দিন সুমি চীৎকার ক'রে কেঁদেছিলো। সে খায়নি। শপথ করেছিলো, মা না-খেলে সেও খাবার ছোঁবে না। সবই বৃথা; কেউ তাকে খেতে অনুরোধ-উপরোধ করেনি, সে-সব করবার মতো মেজাজও কারু ছিলো না। কেঁদে-কেঁদে শ্রান্ত হ'য়ে সুমি মার পাশে শুয়ে পড়লো। মা-র পায়ের কাছে পেরেক-আঁটা হ'য়ে ব'সে আছে বাবা, ব'সে-ব'সে দেখছে মা-র ছটফটানি আর কাৎরানি। ঘুম পেলে, জেগে-থাকার জন্যে একটা বিড়ি ধরিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কাল রাত্রে আমরা কেউ খাইওনি, ঘুমোইওনি। এখন সবাই অপেক্ষা করছি মা-র শেষ মুহূর্তের জন্যে।

এইসব শারীরিক ক্লান্তি আর মানসিক অবসাদে মা-র পাশে আর ব'সে-থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। মা-র ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে উঠেছে, তার ওপর আধপোড়া দেহের দুর্গন্ধ। বাবার একটা ছেঁড়া ধুতি ছাড়া মা-র আহত

শরীরে কোনো ঢাকা নেই। তার গায়ের চামড়া কোনো আচ্ছাদনের ছোঁয়া সহ্য করতে পারছে না ; এমনকী হালকা একটা কাঁথা বা কম্বল দেবারও উপায় নেই। ঢাকা দিলেই তার সঙ্গে পোড়া মাংসের টুকরো উঠে আসে। খুব আস্তে একটু-একটু পা নাড়ে, মাথা নাড়ে। নইলে মা ম'রেই গেছে।

কেঁচো যেমন কাদায় কুণ্ডলি পাকায়, তেমনি এখন আমাদের নাড়িভুঁড়ি খিদেয় পাক দিচ্ছে। পাঁচ দিন ধ'রে উনুনে আঁচ পড়েনি। তবে প্রতিবেশীরা কয়েক কাপ চা ক'রে দিয়েছিলো। আর কিচ্ছু না। আর-কোনো খাদ্য বা পানীয় না। গত দু-দিন ধ'রে সুমি বাইরে ব'সে আছে আর বাহি বিড়ির ধোঁয়ায় খিদের আগুন চাপা দিতে চেষ্টা করছে। মা-র দেহের দুর্গন্ধ সে আর সইতে পারছে না। আসলে বিড়ি খাওয়ার অজুহাতে সে খোলা বাতাস গিলতে চাইছে। খিদেয় মরছি সকলে।

একবার দেখলাম, মা পা নাড়বার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে দেখি পা-দুটোয় চামড়ার চিহ্ন নেই বললেই চলে। সমস্তটাই আধপোড়া মাংসপিণ্ড, ওপরে মাছি ভনভন করছে। বাবা কাছে এলে আমি পিছিয়ে দাঁড়ালাম। বাবার মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই আমার। দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারছি না, চোখ এত দুর্বল যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। প্রধানত আমার জন্যেই মা আজ মৃত্যুশয্যায়, বিবেকের এই তাড়নায় সর্বদা ভুগছি। পুরোনো ন্যাকড়ার মতো টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাচ্ছে কলজে।

কাকা-কাকিমাকে খবর দিতে পারছি না ব'লে অপরাধী লাগছে। আরো অপরাধ, শান্তাকে কোনো খবর দিতে পারছি না, অথচ মা-র শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। এমনকী গ্রামের কুকুরগুলোও বোবা হ'য়ে গেছে পাঁচদিন আগের সেই ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে। আহত মা-কে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারিনি ব'লে আরো বিবেকযন্ত্রণা হচ্ছে। ঘটনার সময় মা-র অগ্নিদগ্ধ দেহ কুঁড়েঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করা হয়েছিলো। কিন্তু দগ্ধাবশিষ্ট কুঁড়েটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো গ্রামপ্রধান য়েসাজি। গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন-নিবেদন করলাম, পায়ে ধ'রে কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু তারা একবিন্দুও দয়া করলো না। মা-কে পোড়ালো, ঘর পোড়ালো, সব জিনিশপত্র পুড়িয়ে দিলো।

ফলে আমাদের মধ্যে যে-বিদ্রোহ ছিলো, তাও পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো। আমরা রাগে জ্বলছি, কিন্তু আমরা দুর্বল, আনত, অসহায়। আমরা প্রাণহীন কঙ্কাল। প্রতিদিন বেশ কয়েকবার রাজ্য পরিবহণের বাস গ্রামের পাশ দিয়ে যায়। শত

শত গ্রামবাসী যায়-আসে, কিন্তু এই নৃশংস ঘটনার কথা কেউ মুখ ফুটে বলে না। সবাই এই ট্র্যাজেডির সাক্ষী, কিন্তু কেউ সৌজন্যবশত দেখা করতেও আসে না। কেউ এই সত্যি কথাটা প্রকাশ করে না যে মা-কে পোড়ানো হয়েছে, আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে।

একদিন শান্তার কথা ভেবে কছরুবাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরাও-এর কাছে গেলাম। সে গাঁয়ের সর্বেসর্বা, তার মুখ খুব খারাপ। কছরুবাবা তাকে মিনতি ক'রে বললো :

'সরকার, যা হবার হ'য়ে গেছে। শান্তাকে তার মা-র মুখটা শেষবারের মতো দেখতে দাও।'

'কছরিয়া!' কর্তা গ'র্জে ওঠে।

'হ্যাঁ, সরকার,' কছরু বলে।

'তোর বাবাকে কী বলেছিলাম শুনিসনি?'

'শুনেছি তো। কিন্তু, সরকার...'

'একেবারে চুপ। আর একটি কথা নয়।'

'না, সরকার। দয়া ক'রে শান্তাকে তার মা-র সঙ্গে দেখা করতে দিন।'

'না, একদম না। ওরা গু খেয়েছে। আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে হাত দিয়েছে। উচ্ছন্নে যাক।'

'আমি ওদের হ'য়ে মাপ চাইছি, সরকার।'

'তোরা পুলিশ ডাকতে গিয়েছিলি। যাসনি?'

'দয়া ক'রে ও-সব ভুলে যান, সরকার, আমাদের ক্ষমা করুন।'

'কিচ্ছু হবে না। একটা মাহার মাগি মরলে কী এসে যায়?'

এই শুনে মুখ চুন ক'রে বোবা হ'য়ে ফিরে এলাম আমরা।

এদিকে বাড়িতে সবাই অধীর হ'য়ে মা-র শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। সকলেই চায়, মা এবার যাক। এখনও না-মরলে সবাই পাগল হ'য়ে যাবে। কুয়োর কথা অল্প দিনেই লোকে ভুলে যাবে। ও নিয়ে আর বিক্ষোভও থাকবে না। আমার মধ্যে যে-বিদ্রোহী আছে, তার অকালমৃত্যু হবে। পঞ্চায়েতের কুয়ো থেকে জল তোলার আর সেখানে জলের জায়গা তৈরি করার আন্দোলনে মা-ই নেতৃত্ব দিয়েছিলো। বাবা সকলকেই নিরুৎসাহ করে, তখনও কোনো কাজ দেয়নি, আজও দিচ্ছে না। বাবা সকলেরই বন্ধু থাকতে চায়, কখনও আমাদের অভিযোগগুলো জানাতে মুখ খোলে না, আর এইভাবে অন্যায়-অত্যাচারের হাত

এড়িয়ে যায়।

আজও মনে আছে বাবুরাও-এর বিরুদ্ধে আমার লড়াকু মা কেমন লড়েছিলো, ভীতু বাবা যা পারেনি। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে সভাপতি বাবুরাও-এর বিরুদ্ধে আওলু দাঁড়িয়েছিলো। ভোটের দিন সভাপতি মশাই আমাকে ইনামদারের বাড়িতে ডেকে মগজ-ধোলাই দিলো আর বললো যে তার বিরুদ্ধে ভোট দিলে আমাকে চিঁড়েচ্যাপটা ক'রে ফেলবে। পুলিশ নেমেছিলো তখন। এ-সব আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে, ফোটোর মতো স্পষ্ট।

মা-র পাশে ব'সে-ব'সে ক্লান্ত হ'য়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়লাম। দেখলাম শাদা-শাদা তরল পদার্থ মা-র দেহ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে। গায়ের দুর্গন্ধ আরো দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রায় মা-র ওপর প'ড়ে যাচ্ছিলাম।

'কী হ'লো?' বাবা বললো।

'কিছু নয়।' আমি বললাম।

বাবা উপদেশ দিলো, 'যদি ক্লান্ত লাগে, একটু শুয়ে থাক।'

আমি বললাম, 'না, আমি বিশ্রাম করতে চাই না।'

কিন্তু তবু চটের গাদায় ঠেশ দিয়ে রইলাম কয়েক মিনিট। হাত নাড়তে গিয়ে দেখি মা-র পোড়া মাংসের একটা টুকরো আমার কনুইতে লেগে রয়েছে। স্তম্ভিত হ'য়ে রইলাম। জিভ শুকিয়ে গেলো।

সোমা আর চিমি নিঃশব্দে কুটিরে ঢুকলো। সোমা বাবার পাশে নীরবে ব'সে রইলো আর চিমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মা যেন মুখ খুলে কী বলতে চাইলো, কিন্তু বৃথা। আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে মা অস্পষ্ট গলায় বললো, 'কাঁদিসনি...একদিন-না-একদিন সকলকেই পৃথিবী ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। কাঁদে না, যা হয়েছে তার জন্যে কেঁদে লাভ কী?'

আর কথা বলতে পারলো না। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বেজন্মা কোথাকার! আন্দোলন করতে গিয়েছিলি, নেতাগিরি ফলাতে গিয়েছিলি! তখন তো আমার কথা শুনিসনি, এখন কেঁদে কী হবে?'

বাবা আরো-কী বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু জিভের সাহায্য পেলো না। আওলু পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হবার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পঞ্চায়েতের কুয়োর পাশে একটা জলাধার খুলবো। মাহার আর মাঙদের গোটা পাড়াই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। শুধু আমার বাবা বাদে; বাবাটা এক নম্বরের কাপুরুষ। সালু মালা, গণপৎ তেলি এবং সভাপতির নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা আমাদের বিপক্ষে

দাঁড়িয়েছিলো। লাঠিসোঁটায় সজ্জিত দুই দল দুদিকে সমবেত হ'লো, গ্রাম যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হ'লো। মনে আছে, একদিন দুপুরে পঞ্চায়েতের কুয়ো থেকে জল নেবার জন্যে আমরা সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলাম; মনে আছে, গাঁয়ের মাঠে পুলিশের জিপের আবির্ভাব ঘটলো বেলা চারটে নাগাদ, যখন প্রতিরোধ পুরোদমে চলছে। পুলিশের লাঠি চললো আমাদের মাথার ওপর, যতক্ষণ-না রক্ত বেরুলো। কুয়োটা রক্তে লাল হ'য়ে গেলো। সরপঞ্চ আর গণপৎ তেলিকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পুরলো পুলিশ, এক সপ্তাহ পরে ছেড়ে দিলো।

গ্রামের দৈনন্দিন জীবন আবার যথারীতি চললো। রক্তগঙ্গার কথা কেউ আর মুখ ফুটে বললো না। এইভাবে দু-মাস গেলো। মাহার-মাঙ পাড়ার বাসিন্দারা একটাও প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করলো না। গোটা গ্রাম একেবারে ঝিমিয়ে পড়লো। কিন্তু সহসা একরাত্তে আমাদের বিস্মিত ও শোকাহত ক'রে আমাদের কুঁড়েগুলো আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করা হ'লো। সবকিছু পুড়ে ছাই। আগুনের বেড়ার মধ্যে থেকে মা-কে টেনে বার করা হ'লো। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গেলো না, পুড়ে-যাওয়ার চিকিৎসা হ'লো না। সিতিয়া পুলিশে খবর দিতে গিয়েছিলো; নদীতে তার লাশ পাওয়া গেলো, শিরদাঁড়া ভাঙা। সব রাস্তা বন্ধ।

এই মারাত্মক ঘটনার পর পাঁচ দিন কেটে গেছে। আমার অহংবোধ এবং গ্রামবাসীদের পাশব নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছে আমার মা। যদিও পাঁচ দিন ধ'রে মৃত্যুশয্যায়, তবু মা জীর্ণ গলায় আমাকে বললো, 'বোকামি করিসনি, বাবা। খিদে মারিসনি, কিছু খা। পাঁচ দিন ধ'রে কিছু খাসনি, ঘুমোসওনি।'

কথা না-শুনে মা-র পাশে শুয়ে পড়ি। ক্রোধে আর যন্ত্রণায় চোখ, কান, নাড়িভুঁড়ি সব জ্বলতে থাকে। কী যেন প'ড়ে গেলো শুনলাম। কষ্ট ক'রে চেয়ে দেখলাম মা-র দুর্গন্ধ হাত আমার শরীরের ওপর পড়েছে। মা-র মুখ দিয়ে শাদাটে তরল পদার্থ বেরুতে লাগলো। মা-র নাকের সামনে আমার হাত ধ'রে বুঝতে চেষ্টা করলাম নিশ্বাস পড়ছে কি না। বুঝলাম মা-র শেষ নিশ্বাস পড়েছে। দুঃখের চোটে চোখ শুকিয়ে গেছে আমাদের। আমার মা-র বলিদান অঘোষিত, অনম্বু-শোচিত!

অনুবাদ : তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

অস্ত্র

ভীমরাও শিরওয়ালে

কে যে ওর নাম রেখেছিলো বার্ক্য তা জানা নেই। কথাটার মানে ঢ্যাঙা রোগা-পটকা ছোকরা। আর ঐ ঢ্যাঙা রোগাপটকা চেহারার সঙ্গেই মানানসই হবার জন্যেই বোধহয় ওর বয়স, বোধশোধ, ভাগ্য সবই কেমন যেন আধাস্বাগোছের।

ট্রেনে পকেট মারার জন্য জেল খেটে বার্ক্য আজ ছাড়া পেলে। বয়স এখনো কুড়ি পেরোয়নি, ঠোঁটের ওপরে সবে কচি গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। ঘন কালো বড়ো-বড়ো চোখ, কালো জামের মতো যেন, আর মুখে ভারি সরল একটা ভাব। একটা কাটা দাগ রয়েছে ভুরুর ওপরে, ওটাই হ'লো ওকে শনাক্ত করার একমাত্র চিহ্ন।

বার্ক্য যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসছে, জেলারবাবু তখন ওর সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। ওর হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বাপের মতো ভঙ্গিতে উপদেশ দিলেন: 'এই নরকে তোমার আর যেন ফিরে না-আসতে হয়। অবিশ্যি মাঝে-মাঝে এমনি যদি আমার কাছে আসতে ইচ্ছে করে তো এসো। এবার থেকে ভদ্দরলোকের মতো থাকার চেষ্টা কোরো। একটা চাকরি-বাকরি দেখে নাও। ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে ছাখো। এখন অল্প বয়েস, সময় নষ্ট কোরো না।'

জেলারবাবুর এই ভদ্রতায় বার্ক্য তো একবারে ব'র্তে গেছে। ওর যা পেশা তার জন্যেই জেলারবাবুর যে 'হৃদয়' ব'লে কোনো বস্তু আছে তা তো আর কেউ ভাবে না। ও মনে-মনে সংকল্প ক'রে ফ্যালে, ভদ্রলোকের মতো বাঁচার চেষ্টা করবে, আর কঠিন পরিশ্রমে নিজের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা ক'রে যাবে। কিন্তু বার্ক্যর সংকল্প, ভাগ্য তা ভেস্তে দিলে। জেল-এলাকার বাইরে আসতে-না-আসতেই বার্ক্য দেখতে পেলে একজন পুলিশের লোক রাস্তায় দুই ছোঁড়াকে ধমকাচ্ছে আর যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছে। তাদের অপরাধ তারা ডবোল-বাইক ক'রে সাইকেল চড়ছিলো। পুলিশের লোকটি তাদের ওপর যে-সব গালাগালের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলো তার ভাষার নমুনা হ'লো: 'এই যত্তসব, মা-বোন-চোদা মাকড়ার দল, মুণ্ডু গুঁড়ো করবো আজ তোদের।' লোকটি তার খিস্তির তাঁড়ার এদের ওপরেই

উজাড় করবে। ছেলে দুটো ভয় পেয়ে তাদের গভীর অপরাধের জন্ত ক্ষমাটিমা চাইলে, ভবিষ্যতে ট্র্যাফিক কানুন মেনে চলার প্রতিশ্রুতিও দিলে। ভুঁড়িওলা পুলিশ অবিশ্যি লাঠি দিয়ে পিটোতে-পিটোতে ওদের অজ্ঞান ক'রে ফেললো।

জেলের ঠিক বাইরেই এই দৃশ্য দেখে রাগে বার্ক্যর মাথায় আগুন চ'ড়ে গেলো। 'এই নির্মম জেলার লোকটা ছাড়তে গেলো কেন আমাকে জেল থেকে? কী হবে এতে আমার? একটা লক্ষ্মীছাড়া ভিখিরি ছাড়া আর তো কিছু নই আমি। এই পঞ্চাশটা টাকায় আমার কী হবে? দৈনিক দু-মুঠো খাবারের থেকেও বঞ্চিত করলো—দয়ামায়াহীন এই লোকটা।'

বোকার হদ্দ বার্ক্য তার পর এলোমেলো পথে-পথে ঘুরে বেড়ালে, খাঁচা থেকে সদ্য-ছাড়া-পাওয়া পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে। নিজের মনেই বিড়-বিড় করলে সে: আজ তো আর জেলও নেই, জেলারও নেই। যেখানে যেমন ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে তাই করতে পারি। হে ভগবান, মাত্র ছ-মাসের মধ্যে সারা দুনিয়ায় কী বিরাট বদল হ'য়ে গেলো! আজ আর আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই কোথাও, একলা কাটাতে হবে সারাটা জীবন। এদিকে আবার জেলও চাই না, খাঁচাও চাই না।

আজ বার্ক্য তার নিজের শরীর ও মনের রাজা। হাত-পা-চোখ-মুখ-নাক সব আজ তার নিজের। আজ আর তার শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে ফরমাশ করতে পারছে না। সে আজ তাদের ফরমাশ করছে। তার যেমন ইচ্ছে তেমনি চালাচ্ছে তাদের। সে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়েই চললো। তারপর মনে হ'লো বাসে চড়তে পারলে বেশ হ'তো, অথবা ট্যাক্সি বা ট্রেন, এমনকী এরোপ্লেন। মন যদিও অনেক-উঁচু আকাশে উড়ে চলেছে, তার হাত কিন্তু একেবারে শূন্য পকেটের ভিতরে ডোবানো; ঐ হাতের যে আর আলাদা কোনো সত্তা বা অস্তিত্ব আছে তা যেন আর মনেই হয় না। এখানে-ওখানে এলোমেলো ঘুরেই চললো বার্ক্য। এখন তার কাছে দিন ব'লে ব্যাপারটার আর কোনো মানেই নেই। সূর্য এক যন্ত্রের মতো উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে। জেলারের দেয়া টাকাটা খিদে মেটাতে খরচ ক'রে ফেললে সে, তারপর আবার সেই কপর্দকশূন্য, অস্থির চালচুলো না-থাকা অবস্থায় ফিরে-আসা।

বম্বাইয়ের ঝলমলে রাত এখন। নানা রকম উলটোপালটা চিন্তায় বার্ক্যর মনটা কেমন যেন হ'য়ে উঠছে। কেউ দেখবার নেই তাকে, ভরসা করবার মতো কেউ নেই তার। আগে, সে-ই কবে, তার মা ছিলো অন্তত; এখন কোথায় তার

মা, কিচ্ছু জানা নেই তার। হয়তো চিরদিনের মতো এ-পৃথিবী ছেড়েই চ'লে গেছে তার মা। এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না : 'কে দেখবে আমাকে?' নিজের মনেই আর-একটা প্রশ্ন তোলে সে : 'তবে কি আবার পকেটমারা শুরু করবো?' কিন্তু বার্ক্যর মনে এ-কথাও এখন পরিষ্কার যে, জেলের খুপরিতে প'চে মরতে সে আর পারে না।

গত সন্ধ্যায় যে-সূর্য অস্ত গিয়েছিলো আজ সকালে সে আবার উঠেছে। বার্ক্য নজর ক'রে দ্যাখে, মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চারা সব এধার-ওধার ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে শুধু ঐ হতচ্ছাড়া পেট ভরাবার ধান্দায়। সে ভাববার চেষ্টা করে, যেখানেই থাক-না কেন, তার মা এখন কী করতো; নিশ্চয়ই দিন-আনি দিন-খাই ক'রে কোনোমতে দু-মুঠো জোগাড় করার জন্য এর-ওর পেছনে ছুটতো। ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত সে ঠিক ক'রে ফ্যালে রেলস্টেশনে কুলিগিরি করবে, জোর পরিশ্রম ক'রে অন্যের মাল ব'য়ে-ব'য়েই সে নিজের দারিদ্র্যের বোঝা হালকা করবে। না, পকেট মারার লাইনে সে আর যাবে না, তাহ'লে তো আবার সেই জেলের নরকে। জেলের ঐ নরকে প'চে-মরার চেয়ে গতরে খেটে আট আনা পয়সা রোজগার করাও ঢের ভালো। একের পর এক নানা জায়গায় সে খোঁজাখুঁজি ক'রে চলে যদি একটা-কিছু কাজ মেলে। কিন্তু ওর তো বয়স কম, কেউ ওকে কাজ দেয় না, তা ছাড়া এমন রোগা-পটকা, ভারি মাল ও কী ক'রে টানবে! শেষমেশ সে প্রায় বুঝে নিয়েছে যে, মাল-বওয়া জন্তু হওয়াও তার দ্বারা হবে না। একবার এক যাত্রীর লাগেজ টানতে-টানতে সে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যায়, আর হাতের মালও ছিটকে যায়। মালের মালিক ওকে 'বেজন্মা' ব'লে গালাগাল দেয়। কথাটার মানে তার ঠাওর হয় না। তবে এটা ও বুঝে যায় যে, সে এমন-কেউ যাকে বেজন্মা ব'লে। কোনোরকম কাজ পাবার সম্ভাবনাই তার উবে যায়। মনে-মনে সে কেমন যেন দুর্বল হ'য়ে পড়ে, আর সবকিছুতেই তার অরুচি ধ'রে যায়।

বোঝা বওয়াতেও আর বার্ক্যর কোনো উৎসাহ নেই। অন্য-কিছু কাজকর্ম করার কথা ভাবে সে। এই-সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে তার চোখের ঘুমও গেলো—ঐ একটা জিনিশই তো তার নিজের বলতে ছিলো, যেটার জন্যে পয়সা খরচ করতে হয় না। অস্থির হ'য়ে সে আবার রাস্তায় এলোমেলো ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলে—তাতে তো আর কেউ বাধা দিতে পারে না। একদিন এইরকম ঘুরতে-ঘুরতে রাস্তায় এক ভিখিরিকে দেখে সে থেমে দাঁড়ালে। তারপর একটা কোণে দাঁড়িয়ে ভিখিরির ভিক্ষে-করা নগদে বেশ একমুঠো পয়সা পাওয়া সব দেখলো।

সঙ্গে-সঙ্গে বার্ক্যর মাথায় এলো ঐ রকম ভিখিরির বেশ ধ'রে পয়সা রোজগার করতে হবে। কিন্তু মুষড়ে গেলো যখন বুঝলো যে, ভিখিরির ভূমিকায় অভিনয় করারও তার যোগ্যতা নেই, কারণ ওর তো দুটো পা-ই সচল। খোঁড়া ল্যাংড়া না-হ'তে পারায় ভিখিরির ভূমিকাতেও সে অযোগ্য। ঐ অন্য ভিখিরিটা তো খোঁড়া, তাই তার পক্ষে ঐ ভূমিকায় কাজ করা খুব সুবিধের। বার্ক্য একেবারে দ'মে গেলো। ভিক্ষুকটি এতক্ষণ নিজের ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত ছিলো, হঠাৎ বার্ক্যর দিকে চোখ পড়ায় এই সব কথাবার্তা হ'লো :

'কী, চাই কী, খোদার খাশি ?'

'না, কিছু না, আমি এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।'

'কী, এই খোঁড়ার সম্বলটুকু সব ছিনতাই করার মতলব না কি ?'

'না, তা কেন ?'

'কেন, সে তুই ভালোই জানিস।'

পরিচয়ের সূত্রে এইটুকু কথাবার্তাতেই ওদের দুজনের মধ্যে যেন প্রথম দর্শনেই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে।

কথাবার্তা চলতে থাকে :

'পরিচয়টা কী জানতে পারি ?'

'আমি তো মহারাষ্ট্রের লোক।'

'অ! তবে শোন্, আমি কিন্তু মহারাষ্ট্রের লোক নই; কিন্তু মরাঠি বলতে পারি। আমার নাম পিটার মেনজেস্। আমি ছিলাম এক ব্লাডি সৈন্য···এখন অবিশ্যি ব্লাডি রিটায়ার্ড··· ঐ ব্লাডি যুদ্ধে আমার পা কাটা গিয়েছিলো। আর তার পরে আমি ভিক্ষেয় আর মদে ডুবে গেছি। ব্লাডি বুলেটের বদলে এখন নিয়েছি ব্লাডি ভিক্ষের থালা আর মদের বোতল। এখন, আমি যে কে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, আর আমিও অন্যেরা কে কী তা জানবার কোনো গরজই দেখাই না।'

ঐ ভিখিরির মরাঠির সঙ্গে ভাঙা ইংরেজির এই জগাখিচুড়ি ভাষা বার্ক্য বুঝতে পারে না। তবে, পিটার, যে কিনা লোক না-দেখেই শত্রু ঠাওর করতে পারে, ঠিক ধ'রে ফেলেছে যে, বার্ক্য তার কথার কিছুই বোঝেনি। তবে তাতে কিছু না, পিটার শিক্ষাবিষয়ে তার বাণী দিয়েই চললো :

'যুদ্ধে আমার পা দুখানা যায়।···আমি তো জওয়ান ছিলাম, এখন ভিখিরি হয়েছি। তুইও যদি ভিক্ষা করতে চাস তো এখানে ব'সে পড়, আমার পাশে, দুজনে মিলে আবার নতুন ক'রে শুরু করা যাক।'

এই-সব শুনতে-শুনতে বার্ক্য দুঃখে ভেঙে পড়ে। 'না, না, আমি কখনো ভিক্ষে করবো না। ভিক্ষে ক'রে বাঁচার চেয়ে বরং মরবো তবু সেও ভালো। বাড়ির খাটবো, কেনা চাকর গোলাম হবো, ঝাড়ুদার যদি হই তাও সই, কিন্তু ভিখিরির জীবন কখনো না।'

যদিও পিটার আজ খুনো ভিখিরি, তবু বার্ক্যর এই স্থির প্রতিজ্ঞার কথা শুনে তারও মায়া হ'লো। সে তার গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ক্রাচ টেনে-টেনে আরো একটু এগিয়ে গেলো; বার্ক্যকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলো তার সঙ্গে ভিক্ষের ব্যাবসায় নেমে পড়ার জন্যে। ওর পুরোনো দিনের গল্প বলাও চলতে থাকলো সেইসঙ্গে:

'আমি দুশমনদের মুণ্ডু কেটেছি, আর তুই কেটেছিস অন্য লোকের পকেট। আমাদের দুজনেরই তো একই হাল। আমাদের জন্যে কেউ নেই, এমন-কেউ নেই যে আমাদের পছন্দ করে বা একটু ভালোবাসে। আমার একটা মাত্র ভাই আছে, সে-ব্যাটা মেয়েছেলের ব্যাবসা করে। কিন্তু আমি তার নোংরা মুখ দেখতেও চাই না।'

এখন, বার্ক্যও বাধ্য হ'লো তার পুরোনো দুঃখের দিনের কথা বলতে:

'চারদিকের এই এত লোকজনের মধ্যে আমি কিন্তু একেবারেই একলা। কেউ নেই আমাকে দেখবার মতো। মা নেই, বাবা নেই। কোনো-এক সময়ে এক মেয়েলোক ছিলো যাকে আমি মা বলতাম। সেই বোধহয় একমাত্র যে আমাকে একটু ভালোবাসতে পারতো। আর, এখন আমি জানিও না, সে বেঁচে আছে না সগগে গেছে। যদি কোনোদিন তার দেখা পাই, তাহ'লে তাকে ভালোবেসে তার সঙ্গেই থাকবো, একমাত্র তার সঙ্গেই।... কিন্তু, তা বোধহয় আর আমার কপালে নেই।'

পিটার অবশ্য এখনো তার ভিক্ষার দর্শনের ওপরে সমানে ব'কেই চলেছে। সেই বক্তৃতা শুনতে-শুনতে বার্ক্য আরো হতভম্ব হ'য়ে যায়। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া যেমন দুদ্দাড় বেগে ছুটে চলেছে, তার মাথার মধ্যে ভাবনাচিন্তাও যেন তেমনি হুড়মুড় ক'রে পাক দিয়ে-দিয়ে চলেছে। পিটারের ভিক্ষার দর্শন আসলে তার জীবনের অর্থনীতি ছাড়া আর-কিছু নয়। সে খুব ভালো ক'রেই অর্থনীতির ঐ-সব সূত্র জানে যে, দাম বাড়লে চাহিদা কমে যায়, আর দাম পড়লে চাহিদা বাড়ে। এমনকী ভিক্ষের বেলাতেও এক জায়গায় ব'সে অনেকদিন চালালে ভিখিরির দামও ক'মে যায়। তাই সে বার্ক্যকে পরামর্শ দেয়, সুবিধেমতো কিছুদিন বাদে

বাদে জায়গা বদলাতে। এ-বিষয়ে তার নিজের কোনো সন্দেহ নেই যে, জায়গা বদলালে রুচি বদলায়, ভিক্ষেরও বদল হয়।

ভিক্ষার ওপর পিটারের বক্তৃতা শুনেও বার্ক্য এখনো ব্যাপারটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না। পুলিশের লোকেরা যে ভিখিরিদেরও তাড়া করতে ছাড়ে না এটা সে জানে আর তাতে তার খুব ভয়ও হয়। ওদের সব ধ'রে-ধ'রে হাজতে পুরে দেয়। পিটারের বকবকানি তাই সে কিছুই শুনছে না, মুখ ফিরিয়ে ব'সে আছে। তাকে ছেড়ে সে এবার অন্য দিকে চললো।

কিন্তু এতে ক'রে বার্ক্যর পেটের জলুনি তো কমছে না। পেটের নাড়িভুঁড়ি খিদেয় ছিঁড়ে যাচ্ছে, আর সে খিদেও যেন বেড়ে চলেছে গুণোত্তর রাশির মতো। নেতিয়ে প'ড়ে খিদের জ্বালায় মরো-মরো অবস্থা তার এখন। 'ভিক্ষে করা বা না-করা'—এই এখন একমাত্র প্রশ্ন তার কাছে। কী করবে কিছু ভেবে না-পেয়ে সে সোজা ঐ পাকা ভিখিরি পিটারের কাছেই আবার যায়। খানিক দূর গিয়ে সে পিটারের দেখা পেলে, ঠিক সেই একই জায়গায় যেখান থেকে আগের বার তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো। পিটার তখন একটা স্বপ্ন দেখছে যে, ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার মতো বার্ক্য আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বার্ক্য ধাক্কা দিয়ে পিটারকে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে প্রথম কথাই বললে তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। দয়ালু ভিখিরি পিটার তার কাছে যা ছিলো, ক-টা খুচরো-পয়সা, বার্ক্যকে দিলে। বার্ক্য যেন জিতে গিয়েছে এই ভঙ্গিতে ঐ খুচরোগুলো নিয়ে হোটেলের দিকে চললো। আগে তো খিদের জ্বালা মেটানো যাক, অনেক দিন দানাপানি কিছু না-পড়ায় আগুনটা যেন বড্ড জ্বলছে। অনেক রাত্তিরবেলায় সে একটা হোটেলে গিয়ে হাজির হ'লো আর জন্তু যেমন তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি সেখানে যা-কিছু খাবারদাবার পাওয়া গেলো তার ওপর সে ওইরকমই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গপগপ ক'রে গিললো।

পরের দিনের সকাল হ'লো এই পৃথিবীতে। বার্ক্য নজর করলে লোকেরা জীবিকার তাগিদে এধার-ওধার ছুটছে। খিদেই চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সব্বাইকে। পেটের জ্বালায় পাহাড়ও নড়ে। এতক্ষণে পিটার তার জায়গাটা বদলে ফেলেছে, কাছাকাছি একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের গায়ে। বার্ক্য আবার পিটারের কাছে ফিরে এলো। দেখতে পেলে পথ দিয়ে যারা আসছে যাচ্ছে পিটার তাদের দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে কাতর গলায় ভিখ মেঙে চলেছে। তবে বার্ক্য কিন্তু এখনো ও-কাজ করতে চাচ্ছে না। সে কোনো কাজ চায়, যত ছোটোখাটো কাজই হোক-না

কেন। এইরকম কাজ খুঁজতে-খুঁজতে শেষে সে তোফা বাবুদের এক তোফা কলোনিতে এসে পড়লো। ভিক্ষুকরা ওখানে সব দল বেঁধে ভিক্ষে চেয়ে চলেছে, পাচ্ছে কিন্তু খাবারের বদলে গালাগাল। খিদেয় অত্যন্ত কাবু লাগছে। মালিকের সামনে প্রভুভক্ত কুকুর যেমন ল্যাজ নাড়ে, বার্ক্যও তেমনি একজন বাবুর সামনে একটা কাজ দেবার জন্য ঘ্যানর-ঘ্যানর করতে লাগলো। বড়োলোক বাবু তার সামনে একটা সিকি ছুঁড়ে দিলে দেখে বার্ক্য অবাকও হ'লো, মনে-মনে দ'মেও গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে প'ড়ে গেলো সেই অতি সহৃদয় (?) জেলারবাবুর কথা—যেদিন ও জেল থেকে বেরিয়ে আসে সেদিন তিনি ঐ একইভাবে ওর হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন। রাগে তার মুখ লাল গনগনে হ'য়ে উঠলো, ভদ্রলোকের সঙ্গে সে কথা কাটাকাটি শুরু ক'রে দিলে :

'আমি ভিক্ষে চাইনি, কাজ চেয়েছি।'

'কী অভিজ্ঞতা আছে তোর এর আগে?'

'জেলে প'চে-মরা ছাড়া আমার আর-কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

এই কথা শুনে ঐ তোফা বাবু তাঁর গাড়ি চ'ড়ে বেরিয়ে গেলেন। দুরে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় বার্ক্য গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে। গাড়ির পোড়া পেট্রলের চড়া গন্ধে তার যেন বমি আসবে ব'লে ম'নে হলো।

বার্ক্য আবার পিটারের কাছে ফিরে আসে, সেই ঝুনো ভিখিরি। বার্ক্য ভিক্ষে করতে পারছে না, কোনো কাজ জোটাতে পারছে না, কাজেই পিটার যেমন তাকে দিন-আনি দিন-খাই ক'রে চালিয়ে দিচ্ছে তেমনি ক'রে আবারও পিটারের কাছে চাওয়া ছাড়া তার আর-কোনো গতি নেই। রাগে-অভিমানে চীৎকার ক'রে ওঠে সে :

'একটা ছোটখাটো কিছু কাজ জোটাতে পারি না, মুখে তোলবার মতো খাবার নেই কিছু, মা ব'লে ডাকবার মতো কেউ নেই আমার এই দুনিয়াতে। এই সমাজটার দয়ামায়া নেই, ছোটোলোক! জেলারবাবু, পিটার, ঐ তোফা চালের বড়োমানুষগুলো-সব্বাই—মায়াদয়ার লেশ নেই কারু।'

রাত্রি গভীর হ'লে বার্ক্য রেলস্টেশনের পাশে একটা পাড়ায় এসে পড়ে। এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় সেখানে, কোনো মানে নেই তার এই জীবনের। চারপাশের সবকিছুতে মনটা তেতো হ'য়ে ওঠে। ভেতরে-ভেতরে সে বিদ্রোহী হ'য়ে পড়ে। বেপরোয়াভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে একটা গয়নার দোকানের কাচের শো-কেসের দিকে তার নজর পড়ে। ঐ শো-কেস তাকে যেন

এক ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়ে লোভ দেখায়। চোখের পাতাও যেন আর পড়ছে না, বুকের ধুকপুকুনিও যেন থেমে গেছে। যতটুকু চিন্তাশক্তি তার ছিলো তার সবটুকুকে মাথার মধ্যে জড়ো ক'রে মুহূর্তের জন্ত সে নিজেকে প্রশ্ন করে: 'আমি যদি শো-কেসটা ভেঙে ফেলে ভেতরের হিরে-জহরৎ সব নিয়ে পালাই তো কী হ'তে পারে? এটা যদি করতে পারি, তাহ'লে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে হাতকড়া দেবে, আবার জেলে পুরবে। আবার ঐ নরকে পচতে-পচতে ওখানেই মরতে হবে। অথবা, বড়োজোর, জেলারবাবু আবার একটা পঞ্চাশ টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ভালো হ'য়ে থাকবার জ্ঞান দেবে। আর আমার রুজির দফা তাতে রফা। যত্তসব অপদার্থ!'

এইসব ভাবতে-ভাবতে, সে কেসটা ভাঙবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে; শো-কেস ভেঙে, সোনা-রুপো হিরে-জহরৎ যা পারে হাতিয়ে পালিয়ে যাবে। তার রাগের দাপটে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো, বেপরোয়া আবেগে যুক্তি চাপা প'ড়ে গেল। আপাতত এখন সমস্যা হ'লো সুবিধেমতো একটা-কিছু হাতের কাছে পাওয়া, এমন-একটা অস্ত্র যা দিয়ে শো-কেসটা ভাঙা যায়। ঘুঁষি মেরে ভাঙতে গেলে হাত কেটে-কুটে যাবে, পুলিশের জন্যে তাহ'লে এই অপরাধের একটা তৈরি প্রমাণ থেকে যাবে। এদিক-ওদিক খুঁজতে-খুঁজতে, একটা মোক্ষম অস্ত্র তার চোখে পড়ে—ঐ যে একটা পাথরের টুকরো। সে ওটা তুলে নেয়, যেন কোনো-অসুরের-মাথা-ভাঙতে যাচ্ছে এমনিভাবে তার সমস্ত শক্তিকে সে এখন হাতে এনে জমা ক'রে ঐ কাচের শো-কেসের দিকে ছুঁড়লো; আর অমনি শো-কেসটা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো।

অনুবাদ: সৌরীন ভট্টাচার্য

লুঠেরাই লুঠ

বাবুরাও বাগুল

বঞ্চলার পাৎলা ফুলের মতো মুখখানা সহসা রাগে শক্ত হ'য়ে গেলো। তার নরম মিষ্টি চোখ দুটো এখন রাগে জ্বলছে। হিংস্রভাবে সে হাতের চিঠিটাকে দলামোচড়া ক'রে দিলে। ওটা এইমাত্র তার বাবার কাছ থেকে এসেছে।

বাবাকে সে কেবল ঘেন্না করে। কোনোমতে কী ক'রে বাবার সাড়ে-সর্বনাশ করা যায় এই চিন্তাটা বেশ-কিছুদিন তাকে পাগল ক'রে রেখেছে। চিঠিটা হাতে পাওয়া মাত্র চিন্তাটা আবার তাকে পেয়ে বসলো। 'সাপে কেটে মরে না কেন লোকটা'—মনে-মনে বলে সে।

ভাইঝির মুখের দিকে তাকিয়ে 'নাচওয়ালি' গঙ্গু ভয় পেয়ে যায়। তার প্রাণের মধ্যিখান থেকে একটা ভয়-বেদনামিশ্রিত আর্তনাদ বেরিয়ে আসে, 'কী হ'লো? বিয়োতে গিয়ে নাজুকা আমার মরেনি তো? তোরাপ্পা-র গলায় চাকু বসায়নি তো!'

পুতলা ব্যাথরুম থেকে বেরিয়েই বঞ্চলা আর গঙ্গুর দশা দেখে ভয়ে একেবারে জ'মে গেলো। গঙ্গুর অবস্থা দেখে সে এত ভয় পেয়েছে যে হেলায়-ফেলায় কাঁধের উপর ফেলা ব্লাউজটা গায়ে চাপানোর কথাও তার মাথায় এলো না। বিচলিত হ'লেই গঙ্গু নির্দয়, নির্মম—প্রায় আমানুষই হ'য়ে যায়। গঙ্গুর মেজাজ খারাপের অভিজ্ঞতা পুতলার আগে হয়েছে। আর যখন সে দেখলে গঙ্গু শূন্যদৃষ্টিতে তার পিঠের কালশিঁটেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, পুতলা পুজোর জায়গায় গিয়ে প্রার্থনায় বসলো গঙ্গুর যাতে মেজাজ খিঁচড়ে না-যায়।

বাইরে, রাস্তায়, বাড়ির ঠিক সামনে সিঁড়ির ধাপে ফর্শা, সুডোল উরুতে হেলান দিয়ে রোদ্দুরে ব'সে বাদামি হ'য়ে-যাওয়া মসৃণ পিঠ তাতিয়ে নিচ্ছিলো সোনি। সে কিন্তু গঙ্গুর অবস্থা দেখে খুবই খুশি। সেই খুশির মুহূর্তে সে বঞ্চলাকে ডেকে যে-চিঠিটা এমন ভয়ানক দুঃসংবাদ নিয়ে এসে থাকতে পারে সেটাকে চেঁচিয়ে পড়তে বললে।

'বঞ্চলা, প'ড়ে শোনা না আমাদের।' তার আশা খবর পাবে তোরাপ্পা খুন

হয়েছে যাতে দুঃখে গঙ্গুর প্রাণ যায়। তাহ'লে গঙ্গু বুক চাপড়ে, মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে গ্রামে ছুটবে। আর গঙ্গু চ'লে গেলেই একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে। গঙ্গু তাকে কেনার পর থেকে সে একদণ্ডও অবসর পায়নি। তার পশার-বাজারও খুব আর খদ্দের তাকে নিজে পছন্দ করতে দেয়া হয় না। যে-কোনো সময়ে যে-কোনো কাউকে পাঠানো হ'তে পারে। তার ফলে সে সমানে কষ্ট পাচ্ছে আর একটুখানি অবসরের জন্যে একটুখানি হাঁফ ছাড়ার জন্যে হেদিয়ে রয়েছে।

বঞ্চলার দয়ামায়া সব উবে গেছে। সে পড়তে শুরু করে: 'পূজনীয় দিদি, যে কিনা আমার মায়ের মতন সেই গঙ্গুবাঈকে তোমার ছোটোভাই তোরাপ্পার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তোমার ভাইবৌ নাজুকা, ভগবানের কৃপায়...' এই অব্দি প'ড়ে বঞ্চলা, যে এতক্ষণ অনেক কষ্টে নিজেকে শামলে রেখেছিলো, আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে থামলে। গঙ্গুর কাছে ওদিকে মুহূর্তটি অশেষ আশঙ্কার।

সোনি ভাবে, 'তোরাপ্পাটা দিব্যি বেঁচে। একটু ফাঁক পাওয়া আর হ'লো না।'

বঞ্চলা প'ড়ে চলে: 'ভগবানের কৃপায় এক ছেলে বিইয়েছে।'

'তাই নাকি!' প্রবল খুশিতে গঙ্গু চেঁচিয়ে ওঠে। তার দুশ্চিন্তা কেটে যেতে পুতলা স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। বঞ্চলা প'ড়ে চলে: 'আর নাজুকা হাত জোড় ক'রে তোমায় আরজি করেছে যে তুমি যেন একজোড়া সোনার দুল, একটা সোনার হার আর একটা রুপোলি জরির শাড়ি ওর জন্যে নিয়ে আসো। তা ছাড়া ওর আশা তুমি নিশ্চয়ই মুখেভাতে বেজায় ধুমধাম করবে। তাই শিগগির একশো বা দেড়শো টাকা পাঠাও। আর আমার জন্যে...'

এই অসাধারণ স্বার্থপরতায় ভরা চিঠিটা পড়তে-পড়তে, এই অসম্ভব বেহায়া এবং বেআক্কেলে বেয়াড়া দাবিগুলো বঞ্চলাকে এতই রাগিয়ে দিলে যে সে শক্ত ক'রে চোয়াল এঁটে রইলো।

গঙ্গু কিন্তু খুশির চোটে বঞ্চলাকে কোনো পাত্তাই না-দিয়ে ব'লে চলে, 'কাল সকালে প্রথমেই টাকাটা পাঠিয়ে দেবো। নাজুকা আমার, তোর কাছে কোথায় লাগে পয়সা। আর আমা-হেন লোকে তোর এত ভক্তি কেন? আমারই তো তোর পায়ে পড়ার কথা। নাজুকা, আমাদের ঘরে তুই-ই তো আলো এনেছিস।'

গঙ্গু আহ্লাদে একেবারে আটখানা। তার ঘোলাটে চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝ'রে পড়ে। সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরন খেলে যায়। মনে হয় টাকা পাঠিয়ে নাজুকাকে দেবীর মতো ক'রে সাজাতে তার আর তর যেন সইছে না। গঙ্গুকে এত খুশি দেখে সোনি মুষড়ে পড়ে। গঙ্গু যখন এতটাই আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে, তাকে

তাহ'লে নির্ঘাৎ খাটিয়ে মারবে। এই চিন্তাতেই মরে সে। গঙ্গুর আনন্দে ওদিকে পুতলা গভীর সোয়াস্তি পায়। বঞ্চলার প্রতিক্রিয়া হয় একদম আলাদা। তার রাগ বাড়ে, জাগে জিঘাংসা। বাবা আর পিসি দুজনকেই খুন করতে সাধ যায় তার। ভাবনাটা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে যে বহির্জগৎ লুপ্ত হ'য়ে যায়। সে বলে, 'বাবা না ভূত একটা! শোরের পেট, শোরের কলিজা। ব্যাটা হারামখোর বেশ্যার দালাল!'

'কী!' খুশির ঘোর ভেঙে চেঁচিয়ে ওঠে গঙ্গু। 'যা বলেছি তাই-ই। নোংরা বেশ্যার দালাল।' রেগে আগুন হ'য়ে আছে বঞ্চলা। আঃ, নিজে যদি তরোয়াল হ'তো একটা! গঙ্গুর শরীর ফুঁড়ে যাবার সম্পূর্ণ আনন্দটা তাহ'লে কেবল তার একার হ'তে পারতো। ধূর্ত এবং কুটিল গঙ্গু কিন্তু মুনাফার কথা মনে রেখে রাগটা চেপে গেলো। কেননা বঞ্চলার প্রস্ফুটিত যৌবন, চোখধাঁধানো রূপ এবং সর্বোপরি ছলাকলায় তার পারদর্শিতা ভালো টাকা আনে। সেই লাভের কড়ি খোয়ানোর কোনো সাধই গঙ্গুর নেই। [সুতরাং] সে আপসের ভান করে।

'বঞ্চলা, নাজুকা যদিও তোর আসল জা না, তবুও তাকে সম্মান দিতে হয়। তোর কোনো ক্ষতি করেছে সে কখনো? কপালে যা লেখা থাকে তাকে খণ্ডানো যায় না। তোর পরে তোর মা আরো পাঁচটা মেয়ে বিইয়েছিলো। তাইতে আমরা বহু টাকা কর্জ করি যাতে নাজুকা তোর বাপকে বে করতে রাজি হয়। সোনাকপালি মেয়ে। বংশরক্ষা করেছে আমাদের। ঘরে আমাদের দেয়ালির আলো এনেছে।'

'হ্যাঁ, আর আমার নুড়োর আগুন জেলেছে!' বঞ্চলা সত্যিই চটেছে।

পুতলা আর সোনির সামনে গঙ্গুর মান যায় বঞ্চলার ত্যাঁদড়ামিতে।

'সে তোর বাপের জন্যে নয়। তোর নিজের পাপে।' গঙ্গু জবাব দেয়। আর ব'লেই, মেজাজের রাশ আলগা হ'তে দিয়েছে ব'লে, মনে-মনে অনুশোচনা করে। বঞ্চলার রাগদুঃখের পরিমাণটা সে বেশ অনুমান করতে পারে; ভাই আর ভাইবৌ-এর সুনামের কথাটা তার মন থেকে আপাতত উবে যায়।

বঞ্চলার গলা কাঁপছে, 'তোর আমাকে বলার সাহস হয় আমি পাপ করেছি। জিভে সত্যি সরে না তোর, বুড়ি কুত্তি? আমি? সোয়ামির ঘর করতাম না আমি? দু-বার পিটিয়ে আধমরা ক'রে দেবার পরও আমি তার ঘরে ফিরে যাইনি? তার পরও পশুর মার মেনে নিইনি? তাকে খাওয়াতে হাড় কালি করিনি? দ্যাখ্, দ্যাখ্ এদিকে!' ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে পেটে, বুকে, পিঠে এখনো যে-ক্ষতচিহ্নগুলো র'য়ে গেছে দেখায় বঞ্চলা।

'অসহ্য হ'য়ে যাবার পরই বাপের বাড়ি ফিরে গেছিলাম। আর বাপই বা বলি কেন হতভাগা বেজন্মা বেশ্যার দালালটাকে! তারপর রোজই যা আর আমি খিস্তি করেছি। শুনলো সে-কথা? কাটান দেয়ার কথা কানেই নিলে না। সোয়ামি রাজি ছিলো, কিন্তু বাবা রাজি হ'লো? সতী থাকতে দিলে? বেজন্মাটার কাছে ফিরে কপালের লিখন পুরাতে পর্যন্ত দিলে না। কাটানও পেলাম না, বিয়েও থাকলো না। তিন বছর বাড়িতে এসে প'ড়ে থাকলাম। মা-র মাসতুতো ভাই একদিন বেড়াতে এলো। ভালো ছিলো লোকটা। ভালো দেখলো আমায়, বিয়ে করতে চাইলো। সবাই বললে ভালো হবে। সুখে ছিলাম···

'ব্যস, ফুঁ'য়ে উড়ে গেলো। তোর ভাই একদিন মেরে তুলোধোনা করলে। লাথি মেরে বার ক'রে দিলে লোকটাকে। কেন? আমার সোয়ামি হ'তো না? অত যদি মাথা-উঁচু আর ধাম্মিক তো মেয়েকে খানকি বাড়িতে পাঠায় কেন? মারেনি কেন জন্মানোর সময়ে? এক সোয়ামির ঘর করতে দিলে না। এখন তবে দশ-ভাতারি হ'তে দেয় কেন? বলছি তোকে, তোর ওই নোংরা বেশ্যার দালালটাই এর মূলে।' রাগে-দুঃখে এবার কেঁদে ফ্যালে বঞ্চলা।

যদিও নিজেও খুব রেগে গেছে তবুও ব্যাবসার পক্ষে কী ভালো গঙ্গু তা খুব ভালো বোঝে। তাই কিছু নরম উপদেশ আর বাণী দিতে প্রস্তুত হ'লো গঙ্গু। 'বঞ্চলা, পাথরে অত কপাল কুটিস না, সুতভি ওখানে যা লিখেছে মুছবে না। মাথাই ফাটবে শুধু। সুতভি কপালে লিখেছিলো ব'লেই দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবের ঘর করতে হয়েছিলো। তাকা আমার দিকে'···কিন্তু তবু বঞ্চলার কান্না থামে না। সোনিও এতে নিজেকে সামলাতে পারে না। সে-ও কাঁদতে থাকে। আর এদের দুজনকে কাঁদতে দেখে পুতলাও যোগ দিতে বাধ্য হয়। গঙ্গুর এ-সব অসহ্য লাগে। এমন শুভদিনে যখন ফুর্তি করার কথা তখন এই-সব কান্নাকাটি! গা জ্ব'লে যায় তার। তবুও সে ঠাণ্ডা থাকে। যদি ভাই আর ভাইবৌ যা-যা চেয়েছে সে-সব দিয়েও একটা স্মরণীয় মুখে-ভাতের আয়োজন করতে হয় তো বঞ্চলার অন্তত আরো সাত-আট দিনের রোজগার তার দরকার। সেই শুভদিনে সে জলের মতো টাকা খরচ করতে চায়। সুতরাং সে ঠাণ্ডাভাবে সমবেদনার ভান ক'রে নিজের জীবনকাহিনী শোনাতে শুরু করে।

'আমার সোয়ামি আমাকে শুদ্ধু-মুদ্দু এক নষ্টের কাছে বেচে দেছিলো। কখনো অখুশি করিনি তাকে। তাও কেন? না, আমায় বে করতে জমি বাঁধা দেছিলো। পরে দেখা গেলো আমার চে জমির 'পরে তার সোহাগ বেশি। বোম্বে এলাম টাকার ধান্দায়। দেখলাম কিছুই জমাতে পারছি না। বঞ্চলার সোয়ামি যে-র'ম মারতো

আমাকে ঠিক সে-র'ম মারতো লোকটা। বলতো আমার জন্যেই নাকি জমিটা গেছে। শেষকালে এখুনি আসছি ব'লে একদিন আমায় বোনের বাড়ি রেখে গেলো। আর এলোই না কখনো। বোনটা ছিলো এক খানকি। তো, এইরকমই তো হয়। মরদগুলোই এইরকম—জাত-কেউটে সব।'

সোনি মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়। তার গল্পও মোটামুটি এক। অভাবী স্বামীর ঘর করতে সে আর পারছিলো না। তাই আরেকজনের সঙ্গে পালিয়ে গেলো। লোকটা বলেছিলো ভালো চাকরি করে। আসলে সামান্য দালালি পেতো। বোম্বেতে নিয়ে এসে চটপট গঙ্গুর কাছে তাকে বেচে দিলে লোকটা। বঞ্চলা কেঁদেই চলে।

গঙ্গুর গল্প—যেটা একদিক থেকে তার লোভের সপক্ষে ওকালতি—সোনির রাগটা আরো বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু গঙ্গুকে চটাবে না ব'লে সে সমবেদনার স্বরে জিগেশ করলে, 'তারপর কী হ'লো?'

'আর কী! কুড়ি বছর ধ'রে ছোটোভাইটাকে দাঁড় করাবার জন্যে খেটে মরলাম। কিছুর যাতে অভাববোধ না-করে সেই জন্যে প্রাণপাত করেছি। এখনো আমার হাজার টাকার ওপর ধার রয়েছে। কিন্তু ওর মনে আমি দুঃখ দিতে পারি না। ওকে···'

'এক পয়সাও না! এখন থেকে লোকটা আমার থেকে এক পয়সাও পাবে না। এক কানাকড়িও না। আমার থুতুর ওপরও ওকে দাঁড়াতে দেবো না। ডাইনি! আমার বোনটার জীবনও নিশ্চয় নষ্ট ক'রে দিবি। শোধ দেবো একদিন। ও মরলে ওর গোরের ওপর আমি নেত্য করবো।'

বঞ্চলা হঠাৎ রাগে লাফিয়ে ওঠে, ভীষণ ক্রোধে মাটিতে পা ঠোকে, যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো নৃত্যের ভঙ্গিমায়। থুতু ছেটায়, শাপান্ত করে, অবশেষে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'বঞ্চ···' গঙ্গু ভাই-অন্ত প্রাণ। আর যে-মেয়েরা তার মতো ঘৃণার জীবন সইতে না-পারে তারা তার দু-চোখের বিষ। সে বিবশ হ'য়ে থাকে। না-ন'ড়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ভূতের মতো ব'সে থাকে সে কিছুক্ষণ। তারপর যেন ছ্যাঁকা খেয়েছে এমনভাবে চীৎকার করে ওঠে, 'সোনি!'

বঞ্চলাকে শেষ ক'রে দিতে মনস্থ করেছে সে। কিন্তু আপাতত তাকে ভাবতে হচ্ছে বঞ্চলার আজ বিকেলের যে-রোজগারটা নিশ্চিতভাবে মারা যাবে সেটা পূরণ করা যায় কীভাবে। কাজে লেগে পড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। সে মন ঠিক ক'রে নেয়: 'সোনি, তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নে।'

'আমার এখনো চান-খাওয়া হয়নি। অন্তত সন্ধে অব্দি অপেক্ষা…'

'না! এখনই। পুতলা…' বঞ্চলার আক্রমণে গঙ্গু একেবারে ভূতে-পাওয়ার মতো হ'য়ে যায়। পুতলা হতভম্ব। ভয় পেয়েছে সে। লক্ষণগুলো সে চেনে। গঙ্গু এখন নির্মম, দানবিক ব্যবহার করবে। সাধারণত গঙ্গু বলবামাত্র সে মান্য ক'রে থাকে, কিন্তু এখন ভয়ে তার পায়ে শিকড় গজিয়ে গেলো। গত সাত-আট বছরে গঙ্গু কখনো তাকে শুরু করতে দেয়নি। এখন এই পরিবর্তনটা সুখের হবে না। তাকে দিয়ে শুরু হ'লে বাজার মন্দা যাবেই, যার মানে লোকসান। তাহ'লে গঙ্গু তাকে এককোঁটা জলও দেবে না। তার মনে এ-সব কথাই তোলপাড় করতে থাকলো আর সে স্থাণু হ'য়ে রইলো।

গঙ্গু পুতলার এই আশ্চর্য ব্যবহার দেখে তার উপর গালি-গালাজ বর্ষণ ক'রে চললো। ভয় পেয়ে পুতলা ইয়েলাম্বা দেবীর শরণ নেয়। গঙ্গুকে যেন তিনি খুশি রাখেন, ঠাণ্ডা রাখেন। দেবীর চরণে সমস্ত দুশ্চিন্তা-সমর্পণ ক'রে সে সুফল প্রার্থনা করে। তার ঘরে বিছানার ওপর সে পবিত্র বিভূতি ছিটিয়ে দেয় খরিদ্দার আকর্ষণ করার জন্যে। কিন্তু যেভাবে সে দেবীর পূজা সারলে তাতে তার মন ভরে না। ফলত অশেষ দুশ্চিন্তা নিয়ে সে দরজার দিকে এগোয়।

একদণ্ড দেরিও গঙ্গুর কাছ অসহ্য ঠেকছে। বঞ্চলা গঙ্গুর ইজ্জতে এমন আঘাত করেছে যে সে এখন অন্যদের কাছে সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছে। পশুর মতো হ'য়ে গেছে সে। এখন এমন-একটা মেয়েকে সে চায় যে পুরোপুরি খানকি, বেহায়া— যে খদ্দেরদের অশ্লীল কামচেতানো কথাবার্তা বলতে পারবে, তারা যা চাইবে তাই-ই করতে পারবে, এমন-কেউ হবে, যার দক্ষতা বঞ্চলাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তার বদলে পুতলা আসে বিড়বিড় ক'রে প্রার্থনা করতে-করতে, ভিতুভাবে খদ্দরদের দিকে এগোয় সে। গঙ্গু যা-যা চায় তার একেবারে উলটোটি।

'জেব্রা কাঁহিকা, পিঠটা ঢাকা দে,' সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'পিঠের দাগগুলো দেখাতে চাস্ নাকি সবাইকে? এসে ব্লাউজটা প'রে যা। মারতে চাস্ আমাকে?'

কিন্তু পুতলা ইতিমধ্যেই এগুতে শুরু করেছিলো ব'লে তার মনে হ'লো এখন ফিরে-আসাটা অমঙ্গলে হবে। সে সম্পূর্ণ দিশেহারা হ'য়ে গেলো। পাগলের মতো শাড়ির আঁচলটা একবার এদিকে একবার ওদিকে টেনে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে থাকলো সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক তার এই ধস্তাধস্তি লক্ষ করছিলো। লোকটা যাতে তার খালি গা দেখতে না-পায় তার জন্যে আরো প্রবলভাবে সে শাড়ি টানাটানি করতে থাকলো। তাতেও গা ঢাকা পড়লো না।

সোনি তাকিয়ে-তাকিয়ে এই করুণ সার্কাস দেখছিলো। পুতলার জন্তে তার দুঃখ হ'লো। কিন্তু গঙ্গুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে জ্ব'লে গেলো। ফের চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ঢের হয়েছে। দ্যাখো ওকে, শালার শাড়িটাকে ছাড়, গাধা।' কিন্তু পুতলা ভয়ে কাঠ। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাটানি যে! খদ্দের হারাবার ভয়ে সে গঙ্গুর হুকুম কানে তুললো না। পুতলা লোকটাকে ইশারা করলে। কিন্তু তাকে ডাকতে দেখে লোকটা মুখ ঘুরিয়ে কেটে পড়লো। বিনি পয়সায় এক ঝলক তো তার হ'য়েই গেছে। গঙ্গুর রাগ এতে আরো চড়লো। পুতলাকে উদ্দেশ ক'রে সমানে গালিগালাজ ছিটিয়ে চললো সে। পুতলা চোখ মুছতে-মুছতে চুপচাপ শুনে যেতে লাগলো। গঙ্গুর এখানে যতদিন পারে সে থাকতে চায়। যতদূর পারা যায় জীবনটাকে ভোগ ক'রে নিতে চায় সে। কারণ একবার তার এ-ব্যাপারে উপযোগিতা ফুরিয়ে গেলেই কুষ্ঠ রোগীর মতো দুচ্ছাই হ'য়ে থাকতে হবে। কোনো সন্দেহই নেই যে একদিন সে রাস্তাতেই ম'রে প'ড়ে থাকবে।

চারদিকে মন-খারাপ-করা নৈঃশব্দ্য। ন-টা পেরিয়ে গেলো। যদিও এই সময়েই মেয়েরা সাধারণত ভালো রোজগার ক'রে থাকে, আজ কোনো খদ্দেরই এলো না। লোকে বাড়ির সামনে দিয়ে পায়চারি করতে-করতে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে থামছেও, কিন্তু আবার হেঁটে চ'লে যাচ্ছে। পুতলা খেপে যায়, 'ইয়েলাম্মা এই-সব লোক কটাকে ধ'রে আমার কাছে পাঠাচ্ছে না কেন?' বিরক্ত ভাবে বলে সে।

ভাই আর ভাইবৌকে টাকাপয়সা গয়নাগাটি পাঠাবার ইচ্ছেটা এভাবে চাগাড় দিতেই বঞ্চলার বদলে অন্য-কাউকে জোগাড় করার বাসনা হঠাৎই মিলিয়ে গেলো গঙ্গুর। দারুণ মুখে-ভাত দিতে চায় সে। কিন্তু বেদনাদায়ক সত্যিটা হ'লো বঞ্চলা না-থাকলে কেউই আসবে না। বড্ড মরমে ব্যথা দিয়েছে বঞ্চলা। হেরে যাচ্ছে সে, মনে হয় তার। সোনি ভালো দেখতে আর দলমলে হ'লেও বঞ্চলার মতো চনমনে আবেদন তার নেই।

'সোনি, তোর কি মনে হয় বঞ্চলা ফিরবে?' গঙ্গু দুর্বলভাবে জিগেশ করে।

গঙ্গুর হাবেভাবে সোনির হাসি পায়, কিন্তু পুতলা আরো বিষণ্ন হয়। গঙ্গু চিন্তায় ডুবে যায়। সোনি যদি আজ দশ-পনেরোটা লোককে ঘরে নেয় আর প্রত্যেকে যদি চার-পাঁচ টাকা ক'রে দেয় তো হয় ষাট-সত্তর টাকা। আধা ওর। পুতলার থেকে হয়তো পনেরো-বিশ পাবো। বঞ্চলা বাকিটা জোগাতে পারবে।

'সোনি, তোর কি মনে হয় না বঞ্চলা ফিরবে?'

'না,' সোনি বিজয়গর্বে জবাব দেয়।

'ও ফিরবে না?' বুক কাঁপতে শুরু করে তার। বঞ্চলাকে ফিরিয়ে আনার কোনো-একটা উপায় তাকে ভেবে বার করতেই হবে। তারপর হঠাৎ যেন মাথায় বাজ পড়েছে এমনভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, 'সোনি, যা সিদ্‌রাপ্পাদাকে ডাক...'

'না।'

'কেন?' গঙ্গু চেল্লায়।

'বঞ্চলা আর আমাদের মধ্যে থাকতে পারে না। ও থাপ খাবে না। তার চেয়ে ও বরং আগে বিষ খাবে। আমাদের সঙ্গে আর কোনো কারবার করতে চায় না বঞ্চলা।'

সোনির সঙ্গে গঙ্গুকে একমত হ'তেই হয়। বঞ্চলা ফিরে এলেও তাদের একজন সত্যি ক'রে সে আর কখনোই হবে না। আমার যে-রোজগারের উৎসমুখ সে খুলে দিয়েছিলো তাও এবার শুকিয়ে যাবে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনা যায় কী ভাবে? কী করা যায়? নিজের নিরুপায়তায় গা জ'লে যায় তার। গঙ্গু এ-সব ভাবনায় নিজেকে জর্জরিত করছে। পুতলার মনে যা হচ্ছে সে আরো খারাপ। সন্ধের মধ্যে যদি কিছু না-হয় গঙ্গু তাকে একেবারে সবচেয়ে নিচু বেশ্যাদের দলে ফেলবে। আর সেখানে তার ভাগ্যে কী রয়েছে? ভবিষ্যতের একটা ভয়ংকর চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সমস্ত নোংরা লোকেদের যাবতীয় কদর্য কামেচ্ছা মেনে নিতে হবে তাকে। রোগে ধরবে তাকে আর হয়তো কুষ্ঠ হ'য়ে মারা যাবে। বঞ্চলাকে জোর করে ফিরিয়ে আনার জন্যে সিদ্‌রাপ্পাদাকে কথা বলার একটা সুযোগের জন্যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো। সে আবার মনে-মনে ইয়েলাম্বার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। এবার গঙ্গুকে বাইরে পাঠানোর জন্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে গঙ্গু, যে ভালো ক'রেই জানতো সোনির রূপ থাকলেও সে বঞ্চলার মতো খদ্দের আকর্ষণ করতে পারে না, উপলব্ধি করলে যে সে এবারে হেরে গেছে। খিড়কির দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। বঞ্চলাকে খুঁজতে চলছে সে। তাকে ফিরে আসতে বলবে। আর অনুরোধে যদি কাজ না-হয় সে এমনকী বঞ্চলার পায়ে পড়তেও প্রস্তুত।

পুতলা ভাবলে দেবী অবশেষে তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। সেও বেরিয়ে গেলো। সে বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনজন লোক এসে বাড়িতে ঢুকলো।

লোকগুলোকে ঢুকতে দেখে সোনির আরেকটু মন ভালো হ'লো। সে বোঝে যে পুতলার থেকে সে অনেক আকর্ষণীয় দেখতে। সে ভাবলে লোকগুলো পুতলা কতক্ষণে বাইরে যায় তার অপেক্ষা ক'রে তবেই এখন ভেতরে এসেছে।

গঙ্গু ফিরলো একগাল হাসি নিয়ে। তার পিছন-পিছন অনিচ্ছুকভাবে আস্তে-আস্তে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে বঞ্চলা।

সোনি ইতিমধ্যে একজনকে ঘরে নিয়ে গেছে। অন্তত দু-টাকার ব্যবস্থা তার হ'য়ে গেছে। দুজন এখনো অপেক্ষা করছে। তার মানে আরো চার টাকা। গঙ্গু নিজের ভাগ নিয়েই চিন্তিত। সোনি তার ভাগ পেলো কি না তাতে তার ভারি ব'য়েই গেলো। যে-দুজন কখন সোনির সঙ্গে তাদের পালা আসে তার অপেক্ষা করছিলো তাদের কাছে সে বঞ্চলার গুণকীর্তন শুরু ক'রে দিলে। বঞ্চলার প্রতি তাদের আকর্ষণ করার জন্যে নানা কথা বলতে লাগলো সে। তারা গঙ্গুকে পাত্তা দিলে না। তাদের চোখ বন্ধ দরজার উপর নিবদ্ধ। কিন্তু গঙ্গু অত্যন্ত ধূর্ত। সে কামসূত্রের ভাষার সঙ্গে একটু অশ্লীল ভাষা মিশিয়ে বঞ্চলার নগ্নতার বর্ণনা করতে লাগলো। ঠিক সেই সময়েই বঞ্চলা, শ্রান্ত-ক্লান্ত, কেঁদে-কেঁদে চোখ লাল, ঘরে ঢুকে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালে।

'তাকিয়ে ছাখ ওর দিকে। কচি শশার মতো তাজা আর নরম।' লোকদুটোর মধ্যে একজন, যে গঙ্গুর বর্ণনায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলো, বঞ্চলার দিকে এগুলো। তার পেলব হাতের মুঠি সে হাতে নেওয়ার চেষ্টা করলে যাতে তার মধ্যে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দেওয়া যায়। কিন্তু বঞ্চলা তার কাছ থেকে স'রে এলো। প্রত্যাখ্যান করায় লোকটার লালসা আরো বেড়ে গেলো। সে তার কোমর জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলে আর বঞ্চলা সোজা তার বুকে চটাশ ক'রে মারলে। লোকটার বেশ ভালোই লাগছে মনে হ'লো, যদিও গঙ্গুর মনে হ'লো আঘাতটা তার নিজের মাথাতেই যেন পড়েছে। বঞ্চলা কাজে লাগার জন্যে ফিরেছে ব'লে যে ভুল ধারণাটা তার হয়েছিলো সেটা তৎক্ষণাৎ তার উবে গেলো। আনন্দের বদলে তার মনে জাগলো প্রতিশোধস্পৃহা। তার মাথা টিপটিপ করতে শুরু করলো। আক্রোশে তার বুক ফুলে উঠলো। মনে হ'লো বঞ্চলা সাপের চেয়েও ভয়ানক। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে গিয়ে সজোরে বঞ্চলার গালে চড় কষালো সে, 'তুই আমার ভাইকে মারতে চাস্, পথে বসাবি। তার গোরের উপর নাচবি···' বঞ্চলাও সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিয়ে মারলে। যে-হিংস্রতার সঙ্গে সে গঙ্গুকে আক্রমণ করলে তাতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার কথা।

সে আসলে এসেছিলো গঙ্গুর কাছে পয়সা চাইতে। তার কেবল একটু সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিলো। কিন্তু গঙ্গুর হিংস্রতায় তারও ভিতরের রাগটা বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ পেয়ে গেলো। হাত চালিয়ে মনের জ্বালা প্রকাশ করার সে একটা সুযোগ পেলে।

অতএব দুজনে একটা উন্মাদনার মধ্যে লড়াই ক'রে চললো। রীতিমতো আগ্রহের সঙ্গেই তারা মারামারি করতে থাকল, চুল টেনে, খামচে, মুচড়ে যতক্ষণ-না ভাইয়ের প্রতি দরদ উথলে ওঠায় গঙ্গু সিদ্রাপ্পাদাকে ডাকতে শুরু করলে। গঙ্গু চায় সে এসে সাহায্য করুক, বঞ্চলার হাড় কখানা ভেঙে দিক। কিন্তু তখন অব্দি বঞ্চলাই সুবিধের অবস্থায় ছিলো। ভাইয়ের দুঃখে গঙ্গু দানবের মতো লড়লেও তাকে কিন্তু প্রচণ্ড পিট্টি খেতে হচ্ছে। মারামারির সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বঞ্চলার শরীরের নানা জায়গা উদ্লা হ'য়ে যাচ্ছিলো, দেখতে-দেখতে লোকদুটোরও কামোত্তেজনা বাড়ছিলো। বাইরের রাস্তায় গোলমালে আকৃষ্ট হ'য়ে মেয়েরা দৌড়ে গঙ্গুর কুঠির দিকে আসছিলো। পুতলা আর সিদ্রাপ্পাদা কুঠির বাইরে ভিড় হ'তে দেখে বঞ্চলাকে শাপান্ত করতে-করতে ছুটলো।

'স'রে যাও!' ভিড় ঠেলে সিদ্রাপ্পাদা ঢুকে গেলো। বঞ্চলার ঘাড় আর কোমর ধ'রে তাকে তুলে নিয়ে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিলে সিদ্রাপ্পাদা। সোনির কাছে গিয়েছিলো যে লোকটা সে এই-সব গোলমালের পুরো সুযোগ নিলে। 'কী হচ্ছে বাইরে ওখানে···'

সিদ্রাপ্পাদা এত নোংরা সব গালি দিতে থাকলো যে বেশ্যারাও লজ্জায় লাল হ'য়ে গেলো। সোনির খদ্দের বেরিয়ে এই ঘরে এসে ঢুকলো। বঞ্চলা বিছানায় প'ড়ে আছে একদম মড়ার মতো, একেবারে স্থির। মড়ার মতো শাদা হ'য়ে গেছে সে আর মড়ার মতো ভোঁতা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়ানো লোকটার দিকে। সোনি দমবন্ধ ক'রে রয়েছে। বঞ্চলা বেঁচে আছে কি মারা গেছে দেখার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু সিদ্রাপ্পাদাকে সে ডরায় তাই যেখানে আছে সেখান থেকে নড়ছে না।

'গঙ্গু, কঞ্জুশ কোথাকার, পাঁচ টাকা দে এক্ষুনি।' এইমাত্র যে-কাজটা সেরেছে তার ইনাম চায় সে।

'পাঁচ!' গঙ্গু আর্তনাদ ক'রে ওঠে। সে খানিকটা খ্যাপার মতো হ'য়ে গেছে।

'ঠিক আছে, দশ ক'রে দে তাহ'লে ওটাকে।'

গঙ্গু চুপচাপ পাঁচ টাকা তুলে দেয় তার হাতে। সিদ্রাপ্পাদা বেরিয়ে গিয়ে সামনের ভিড় হটিয়ে দেয়।

ঠিক সেই সময়ে এক পুলিশ চিৎকার করতে-করতে এসে হাজির হয়। গঙ্গুর কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে সে যাই হোক বিদেয় হয়। এবারে যে গঙ্গুর কোঠার ভাড়া নেয় সে রাগতভাবে মাটিতে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে প্রবেশ করে।

'এটা কী ধরনের ব্যাপার ? ঠিক সময়ে কখনো ভাড়া দিস্ না। পুতলাকে দূর ক'রে দিস্ না কেন ? এখানে যদি ব্যাবসা চালাতে না-চাস্ এখুনি কেটে পড়তে পারিস।' তার ইচ্ছেটা গঙ্গু পরিষ্কারই বুঝতে পারে এবং সেই মতো ইশারা করে। লোকটা পুতলার নামটা জুড়ে দিয়েছে অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আশায়। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আজকের ঘরের টাকা, জিনিশপত্রের ভাড়া, ইলেকট্রিকের টাকা দে এখুনি। এখনই চাই।'

গঙ্গু তিনটে টাকা তুলে দেয়। অবশেষে গোলমাল ক'মে এসে একটা মোটামুটি প্রশান্তি বিরাজ করে। সোনি নিঃশব্দে দ্বিতীয় লোকটাকে ঘরে নিয়ে যায়। বঞ্চলার জ্ঞান আছে কি না বুঝতে পারে না সে।

পুতলা প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে যেন একদল লোক আসে, একটা গোটা জনতা যেন তার কাছে আসে। সে শুধু চায় গঙ্গুকে খুশি করতে। আজকের পর তাকে যে একেবারে নিচে নামিয়ে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। সব চেয়ে কম দরের বেশ্যা হ'য়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে হবে। সেই জীবনের ভয়ংকর এবং ভয়াল সব ছবি তার চোখের সামনে সে স্পষ্ট দেখতে পায়।

গঙ্গু আগে তার ভাগ থেকে যে-সবের পয়সা দিতো এখন থেকে তার নিজেকেই তা দিতে হবে। ঘরের পয়সা, আশবাবের ভাড়া, ইলেকট্রিকের পয়সা।

আর অত নিচুতে সবচেয়ে বেশি সে রোজগার করতে পারবে হয়তো বারো আনা কি বড়োজোর একটাকা।

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

গারদ

হরিকান্ত জেঠওয়ানি

একটা অন্ধকার কুঠুরিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হ'লো। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে আর বিকট দুর্গন্ধেভরা একটা কুঠুরিতে। সেখানে সে প'ড়ে রইলো। উপুড় হ'য়ে, তার পা দুটো ছড়ানো, অসাড়। যখন তার ঘোরটা একটু কাটলো, সে ছুঁয়ে দেখলে তার ডান গাল, ঠাণ্ডায় জ'মে গিয়েছে। তার চোখ দুটো বোঁজা, কিন্তু তার বাঁ হাতটা অন্ধকারেই হাৎড়ে-হাৎড়ে বোঝবার চেষ্টা করলে সে কোথায় আছে। পুরোপুরি সাড় ফিরে পেতেই সে আবিষ্কার করলে যে সে একটা ঠাণ্ডা কর্কশ মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে। এখন সে তার চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলে। কুঠুরিটা অন্ধকারে ঢাকা, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না, আন্দাজও করতে পারছে না কিছুই। চোখ দুটো টনটন করছে, মাথার মধ্যে শিরাগুলো দপদপ ক'রে উঠছে যন্ত্রণায়। এইসব অনুভূতির জের হ'লো এটাই যে সে আবার তার চোখ দুটি বুজিয়ে ফেললে।

এমন আচম্বিতে ঘ'টে গেলো সবকিছু, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে, এমন হুড়মুড়-দ্রুত-গতিতে যে সে এখনও জট খুলে ছেঁড়া সুতোগুলো জুড়ে দিতে পারছে না। তার মনে হ'লো অনেকগুলো ধাপই যেন হারিয়ে গেছে। আবার তার চোখ খুললো সে। একটা কোণায় ঝাপশা মতো কারা যেন আস্তে-আস্তে আকার নিতে শুরু করেছে। সে কোনোরকমে জোর ক'রে নিজেকে ওঠাবার চেষ্টা করলে।

কনুই দুটোয় ভর দিয়ে মাথাটা সে তুললো ; মুখটা ঝুলে পড়তে চাচ্ছিলো, কোনোরকমে সে শামলালে সেটা। তারপর আবার সে তাকালে কোণটার দিকে। নগ্ন অন্ধকার যখন আস্তে-আস্তে রূপান্তরিত হ'লো বীভৎস একটা মরা আলোয়, আকারগুলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। ঝাপশা আর নেই কিছু, এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব। সে ভাবছিলো, বুঝি-বা মাত্র দু-তিনজনই আছে, কিন্তু তা নয়—সবশুদ্ধ আছে ছ-জন, জড়াজড়ি ক'রে, একসঙ্গে, যেন একরাশ আঠা দিয়ে তাদের পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখে আতঙ্ক, বিভীষিকা। এদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি, তার শাদা চুল ধবধবে, তুষারশাদা, মাথায় একটা

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শাদা ব্যাণ্ডেজের ওপর বড়ো, গোল একটা পোড়ামাটির-রঙের-ছোপের-মতো চাপবাঁধা শুকনো রক্ত।

টলোমলো পায়ে বুড়ো এগিয়ে এলো। কাছে এসে উবু হ'য়ে বসলো তার সামনে। তারপর তার ডান কাঁধে বাঁ হাতটা রেখে, নিচু নরম স্বরে, সহৃদয়-ভাবে, বললে, 'ভয় পেয়ো না, সাহসে বুক বাঁধো।'

সে কিছু বলতে পারার আগেই বুড়ো হঠাৎ তাই কাঁধ থেকে, একটু যেন অতর্কিতেই, হাত সরিয়ে নিলে, উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চ'লে গেলো কোণায়।

কুঠুরিটার ক্ষীণ আলো আরো-ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, কারণ লোহার গরাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এক ছায়ামূর্তি। ধীরে, অতি ধীরে, অবয়ব পেলো সেই ছায়া, আর সে দেখতে পেলে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক শান্ত্রী, লোহার দেয়ালের মতোই নিরেট।

এতক্ষণে, সে চেষ্টা করলে, কী ঘটেছিলো তা পর-পর সাজিয়ে গোছাতে। আংটার মতো ঘটনাগুলো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বানাতে শুরু ক'রে দিলো ঘটনাশৃঙ্খল।

পাঁচ কিলো বিদেশ-থেকে-আনা লাল আটা, তিন কিলো জোয়ার, আধ কিলো চাল আর সেই পরিমাণ চিনি···সে তার র‍্যাশন কিনেছিলো তথাকথিত ন্যায্যমূল্যের দোকানে আর আলাদা-আলাদা থলেতে রেখেছিলো তার সওদা। দোকান থেকে বেরুবামাত্র, হাওয়া চিরে বেজে উঠেছিলো সাইরেনের তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত আওয়াজ। গত কয়েক দিনেও সে কিছুতেই এই আওয়াজটায় ঠিক অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারেনি। যতবারই সে শোনে, ততবারই শব্দটা তার কাছে নতুন ভয়, নতুন আতঙ্ক নিয়ে আসে। সে ভেবেছিলো আবার বুঝি শহরে কারফিউ জারি হয়েছে। দোকানের বাইরের লাইনটা তক্ষুনি ভেঙে গিয়েছিলো, লোকে যে যেদিকে পারে ছুটছিলো আতঙ্কে। একটা হুলুস্থুল কাণ্ড।

সেও ছোটবার চেষ্টা করছিলো। অর্ধেক পথ দৌড়ে গিয়ে তার মনে পড়েছিলো র‍্যাশন কার্ডটা সে দোকানেই ফেলে এসেছে। অমনি সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, হাঁফাতে-হাঁফাতে ভাববার চেষ্টা করছিলো কী করা উচিত—দোকানে ফিরে গিয়ে কার্ডটা তুলে নেবে, না কি, ঝটপট ফিরে যাবে বাড়ি, গতিক যখন এইরকম। দোকানে ফিরে যাওয়ায় বিপদ আছে। সেনাবাহিনীকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া আছে কাউকে কারফিউ ভাঙতে দেখলেই গুলি করতে। মনে পড়তেই সে দোকানে ফিরে গিয়ে কার্ডটা নিয়ে আসার ভাবনাটা ছুঁড়ে ফেলে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করেছিলো।

কার কান্নার শব্দ তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে ফেলে তাকে আবার কুঠুরিটায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো। কোণায় যে ছ-জন ব'সে আছে, তাদেরই কেউ ভেতো স্বরে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে। হয়তো ভয়, হয়তো আতঙ্ক, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। তার মনে হ'লো এই আতঙ্ক আর বিভীষিকার অনুভূতিটাই বুঝি কুঠুরিটাকে ভ'রে দেবে, আর সব বন্দীই তাতে একে-একে ডুবে যাবে, গভীরে, অনেক গভীরে।

সেই খাদেনামানো গম্ভীর স্বরটা প্রতিধ্বনিত হ'লো, 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য !' কুঠুরির অন্ধকার প্রসার যেন ঘন থেকে ঘনতর হ'য়ে উঠলো, খাকি-রঙের দেয়াল আবার অবয়ব নিলে লোহার গরাদের কাছে, আর ভেতরকার অন্ধকার তার গর্ভের ভেতরে লুকিয়ে ফেললো সেই খাদেনামানো গম্ভীর স্বরটা···

আবার সে চেষ্টা করলে ঘটনাগুলো পর-পর সাজাতে।··· দু-হাতে ঐসব ছোটো-ছোটো র‍্যাশনের থলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটছিলো সে, তারপর যেই সে তার বাড়ির গলিটায় ঢুকেছে, অমনি ধাক্কা খেয়েছে একটা খাকি দেয়ালের গায়ে। টাল শামলাতে না-পেরে প্রায় প'ড়েই যাচ্ছিলো, কোনোরকমে শামলে নিয়ে সে শুধু দাঁড়িয়েছিলো একঝলক। দু-জোড়া শিকারী চোখ ছোঁ মেরে পড়েছে তার ওপর। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা হিমস্রোত ব'য়ে গিয়েছিলো। কানে পৌঁছেছিলো রূঢ় কঠোর কথা : 'পাকড়ো উয়ো বদমাশকো !'

তার সারা অস্তিত্বটাই শিউরে উঠেছিলো।

'শালে বেজন্মা, লুঠের মাল নিয়ে কেটে পড়ছিলো !'

দুই শক্ত থাবা তাকে পাকড়ে ধরেছিলো সজোরে। তার সারা শরীরটাই যেন গ'লে গিয়ে একদলা মোরব্বা হ'য়ে গিয়েছে। তবু সে দু-হাতে সজোরে আঁকড়ে ধ'রে ছিলো থলেগুলো।

বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলো সে, কিন্তু খাকি উর্দিপরা লোকগুলো তার কৈফিয়ৎ বা কাকুতিমিনতি কিছুতেই কান দেয়নি! ভয়ে সে কেমন আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তক্ষুনি বাঁচবার জৈবিক তাড়াই আচমকা তার ভয়কে বদলে দিয়েছিলো বেপরোয়া সাহসে। একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো, দুর্দান্ত বেগে ছুটেছিলো নিজের বাড়ির দিকে। নোংরা মুখগুলো থেকে তোড়ে বেরিয়ে এসেছিলো জঘন্য সব খিস্তি আর গালাগাল, আর তারপর তারাও ধাওয়া ক'রে এসেছিলো তাকে। তার পিঠে সজোরে পড়েছিলো বেটনের বাড়ি, কিন্তু তাতে তার গতি যেন আরো বেড়েই গিয়েছিলো। একটা হাড়জিরজিরে খেঁকি কুকুর বসেছিলো নোংরা নর্দমাটার পাশে, তাকে ছুটতে দেখেই সে খেঁকিয়ে

তেড়ে এসেছিলো ঘেউ-ঘেউ, তারপর ছুটেছিলো গলি দিয়ে। সে তখন বেদম হাঁফাচ্ছে, বিস্ফারিত নাকের বাঁশি থেকে বেরুচ্ছে একটা হিসহিস শব্দ, আরো-একটা অদ্ভুত আওয়াজ দপদপ করছে ফুশফুশে। সে একটু কমিয়ে এনেছিলো গতি, তারপরেই অতর্কিতে থেমে গিয়েছিলো পুরোপুরি। রাস্তা থেকে সে তুলে নিয়েছিলো পেল্লায় একটা পাথর, ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো, যত জোরে পারে ছুঁড়ে মেরেছিলো তাকে তাড়া-ক'রে-আসা খাকিগুলোকে। ঢিলটা কার-একটা মুখে লেগেছিলো, আর সশব্দে আছড়ে পড়েছিলো রাস্তায়, কে একজন যন্ত্রণায় হুয়ে পড়েছিলো ; শাদা মুখটা লাল হ'য়ে গিয়েছে, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের একটা ধারা, তারপরেই রক্ত ঝরতে শুরু করেছিলো টপটপ। আতঙ্কে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো। ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার ছুট লাগিয়েছিলো নিরাপদ আস্তানার উদ্দেশে। হঠাৎ একটা লাঠি ভয়ংকর জোরে পড়েছিলো তার মাথায়, টলতে-টলতে সে সংজ্ঞা হারিয়ে প'ড়ে গিয়েছিলো রাস্তায়···

আবার সে তার কাঁধে টের পেলে সেই নরম সান্ত্বনার স্পর্শ। সেই একই মোলায়েম, স্নেহভরা, প্রেরণাজাগানো স্বর শুনতে পেলে কানে : 'ধৈর্য ধরো, একটু।'

ঘটাং ক'রে লোহার দরজার তালা খোলার শব্দ হ'লো, আর একটু বীভৎস ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ ক'রে পাল্লা খুলে গেলো। কুঠুরির মধ্যে গমগম ক'রে উঠলো ভারি-ভারি বুটজুতোর জাঁদরেল আওয়াজ।

'তাহ'লে এ-ই সে, সেই বদমায়েশটা !'

শুনে তার মাথার চুল খাড়া খাড়া হ'য়ে গেলো। আতঙ্কিত চোখ তুলে সে তাকালে : কালো বুট, খাকি মোজায় পেঁচানো তাগড়াই পা, কড়া ইস্ত্রিকরা প্যাণ্ট। এর ওপরে আর চোখ তোলবার সাহস তার হ'লো না। শিরদাঁড়া বেয়ে ব'য়ে গেলো এক হিম ঢেউ ; সে তার চোখের পাতা বুজিয়ে ফেললে। ভারি জুতোর সজোরে ঠোকর খেলে সে পিঠে। আর্তস্বরে সে চীৎকার ক'রে উঠলো, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলো।

'তাহ'লে এই সেই হারামজাদা, কুত্তির বাচ্চা···'

চুলের ঝুঁটি ধ'রে তুললো তাকে, তারপর চ্যাংদোলা ক'রে তুলে দারুণ জোরে ছুঁড়ে ফেললো। তারপর শুরু হ'য়ে গেলো অনর্গল নোংরা খিস্তি।

দুজন চেপে ধরলে তার দু-হাত, মেঝেয় ছড়িয়ে চিৎ ক'রে পাতলে হাতের পাতা, তারপর ভারি বুট দিয়ে চাপ দিলে। আরো দুজন এইভাবেই বুট দিয়ে চেপে ধরলে তার গোড়ালির গাঁট।

'এর তবে গম চাই···গ-অ-অ-ম···' আনোয়ারের খ্যাক-খ্যাক হাসিতে ভ'রে গেলো কুঠুরি, আর ফাঁকা কালো দেয়ালে ঘা লেগে-লেগে ফিরে এলো প্রতিধ্বনি। মনে হচ্ছিলো যেন কতগুলো বদ্ধ উন্মাদ।

'এর আবার চিনি চাই! অ্যাঁ?···'

আবার খ্যাক-খ্যাক হাসি।

'সে চায় জোয়ার···'

খ্যাক-খ্যাক হাসি।

'যাও, নিয়ে এসে, বোয়মটা···বেজন্মাটার মুখে ঢুকিয়ে দাও পয়মাল···'

কী-একটা নরম, হলদেটে, দুর্গন্ধভরা তার মুখে ঠেসে দেয়া হ'লো। গু, মানুষের গু! সে ধস্তাধস্তি করলে, তোলপাড় করলে, কিন্তু জোর ক'রে তার মুখে গু ঢুকিয়ে দেয়া হ'লো। ভারি বুটের তলায় তার হাত-পাগুলো চেপে ধ'রে আছে কারা।

খ্যাক-খ্যাক হাসির ছেঁড়াখোঁড়া প্রতিধ্বনিগুলো মিলিয়ে যাবার পর পায়ের শব্দ দূরে চ'লে গেলো, লোহার দরজাটা বন্ধ হ'লো সেই এক বীভৎস ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ ক'রে। কুঠুরির মধ্যে ফিরে এলো স্তব্ধতা।···

সে উঠে দাঁড়ালে। মুখের মধ্যের গন্ধটা মুচড়ে দিচ্ছে পেট, নাড়িভুঁড়ি উলটে আসতে চাচ্ছে; গলগল ক'রে সে বমি ক'রে দিলে, মাথাটা ঘোরাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। সেই একই রকম সান্ত্বনার স্পর্শ পেলে সে কাঁধে, সেই একই স্বর শুনতে পেলে: 'ধৈর্য!'

ঝটকা দিয়ে সে সরিয়ে দিলে হাত, আর তারপর কোনো হেরে-যাওয়া সৈনিকের মতো টলতে-টলতে গিয়ে দাঁড়ালে লোহার গরাদের সামনে। দুদিকে সে ছড়িয়ে দিলে হাত, সরলরেখায়, সটান, আর আঁকড়ে ধরলে ঠাণ্ডা লোহার গরাদগুলো। তার মনে হ'লো, সে যেন এইভাবেই স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে কোন্ অনাদিকাল থেকে।

তার মুখ অচঞ্চল, সুস্থির, প্রশান্ত, যেন কোনো শিশুর মুখের মতো, কিন্তু তার রক্তরাঙা চোখ—ক্রোধে প্রজ্বলন্ত—স্থির আটকে রইলো করিডরে দাঁড়ানো শান্ত্রীর রাইফেলটার ওপর। যেন আধুনিক কোনো জিশু খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা বন্দুক।

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাপতন

লক্ষ্মীনন্দন বরা

শিলপুখুরি, মাজগাঁও আর জামুগুড়ির লোকরা হয়তো এর মধ্যেই বলতে শুরু করেছে যে আমাদের অঞ্চল থেকে একজন মন্ত্রী হয়েছে ব'লেই আমরা অন্যদের চেয়ে বেশি সুযোগসুবিধে পাচ্ছি। এই তিনটে গ্রামেই পানীয় জলের বিষম অভাব। ফাগুন-চোত মাসে পুকুরগুলো সব শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করে। এবার জামুগুড়ির লোকদের এমনকী ঝাঁজি থেকে জল ব'য়ে নিয়ে আসতে হয়েছিলো। এই অবস্থায় সে-সব জায়গায় গভীর নলকূপ না-বসিয়ে বসানো হ'লো কিনা সরাসরি আমাদেরই অঞ্চলে। তবে, আমি অবশ্য বলি যে, মোটেই কোনো পক্ষপাতিত্ব হয়নি। ঐ গ্রামগুলোয় কি কোনো মহাবিদ্যালয় আছে? হাইস্কুল আছে? উন্নয়নখণ্ড আছে? ব্যাংকের শাখা আছে? বিজলি বাতি আছে? আমরা যেখানে আছি, সেই এলাকাটা দ্রুত শহর হবার দিকে ধাবমান। একটা টাউন কমিটি হ'লেই, আর সরকার থেকে হুকুম এলেই, আমাদের এখানকার সবাই পুরোদস্তুর শহুরে হ'য়ে যাবে। এ যে হ'তে চলেছে, তাতে আমাদের এখানকার মানুষজনের যে কোনো গুণই নেই তা তো নয়।

তবে, একটা কথা। শহরে পরিণত হ'তে শুরু করলেই অভূতপূর্ব এককেটা কাণ্ড ঘটবেই। সে-সব কাণ্ড বড়োই মুখরোচক, বহুৎ বঢ়িয়া চীজ। নলকূপ বসানো হবে ব'লে হুকুম হবার পরেই আমাদের এখানে এমন-সব যন্ত্রপাতি এসে হাজির, যা আমরা বাপের জন্মেও দেখিনি-শুনিনি। কয়েক হপ্তা ধ'রে অনবরত চলতে থাকলো যন্ত্রের গুমগুম শব্দ, হরেক রকমের পোশাক পরা হরেক রকমের লোকজন এলো। ইঞ্জিনিয়ার থেকে মেশিনিস্ট অব্দি কী নয়! গভীর নলকূপে জলের দেখা পাওয়া গেলো অনেক নিচের স্তরে। ঠাণ্ডা ফটফটে স্বচ্ছ জল। কিন্তু কেবল জলের দেখা পাওয়া গেলেই কি আর হবে? এই জল তো প্রত্যেক বাড়ির লোককে পেতে হবে। গভীর নলকূপে জল বেরুবামাত্র ধুমধাম ক'রে আরেকটা কাজ শুরু হ'য়ে গেলো। আরো-একদল লোক এসে হাজির। তারা শশীপ্রভা বরুয়া মহাবিদ্যালয়, আদর্শ বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্টেট-

ব্যাংকের মধ্যকার ফাঁকা জমিটায় একটা জল জমা রাখবার জন্যে ট্যাংক তৈরি করার জোগাড়যন্ত্র করলে। ট্যাংক বলতে ট্যাংক—সে এক ইলাহি কারবার! যেন একটা আস্ত পুকুরই হবে আয়তনে। ট্যাংকটা আবার থাকবে মাটি থেকে অনেকখানি ওপরে, তবেই না ওটা থেকে তোড়ে নেমে আসতে জল জোর পাবে। মস্ত জোর! এত জোর যে তার গায়ে লাগানো নল দিয়ে জল ব'য়ে গিয়ে ঘরে-ঘরে গিয়ে সে-জল উপচে পড়বে। ট্যাংকে জল ধরবে প্রায় ষাট হাজার গ্যালন! খরচ প্রায় দেড় লাখ টাকা!

এই মস্ত কাজটা সম্পন্ন করতে এলেন অভিযন্ত্রী ভজহরি শইকিয়া, সহকারী অভিযন্ত্রী রূপন কাকতি, নিম্ন অভিযন্ত্রী গণেশচাঁদ কাকতি ও জনাকয়েক মুহুরি। ঠিকে পেয়েছে ঠিকাদার মীনারাম কলিতা—সে এমনকী যে-কোনো বাঁধেই জল-কপাট বসাতে সক্ষম। কাজ দমাদ্দম এগুতে লাগলো। ইস্পাতের রুপোলি আবরণ থাকা ষাট হাজার গ্যালন জল মজুত রাখার উপযোগী ট্যাংকটা সুপুরি গাছের চাইতেও উঁচুতে রৌদ্র আর জ্যোৎস্নায় স্বমহিমায় বিরাজ করতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে, ভোজবাজির মতো, আমাদের জায়গাটার চেহারাও যেন খুলে গেলো। শশীপ্রভা বরুয়া মহাবিদ্যালয় এবং আশপাশে থাকা প্রতিষ্ঠান ক-টারও হাল-হকীকৎ ভারিক্কি ও আধুনিক হ'য়ে পড়লো, চকচকে রুপোলি ট্যাংকে শুরু হ'লো কাকদের গুলতানি, নিঃঝুম দুপুরে কবুতরের বকবকম। এরই মধ্যে ট্যাংকের গায়ে এঁটে দেয়া হ'লো জলবহনের নলগুলোকে।

এখন শুধু আমাদের জনসাধারণের বাড়িতে ব'সে-ব'সে গভীর নলকূপের নির্মল ঠাণ্ডা জল পান করার ওয়াস্তা। তার জন্যে অবশ্য চাই একটা শুভদিন—দিনক্ষণ দেখে পাঁজিপুথি ঝেড়ে বার করা চাই শুভলগ্ন—আর দরকার শুভ উদ্বোধনেরও মহোৎসব। আমাদের অঞ্চলটা যে এভাবে জল ব্যবহার করার সুযোগ পাবে, তার মূলে আছে নলকূপ থেকে ট্যাংক নির্মাণ অব্দি কয়েক লক্ষ টাকার বহুমূল্য প্রকল্পটা। কাজেই যাকে-তাকে দিয়ে এর উদ্বোধন করানো চলে না। আজকের যুগটাই হ'লো সভাসমিতির যুগ, প্রস্তাব 'রাখা' ও গ্রহণ করার যুগ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যুগ। কাজেই পঞ্চায়েতের সদস্যরা ও ভজহরি শইকিয়া সহ দুজন অভিযন্ত্রী এবং আমাদের অঞ্চলের অন্যান্য তালেবর লোকদের একটা সভা বসলো। সেই সভায় গঠন করা হ'লো একটা উপসমিতি। এই উপসমিতির ওপর, বিস্তর আলোচনার পর, উদ্বোধনী পর্বের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'লো। মন্ত্রী পঞ্চানন শইকিয়াকে ট্যাংকটার কাজের উদ্বোধন করার জন্যে

আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উপসমিতি। এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে ব'লে আমরা একে স্বাগত জানালাম। কারণ শইকিয়া যদি মন্ত্রী না-থাকতেন, তবে সরকারবাহাদুর এত খরচ ক'রে আমাদের এতখানি সুবিধে পাইয়ে দিতে চাইতেন না। মন্ত্রীরা বড়ো ব্যস্ত মানুষ, ব্যস্ততা দেখে বোঝবার জো নেই কে বড়ো মন্ত্রী আর কে ছোটো মন্ত্রী। তবে আমাদের শইকিয়া সাহেব আবার অন্য মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত। সেই জন্যে এখন অব্দি তিনি দুটো তারিখ বদলেছেন, তবে শেষটায় আরেকবার দিনক্ষণ দেখে আরেকটা তারিখ দিয়ে তিনি তাঁর সময়ও বেঁধে দিলেন। সেই তারিখটা হ'লো ফেব্রুয়ারির চোদ্দ। উদ্বোধনের সময় সকাল সাড়ে-আটটা। আর সেই শুভক্ষণ থেকে আমাদের কাহিনীরও সূত্রপাত।

জলাধার উদ্বোধনের প্রকৃতি অন্যান্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের চাইতে অন্যরকম— সেতু, স্কুল, কলেজ ইত্যাদির উদ্বোধনের মতো নয়। প্রধান পাইপটা জলাধারে ঢুকেছে। নলকূপ থেকে এই পাইপের মধ্য দিয়েই জল ট্যাংকি বা জলাধারে গিয়ে উঠবে। ট্যাংকির খুব কাছেই আছে পাইপ বন্ধ করা ও খোলার একটা ভাল্ব। এই ভাল্ব যেহেতু মাটির নিচে, সেটা বন্ধ করা বা খোলবার ব্যবস্থা ওপর থেকেই করতে হবে। তাই ভাল্বের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে একটা চাকা, এই চাকাটা আবার বনমতো জায়গাটার গায়ে লেগে আছে; একে ডান দিকে, অর্থাৎ ক্লকওয়াইজ ঘোরালে, ভাল্ব খুলে ট্যাংকিতে জল ওঠবার কথা। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পঞ্চানন শইকিয়া এই চাকাটা ডান দিকে ঘোরালে একটু পরেই ট্যাংকিতে জলের কলরোল শুরু হবার কথা।

এতক্ষণ তো নেহাৎই কলকব্জার কথা হ'লো; এবার বরং আসল কথায় আসি। অফিসার এবং যাবতীয় তালেবর ব্যক্তি সকাল আটটাতেই ট্যাংকির কাছে এসে হাজির। আমাদেব অঞ্চলে জল সরবরাহের এমন ব্যয়বহুল ব্যবস্থা যথেষ্ট অভিনব। তাই কাতারে-কাতারে দর্শকও এসে হাজির। এদিকে মন্ত্রীকে মালা পরাবার জন্যে, আপেক্ষিকভাবে, রূপসী যুবতী, পঞ্চায়েতের সভাপতি ধৈর্য মেধীর মেয়ে কুমারী কনকা মেধী, মুখে ফুসকায়িত মৃদু হাসি ও হাতে মালা নিয়ে অপেক্ষারতা। পরেছেও ভুবনভোলানো সাজ (শশীপ্রভা বরুয়া মহাবিদ্যালয়ের সংগীত শাখার সম্পাদক হেমন্ত মন্দিকৈ-এর যত্নে)।

পঞ্চানন শইকিয়া বাতাবি লেবু গাছের নিচের পূর্তবিভাগের পরিদর্শন বাংলোয় পদার্পণ করলেন। সেখান থেকে গায়ন-বায়নের মাধ্যমে তাঁকে বরণ ক'রে নিয়ে

আসা হ'লো। খোলে বোল দিলেন খিতাই কাকতি ও মণি চমুয়া। তাল ধরলেন গুণেশ্বর সাতোলা, গায়েন তো একজনই, যানে আমাদের সবেধন নীলমণি মুকুন্দ কলিতা : সুন্দর আয়োজন। তিনি গান ধরেছেন 'কুণ্ডিলক আওত মোহন মুরারি,' সে-গান শুনে আমার কান দুটো বেজায় ঝনঝন ক'রে উঠলো। গানটা বেশ সুমধুর, খোল-তালে মুকুন্দ কলিতার গলা বেশ ভালোভাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু এর অর্থ যে সম্পূর্ণ অন্তরকম। 'মোহন মুরারি' কুণ্ডিলতে এসেছিলেন রুক্মিণী মায়ের পাণিগ্রহণ করতে আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী পঞ্চানন শইকিয়া এসেছেন জলসরবরাহপ্রকল্পের শুভারম্ভ করতে। মন্ত্রী শইকিয়া কি মোহন মুরারি হ'তে পারেন? সেই গুণ তাঁর আছে কি নেই সে এক বিতর্কের বিষয়। তাঁর উচ্চতা (৫' ৯") ও রোদে-কখনও-বেরুতে-হয়-না-গোছের মিহি চামড়া ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলো প্রথম-বারের মতো দেখে আমি কিন্তু পুলক অনুভব করতে পারলাম না! পাৎলা চুলের মাথাটার প্রকৃত আকৃতি ভালো ক'রেই চোখে পড়ে। প্রশস্ত অনুন্নত নাসিকা, গালের বেরিয়ে-থাকা হাড় দুটো ও মুখের শিথিল মাংসপেশীর পঞ্চাশোর্ধ্ব পঞ্চানন শইকিয়াকে কোনো দৈত্যদানবের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। ওপরে-ঠেলে-বেরুনো বেড়ালচক্ষুদুটোর জন্যেও তাঁকে একটা হিংস্র জন্তু ব'লেই মনে হয়। আমার মনে হচ্ছিলো কানাড়া পরিতালের উদ্বোধনী সংগীতটা হওয়া উচিত ছিলো এইরকম : 'আরে রাজসিংহ দৈত্যরাজ...'

কুমারী কনকা মালা পরালে। ধৈর্য মেধী জলাধার নির্মাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু 'বক্তব্য রেখে' তারপর ইঞ্জিনিয়ার ভজহরি শইকিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মন্ত্রী শ্রী পঞ্চানন শইকিয়ার উদ্বোধনী ভাষণ আরম্ভ হ'লো :...'এই জলে আর রোগের জীবাণু থাকবে না, ময়লা থাকবে না, আবর্জনা থাকবে না—এখন আর আমাদের গ্রামবাসীদের একটামাত্র পুকুরে কাপড় কাচতে হবে না, একটা-মাত্র পুকুর থেকেও জল খেতে হবে না, এখন পুকুরগুলো শুধু গোরুমোষের জন্যেই থাকবে। আমার একান্ত বিশ্বাস, এখন জনসাধারণের অসুখবিসুখ কমবে ও মৃত্যুর সংখ্যাও কমবে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিশেবে এসে আমি নিজে ধন্য বোধ করছি। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিই। মৃত্যুর সংখ্যা কমা মানে লোকসংখ্যা বাড়া। লোকসংখ্যা অর্থাৎ বর্ধিত লোকসংখ্যা হ'লো দেশের দারিদ্রের প্রধান কারণ। তাই ব'লে আমি অবশ্য এই ট্যাংকটা ভেঙে ফেলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াতে বলছি না। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিশেবে আমি বলতে চাই যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে না-পারলে গভীর নলকূপের বিশুদ্ধ জল পান করলেও আপনাদের সদগতি হ'তে পারে না।

কাজেই বিয়ে-শাদি পেছিয়ে দিন, একটার পরেই আরেকটা পাবার কথা ঠিক এখনই ভাববেন না…'

ইত্যাদি মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রীমহোদয় অতঃপর সেই ভাল্‌ব-লাগানো চাকাটা বিপুল হাততালির মধ্যে ঘুরিয়ে দিলেন। পাইপের জল উর্ধ্বগতি লাভ করলো। ট্যাংকি থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। সেই সঙ্গে দেখা গেলো ইঞ্জিনিয়ার ভজহরি শইকিয়া ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মুখে শ্রমের আনন্দ ও তৃপ্তি বিরাজ করছে।

এই শতাব্দীর সত্যিকার নায়ক হলেন মন্ত্রীরা। তাঁরা বড়ো ব্যস্ত মানুষ। আমাদের পঞ্চানন শইকিয়া আরো ব্যস্ত মানুষ। তিনি চ'লে গেলেন কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-নটায়। আমাদের এখানে প্রায় আধঘণ্টার মতো ছিলেন। মন্ত্রী চ'লে যেতেই জায়গাটা আবার স্বাভাবিক হ'লো। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করলো। শশীপ্রভা বরুয়া মহাবিদ্যালয়ে এখন আবার যৌবনের কলতান। রাজেনের পাঁচমিশেলি জিনিশের মনোহারী দোকানটায় আগের মতোই আবার চুটিয়ে আড্ডা বসলো। বরুয়ার খিলি পানের দোকানের সামনে পরচর্চাও শুরু হ'য়ে গেলো। দশটা বাজার আগেই অন্য দিনের মতো রূপসী মেয়েগুলো রাস্তায় মহড়াবিনাই অপ্সরার ভূমিকা পালন করলে। রাস্তায় সাইকেল-আরোহীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো। মানুষের এই ব্যস্ততাও সাময়িক দুর্বলতার সঙ্গে অনাহত জীবনপ্রবাহের সাক্ষী হ'য়ে থাকলো জায়গাটায় গম্বুজের-মতো-প্রাধান্য-লাভ-করা জলের ট্যাংকিটা, যার গর্ভে একটু পরেই ষাট হাজার গ্যালন বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জল স্থিতি লাভ করবে।

কিন্তু উদ্বোধনী পার হবার তিন ঘণ্টা পরেই আমাদের অঞ্চলের সবাই প্রলয় আরম্ভ হবার সময় যেমন হয় ঠিক তেমনি আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে পড়লো। হঠাৎ আশপাশের তিন-চারটে গ্রামের সবচেয়ে কালা লোকটিরও কর্ণগোচর হবার মতো একটি ভয়ালভয়ংকর করাল শব্দ! ধ্বংসের পূর্বাভাস-দেয়া এই বিকট শব্দ মেদিনী কাঁপালো, কানে তালা লাগালো, রক্ত জল ক'রে দিয়ে গেলো! ধিতাই কাকতি আর ধৈর্য মেধী ছিলেন ডাকবাংলোয়। ধিতাই কাকতি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে বলেছিলেন, 'প্রলয়ের পূর্বক্ষণে এ-রকম আওয়াজ হবে ব'লে করমুণ্ডের গোঁসাই বলেছিলো। আমি ভেবেছিলাম নরসিংহ অবতার আবির্ভূত হ'য়ে এ-রকম একটা চীৎকার দিয়েছিলেন। এই চীৎকারে মেয়েদের গর্ভের সন্তান নাশ হয়েছিলো।'

এই নাদ শুনে আমাদের শশীপ্রভা বরুয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দ্বিতীয়বার হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হবার উপক্রম হ'লো। প্রথম স্ট্রোক হয়েছিলো পাঁচ মাস আগে—মানে সেই তখন—মধ্যম কন্যা কণিকা বসন্ত ঠিকাদারের স্কুটারের পেছনে উঠে পৃথিবীটাকে তীব্রবেগে দেখতে আরম্ভ করার দিন থেকে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের ব্যাপারটা ছাড়াও মহাবিদ্যালয়ে আরো অঘটন ঘটলো।

রসায়ন বিভাগের প্র্যাকটিক্যাল করছিলো মিস্ পল্লবী ফুকন, তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুলো এবং অচেতন হ'য়ে প'ড়ে পল্লবী ধড়ফড় করতে আরম্ভ করলো। সুন্দরী মেয়েটির পুরোনো মৃগীরোগ আবার দাঁত খিঁচিয়ে উঁকি দিলো। মিস্ গীতিমণি ওরফে কেঁচি হেণ্ডিক পরীক্ষানলে গন্ধকাম্ল বা ডাইলিউটেড সালফিউরিক অ্যাসিড যখন ঝাঁকুনি দিচ্ছিলো তখনই এই প্রলয়ংকরী শব্দটা হ'লো। কেঁচি হেণ্ডিকের হাত ফসকে পরীক্ষানল প'ড়ে গেলো, ড্যানার একটা দিক পুড়লো। বিশেষ অনিষ্ট হ'লো তার জন্যে দিল্লির কোনো-একজন দাদার পাঠানো উইলি শাড়িটার। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ের, পল্লবী ফুকনের বা কেঁচি হেণ্ডিকের, তত্ত্বাবধান করবার মতো কেউই ছিলো না আশপাশে। সবাই শব্দটাকে অনুসরণ ক'রে ঐদিকে ধাবিত হয়েছে। হয়তো মোহন মুরলি শুনে গোকুলের গোয়ালিনি একদিন এভাবেই বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হয়েছিলো। ওভারসিয়ার বিবুধ সেনাপতি ওরফে বক্রাসুর 'রয়্যাল এন্‌ফিল্ড' হাঁকিয়ে তীব্র বেগে নিমাতী ঘাটের দিকে আসছিলো—আর্মি ব্যারাক থেকে রামের বোতল আনতে। কিন্তু এই অলুক্ষুনে শব্দটাই কাল হ'লো। বক্রাসুর দুটো হাত ছেড়ে দিলে আর একটা খালে প'ড়ে ছটফট করতে শুরু করলে—আর মোটরসাইকেলটাও বলি-দেয়া পাঁঠার ছিন্ন অংশের মতো কাঁপতে থাকলো। কিন্তু এই কাণ্ড কারু চোখে পড়লো না।

শব্দটা আদর্শ বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানকী গগৈএরও কর্ণগোচর হ'লো। শব্দটা শোনবামাত্র তাঁর পিত্ত উত্থিত হ'য়ে বুকে ধাক্কা মারলে। এইসময় উন্নয়নখণ্ডের অফিসার রিপুঞ্জয় সহরিয়ার কাছ থেকে গ্রামসেবিকা গেলোকি গোঁসাই ও মহিলা উন্নয়ন অফিসার ডালিমা ভরখঠরা ওরফে হেমা মালিনী দৌড়ে পালালে। সহরিয়া অজান্তেই তাদের পেছন নিলে। উদ্দেশ্য একই।...

এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী শব্দ এভাবে অনেকেরই বিষম ক্ষতি ক'রে গেলো। কতটা ক্ষতি হয়েছিলো, তার সঠিক হিশেব আজ অব্দি জেলা স্বাস্থ্য অফিসার বা জেলাপরিসংখ্যান অফিসার দিতে পারেননি। কিন্তু একটা কথা

নির্বিবাদে বলা যায় যে 'দৈনিক পারিজাত'-এ প্রকাশিত বিবরণের চেয়ে ঘটনাটা এবং ঘটনার পরিণাম বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সবাই শব্দ অনুসরণ ক'রে এসে দেখতে পেলে যে একটু আগের মহাপ্রতাপাদিত্য দৈত্যরাজ এখন ধরণীতলে শায়িত। দৈত্যরাজের মুখ থেকে ফেনা ও লোল বেরিয়ে এসে আশপাশে এক হাঁটুর মতো জল হয়েছে। অর্থাৎ, তিন ঘণ্টা আগে শুভ উদ্বোধন-হওয়া জলাধারটা পরিপূর্ণভাবে জল ধারণ করতে না-পেরে বিকট-বিকট নিনাদ ক'রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং তারপর সে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। লোহার খুঁটিগুলো মচকে দুমড়ে গিয়েছে, বৃহৎ জলাধারটি মাটিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে বিকৃত রূপ ধারণ করেছে এবং তার ভেতরের জল চারদিকে উপচে পড়েছে, সবাই হায়-হায় করছে। দু-একজন অদৃষ্টবাদী বলছেন, আমাদের এই অঞ্চলের প্রতি বিধাতার কোপবঙ্কিম কটাক্ষপাত হয়েছে। কেউ-কেউ বলছেন, একেই বলে আধুনিক কারিগরদের কেরামতি।

এই মহাপতন আমাদের অঞ্চলে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। খবরকাগজের লোক এসে ভেঙে-পড়া জলাধারের ছবি তুলে নিলে। শশীপ্রভা বরুয়া মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করলে। তাই দেখে আদর্শ বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও একদিন প্রতীক ধর্মঘট করলে। জনতাও ছাত্রআন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানালে। এইসব দেখেশুনে আমাদের বড়োই সন্তোষ হ'লো। তবে সবাই একটা বিষয় লক্ষ ক'রে আশ্চর্য হ'লো। ধৈর্য মেধী সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কোনো খবরই নেই, কারণ এই নেতারা জানেন যে আজকাল কমিশন বসানো না-হ'লে কর্মচারীরা নিজেদের কাজকর্ম করতে চায় না। তার প্রমাণ আছে। তার ফলে বাঁধগুলো বন্যা রোধ-করার বদলে বরং বন্যা বাড়িয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে দেশ গড়ার কাজে প্রধান বৈরী হ'লো এই ইঞ্জিনিয়ারগুলো। এদের অবহেলা আর দুর্নীতির জন্যই আজ দেশের প্রধান-প্রধান আভিযান্ত্রিক প্রকল্পগুলোয় ঘুণ ধরেছে।

প্রথম পর্যায়ের ছাত্রআন্দোলনে কারু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। প্রথম পর্যায়ে কিছু না-করাটাই আজকাল সরকারি নীতি হ'য়ে পড়েছে। কাজেই ছাত্ররা তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন করবে না ব'লে স্থির ক'রে দ্বিতীয় পর্যায়েই যখন প্রথম দু-দিন পিকেটিং এবং পরে অনশন ধর্মঘট শুরু ক'রে দিলে, তখন সরকারের টনক নড়লো। দোষীকে শাস্তি দেয়া হবে ব'লে ছাত্রদের একটা সামান্য আশ্বাস দেয়া হ'লো। কিন্তু বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্য ত্রিদিব

বন্যার জলাধার পতনের স্থান দেখতে এবং বিস্তর খোঁজখবর নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করাটা প্রশাসনকে বিপাকে ফেললো। কারণ একটা দুর্নীতির সঙ্গে প্রশাসনের আরো-কয়েকটি বিভাগও জড়িত থাকতে পারে। শেষে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিলে। বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা শামসুদ্দিন আমেদ বললেন, 'আমাদের জানা তথ্য অনুযায়ী বোঝা যায় যে এই সরকার দুর্নীতিকে আশ্রয় দিচ্ছেন, যার ফলে কোনো-কোনো বিভাগের আর্দালি-চাপরাশিরাও সকালে-বিকেলে জলপানের সঙ্গে আপেল-বাদাম-পেস্তা খেতে সক্ষম হচ্ছে। শোনা যায় দুর্নীতির জগতেও কিছু-কিছু অলিখিত নীতি আছে। যে-সব বিভাগ রাস্তাঘাট বানায়, তাদের বিভাগের কাণ্ডকারখানা এই ট্যাংকি নির্মাণেও চলেছে। আজকাল দরপত্র গ্রহণ ক'রে কাজটা দেবার সময় শতকরা পঞ্চাশভাগ টাকা বিত্ত অফিসার থেকে শুরু ক'রে সকলের মধ্যেই ভাগবাঁটোয়ারা করা হয়। রূপ দৈ-র বাঁধ, অন্যান্য বাঁধ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের ঘরদোর তৈরি ইত্যাদি থেকে দেখা যায় যে শতকরা কুড়ি ভাগ টাকার মাত্র কাজ হয়েছে। এইই হ'লো গান্ধি, বিনোবা ভাবে আর বিবেকানন্দর দেশের নৈতিকতা। এখন আমাদের কথা হ'লো, আমাদের অঞ্চলের ট্যাংকি ভেঙে-পড়ার বিষয়ে সরেজমিন বিস্তারিত তদন্ত করতে হবে…'

ট্যাংকি বিভ্রাটের জন্যে ছাত্রআন্দোলন, সংবাদপত্রের বিরূপ আলোচনা ও বিধানসভার বিরোধী সদস্যদের নাটকীয় প্রতিবাদের ফলস্বরূপ তিনজন সদস্য নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হ'লো। দুটি অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের দুজন অধ্যক্ষ কমিটির (রসিকরা মহাপতন কমিশন ব'লে নাম দিয়েছিলো) সদস্য হলেন, মুখ্য অভিযন্ত্রা শ্রী মুরলিমোহন চক্রবর্তী হলেন কমিশনের সভাপতি।

পরিদর্শন বাংলো ও আবর্তভবনে নানা ধরনের পানীয়ের সমাহার নিয়ে মহাপতন কমিশন কাজ শুরু ক'রে দিলে। প্রথমে ভূলুণ্ঠিত জলাধারের আয়তন, ইস্পাতের গুণাগুণ ও লোহার খুঁটিগুলোর উচ্চতা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেনে নেয়া হ'লো। তারপর আর্দালি-পিয়ন থেকে শুরু ক'রে কার্যকরী অভিযন্ত্রা ভজহরি শইকিয়া পর্যন্ত এবং অ্যাকাউটেন্ট জীবকান্ত বড়দলৈ থেকে ঠিকেদার মীনারাম কলিতা পর্যন্ত অনেককেই কমিশনের সামনে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লো।

অবশেষে মহাপাতন কমিশনের শেষ বৈঠক বসলো। কমিশনের সভাপতি মুরলিমোহন চক্রবর্তী বৈঠকের সমাপ্তিতে বললেন,…'আমিও অধ্যক্ষ বরকটকীর মতো মনে করি যে যুবক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমান ভজহরি শইকিয়া অতি প্রতিভাবান

ব্যক্তি—এ রেয়ার জিনিয়াস। ইতিমধ্যে আমরা অধ্যক্ষ দত্তচৌধুরীর কথাও মেনে নিয়েছি। ভজহরি শইকিয়া ট্যাংকের ওজন হিশেব ক'রে খুঁটি পুঁতেছিলেন, ট্যাঙ্কে জল উঠলে তার আসল ওজন কত হ'তে পারে তার কোনো গণনা করেননি। তার ফলেই এ-রকম হ'লো। তাই আমি অধ্যক্ষ বরকটকীর কথায় সায় দিয়ে বলি যে এ-রকম ভুল কেবল কোনো বিরল প্রতিভার ক্ষেত্রেই—ইন দি কেস অভ এ জিনিয়াস ওনলি—হ'তে পারে। তার প্রমাণ হ'লো সার আইজাক নিউটন। তাঁর গবেষণাগারে দুটো বেড়াল ঢুকেছিলো। একটা ছোটো আরেকটা হোঁৎকা। গবেষণাগারে কোনো জানলা ছিলো না—শুধু একটা বড়ো ঘুলঘুলি ছিলো। সেই ফুটো দিয়ে দুটো বেড়ালের একসঙ্গে আসতে খুব মুশকিল হ'তো। নিউটন বড়ো বেড়ালের জন্যে একটা বড়ো ফোকর আর ছোটো বেড়ালের জন্যে একটা ছোটো ফোকর তৈরি ক'রে দিলেন। পরের দিন মিস্ত্রি তাই দেখে বললে—"সার, বড়ো কাঁচা কাজ হ'লো। কারণ বড়ো ফোকরটা দিয়ে আগের মতোই ছোটো বেড়ালটাও আসবে।" নিউটন তেলেবেগুনে জ'লে উঠে বলেছিলেন—"এটা আবার কোন্ সূত্রে হ'তে পারে?" '

অধ্যক্ষ দুজন না-হেসে গম্ভীর মুখে ব'সে রইলেন। অধ্যক্ষ দত্তচৌধুরী এ-কথায় সায় দিয়ে আবার বললেন, 'কবি কালিদাসও এ-রকম ভুল করেছিলেন। গাছের যে-ডালে বসেছিলেন, সেই ডালটাই তিনি কাটছিলেন। এ-রকম মহৎ মূর্খতা কেবল মহৎ লোকেরাই করতে পারেন।'

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রস্তুত হ'লো। ভজহরি শইকিয়া জিনিয়াস আখ্যা পেলেন এবং চাকরি জীবনের প্রথম ভুল দিয়ে হাতেনাতে এর প্রমাণ দিলেও তাঁকে রেহাই দেয়া উচিত নয় ব'লে কিছু শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হ'লো। এই প্রতিবেদনের ফলে আমাদের অঞ্চলের সবাই একদিন শুনে আশ্চর্য হ'লো যে তদন্ত কমিশনের নির্দেশমতো জলাধার-নির্মাতা ভজহরি শইকিয়াকে বদলি করা হয়েছে। কেউ-কেউ অবশ্য বললে যে গৃহমন্ত্রী বৈকুণ্ঠ বরুয়ার ভগ্নীপতি ভজহরি শইকিয়াকে এতে লাথি মেরে গঙ্গায় ফেলে দেয়া হ'লো।

অনুবাদ : অরিজিৎ চৌধুরী

কাক

ঘনশ্যাম দেশাই

আমি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম। বাঁদিকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থমকে আছে। শাদা ফেনায় মোড়া ঢেউগুলো যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে, আঁকাবাঁকা নানা খাঁজখোঁজ, হাওয়ায় ভাসছে জলের কণা, কোথাও উপরে উঠছে, কোথাও নিচে পড়ছে। সমুদ্রের নিচের দিকটাকে দেখাচ্ছে ভাঙাচোরা লাইনে আঁকা ড্রয়িং-এর মতো। হাওয়া থেমে গেছে, ডানদিকে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ঝাউয়ের সারি, এত স্থির যে মনে হয় আকাশের গায়ে পেরেক ঠুকে ঝোলানো রয়েছে গাছের দৃশ্যপট। তীরে চকচক করছে হলুদ বালি—শয়ে-শয়ে ঝিনুকে-শঙ্খে মিলে তৈরি হয়েছে এক একটা আলপনার ছাঁদ, কোথাও লেগেছে নানা রঙের ছোপ। কিন্তু একটাও পোকামাকড় নেই কোথাও, একটা গর্ত পর্যন্ত না। ভিজে বালিতে আমি শুয়ে আছি একেবারে একা। হাত-পা খানিকটা ক'রে বালিতে ডোবানো, নাড়াবার উপায় নেই। গায়ে লেগে আছে ছোটো-ছোটো বালির চাবড়া। বালি ফুঁড়ে এক জায়গায় বেরিয়ে পড়েছে ফ্যাকাশে পায়ের আঙুলগুলো. গায়ে-গায়ে লেপ-টানো, ডগার দিকটা একটু বাঁকা, সম্পূর্ণ অসাড়, যেন অন্য-আর-কারু আঙুল।

এরই মধ্যে একফাঁকে সামনের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটা ছোট্ট কালো বিন্দু চোখে পড়ল। চারপাশের উজ্জ্বল আলোয় বেশ স্পষ্ট। হলুদ রঙের ছোপ লেগে এটাও হলুদ হ'য়ে যাবে না তো—আমার ভয় হ'লো। সোজা তাকিয়ে রইলাম বিন্দুটার দিকে। মন দিয়ে দেখতে-দেখতে মনে হ'লো বিন্দুটা বড়ো হ'য়ে যাচ্ছে। আর যেন ওটা আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। কৌতূহল বাড়ল। দেখতে-দেখতে বিন্দুটা বড়ো আরো-বড়ো হ'য়ে গেল। দুরন্ত বেগে হাওয়ার দাপট শুরু হ'লো। গাছের ঝোলানো পর্দায় শোঁ-শোঁ আওয়াজ হ'তে লাগল, সমুদ্রের ঢেউ যেন গ'র্জে উঠল উপরের দিকে। বিরাট এক চক্কর খেয়ে সেই বিন্দুটা নেমে এল সমুদ্রের জলের উপর, সাঁৎরে এগিয়ে আসতে থাকল আমার দিকে। তারপর তীরে এসে ঠেকল।

আর তখন বুঝলাম ওটা সাধারণ মাপের একটা কাক। বুকটা টান-টান ক'রে

বাইরের-দিকে-বের-ক'রে হাঁটছে, সমস্ত সমুদ্রটাকে যেন টেনে তীরে তুলে নিয়ে আসবে। পেছনে সমুদ্র, সামনে ঐ কাক, এইভাবেই হেঁটে চলল কিছুক্ষণ। লাফ দিতে-দিতে একেবারে আমার গায়ের মধ্যে চ'লে এল।

গায়ের রঙ গাঢ় কালো। ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে দিয়ে সোজা তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কিন্তু চোখ দুটো দিয়ে দেখছে অন্য-কোনোদিকে। সরল শিশুর মতো দেখাচ্ছে এখন ওকে। হঠাৎ আওয়াজ করল কুর্‌র্‌র্ কুর্‌র্‌র্। ঠোঁটের পেছন দিকে জিভের চাপ দিয়ে আবেগ প্রকাশ করছে। তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে আমার হাঁটুতে এসে বসল। পায়ের ধারালো নখের চাপ পড়ল হাঁটুতে। একটু যেন কড়মড় শব্দ হ'লো। এত জোরে চাপ দিচ্ছে যে মনে হ'লো যেন হাঁটুর হাড় গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম তখন। আমার ধারণা ভুল। মোটেই সাধারণ কাক নয়। থাবায় যেন অসুরের জোর। চোখ দুটো এখন ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে, গোল্লাগুলো দ্রুত ঘুরছে যেন চাপা কোনো তীব্র বাসনায়। এ-সব সত্ত্বেও আমি হয়তো অত ভয় পেতাম না, যদি-না ঠোঁট দুটো অমন ঘন-ঘন ফাঁক করত আর বন্ধ করত। এবার ওর আসল জোর যেন একটু-একটু টের পাচ্ছি। ঐ মারাত্মক চোখে সে আমার দিকে সোজা তাকিয়ে রইল। কালো একটু-বাঁকানো ঠোঁট, কালচে ধূসর রঙের ঘাড়, গোলপানা চোখের ধার, থাবায় অসুরের জোর—আমার দারুণ ভয় করতে লাগল।

তারপর ক্রমে আমার চোখের দিকে তাকাতে-তাকাতে হাঁটু থেকে উড়ে এসে বসল আমার নাভিতে, একপায়ে। স্থির দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন আমার নাভি থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো রঙের ব্রহ্মা। তারপর ঠোঁট উপরে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ঘষতে আরম্ভ করল আমার পাঁজরে। নজর করলাম অন্য কাকেদের মতো এর ঠোঁট সোজা নয়, সার্জেনের কাঁচির মতো সামনের দিকে একটু বাঁকানো। চোখের চাউনি এখন আর এদিক-ওদিক ঘুরছে না, আমার দিকে নিষ্পলক। সব খাক হ'য়ে যায় ঐ চাউনিতে। ওর চোখের দৃষ্টিতে হয় এমন-কোনো আকর্ষণ আছে যাতে সমস্ত চৈতন্য অসাড় হ'য়ে আসে, অথবা এমন-এক মাদকতা যাতে ঘুম পায়. নতুবা, হয়তো এক ভয় যে, আমাকে একেবারে আঘাতে-আঘাতে শেষ ক'রে দেবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও অন্য-কোনোদিকে তাকাতে পারলাম না আমি। আস্তে-আস্তে হারিয়ে গেলাম ওর চোখের মধ্যে।

বাধা-দেওয়া-সম্ভব-নয় এমন-এক অসম্ভব জোরে আমাকে টানতে লাগল।

আমার চারপাশের সবকিছু যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল, ঐ দাঁড়িয়ে-থাকা ঝাউয়ের সারি, ভেজা বালিতে সামুদ্রিক প্রাণীর নকশা, সমুদ্রের থমকে-থাকা উথালপাথাল ঢেউ। ঘোর-লাগানো সেই একই দৃষ্টিতে কাকটা আমার দিকে ঘুরে এল, ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাল আমার বুকে। ঠক্-ঠক্-ঠক্ আওয়াজ বেরুচ্ছে! মনে হ'লো বুঝি কাঠঠোকরা! ভালো ক'রে নজর ক'রে দেখলাম ওর মুখের দিকে। না, কাকই তো ঠিক। এখন যেন বুঝলাম ঠোঁটদুটো কেন সার্জেনের কাঁচির মতো।

যেমন ক'রে কাঁচি দিয়ে ছাড়ায়, ঠিক তেমনি ও ঠোঁট দিয়ে আমার চামড়া ছাড়াতে লাগল। সোজা সরল রেখায় এগিয়ে চলেছে ঠোঁট। খানিকটা চিরে ফেলার পর কাকটা এক জায়গায় গর্ত করতে শুরু করল। গর্তটা খানিকটা খুঁড়ে নিয়ে ঠোঁট চেপে বসিয়ে দিল দুই পাঁজরের মধ্যে দিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণা হ'লো আমার, কিন্তু কোনো শব্দ করতে পারলাম না মুখ দিয়ে।

কাকটা পাঁজর থেকে মুখ তুলল যখন, তখন ঠোঁট দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লাল তরল পদার্থ। তারপর ঠোঁট একটু ফাঁক ক'রে আকাশের দিকে তাকাল। ও-রকম করতেই ঐ তরল পদার্থের খানিকটা গলা দিয়ে নেমে গেল। ঢোক গেলবার শব্দ হ'লো।

ঠোঁটের চেরা জায়গার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম হাসছে। তারপর আবার নিচু হ'য়ে এল সামনের দিকে আর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দুই পাঁজরের ফাঁক থেকে টেনে বের ক'রে আনল একটা শিরা। আমার বুকের উপরেই রেখে সেটাকে খোঁচাতে লাগল। শিরা থেকে যেন চিৎকার বেরুলো জোরে, কিন্তু আমার ভেতরেই কোথায় তা আটকে গেল। কাকটা আদৌ সে-চিৎকার শোনেনি মনে হ'লো। থাবার মধ্যে শিরাটাকে নিয়ে সে চাপতে শুরু করল, আনন্দে ঠোঁট দিয়ে সেটাকে একটু-একটু আছাড় দিতে থাকল। তারপর আবার ঠোঁট তুলল। শিরার সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিল লাল মাংসের দুটো ছোটো টুকরো। তারই একটা টুকরো ঝুলছিল বাঁকা ঠোঁটের ধার ঘেঁসে। টপ-টপ ক'রে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। রক্তে চোবানো ছিল ব'লে ঠোঁটের রঙও লাল। ঠোঁটের উপরে রাখতেই একটা ছোটো মাংসের টুকরো সুড়ুৎ ক'রে ভেতরে চ'লে গেল। তারপর ডানা দিয়ে ঘ'সে-ঘ'সে ঠোঁট মুছল। ডানাতেও লাগল রক্তের দাগ। আনন্দে উত্তেজনায় দুলে-দুলে পাক খেল। তারপর একেবারে হঠাৎ সবকিছু দারুণ বদলে গেল। মনে হ'লো চেহারাটা বিরাট আকার ধারণ করছে। আরো ভয়াবহ হ'য়ে উঠল ওর চেহারা। এবার একেবারে খেপে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে টেনে-টেনে শিরাগুলোকে

সব বের করতে থাকল, একটার পর একটা, অত্যন্ত দ্রুত। সব জড়িয়ে-মড়িয়ে শিরাগুলো দলা পাকিয়ে গেল। একটা কুণ্ডলির মতো চেহারা হ'লো সবটা মিলিয়ে। এ-সবের পর আবার আমার দিকে সোজা তাকাল। ঘোরের এমন-একটা টান ছিল সেই দৃষ্টিতে যে আমি কিছুতেই অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। কেউ যেন আমাকে ভেতর দিক থেকে টানছে, আর আমি সেই টান খাচ্ছি।

তারপর কাকটা ডানা ছড়াল আর সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল। জমাট অন্ধকার চারদিকে। সেই অন্ধকারে শুধু তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। গোল্লা পাকানো চোখ এখন আর ঘুরছে না, স্থির হ'য়ে আছে। এক পাশবিক শক্তি নিয়ে যেন টানছে। অসহায় বোধ ক'রে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলাম। ভোমরার মতো চোখের দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ণ ক'রে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে ঘা মারতে আরম্ভ করল। যন্ত্রণা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম, অনেকবার, কিন্তু কিছুই যেন তার কানে পৌঁছচ্ছে না। সেই গোল-গোল চোখ ছাড়া এখন আর-কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ জোরে ডানা ঝাপটে কাকটা উড়াল দিল আর সেই টানে আমাকেও টেনে নিল, যেন কেউ একটা জোর হ্যাঁচকা মেরে আমাকে বাঁধন কেটে দিয়েছে। প্রথমটা তীর বেগে। আমিও ওব পেছন-পেছন উড়ছি। সামনে কাক আর পেছনে আমি। আমি আপ্রাণ ডানা ঝাপটে ওর সঙ্গে সমানে তাল রাখবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঐ বেগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সোজা কথা নয়। সমুদ্রের ওপরে একটা বিরাট চক্কর মেরে মেঘের পিছনে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি যখন মেঘের পিছনে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সেখানে কেউ নেই। আকাশে আমি একেবারে একা। এমন-এক নিঃসঙ্গতার বোধ হ'লো আমার, যেন জন্মসূত্রের সবকিছু থেকে আমি ছিন্ন। এবার আমি নিজের দিকে মন দিলাম। পেটের মধ্যে যেন দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে। এক অসহ্য আগুনে পোড়ার বোধ, যেন আমার ভেতরে সবকিছু অতি দ্রুত পুড়ে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে যত জোরে পারি ডানা ঝাপটালাম। ঝপ্...ঝপ্...শব্দ হ'লো শুধু। সমুদ্রের ওপর পাক খেয়ে, ঝাউয়ের সারির ওপর দিয়ে উড়ে আমি ফিরে এলাম। সমুদ্রের তীরে দেখতে পেলাম একটা ছোটো বিন্দু। চতুর্দিকে হলুদ রঙের ছোপ, ঐ বিন্দুর রঙও হলুদ হ'য়ে যাবে না তো, এই আমার ভয়। পেটের আগুন নেভানোর মতো কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে আমি তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে নেমে গেলাম। ঢেউয়ের

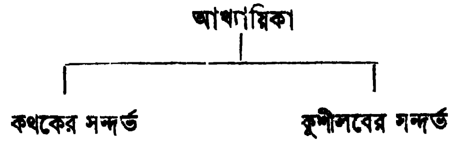
সঙ্গে সাঁৎরে-সাঁৎরে আমি তীরে এলাম। বালিতে লাফ দিয়ে উঠে আরো এগিয়ে গেলাম। একটা মানুষের দেহ, অর্ধেকটা বালিতে ডোবানো। শাদা ফ্যাকাশে পায়ের আঙুলগুলো বালি থেকে বেরিয়ে এসেছে, গায়ে-গায়ে লেপটানো ডগার দিকে একটু বাঁকানো। ফুর্তিতে আমার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এল কুর্‌র্‌র্‌ কুর্‌র্‌র্‌। তা সত্ত্বেও আমি উত্তেজনা দমন করতে চেষ্টা করলাম। কাছে পৌঁছেই লাফ দিয়ে লোকটার হাঁটুর ওপরে উঠে আমার নখের থাবা বসিয়ে দিলাম। দুই নখের ফাঁকে হাঁটুটাকে নিয়ে জোরে চাপ দিলাম, দিতেই একটা কড়মড় শব্দ হ'লো। তারপর ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকালাম লোকটার মুখের দিকে। আর···মুখটা চিনে ফেলবামাত্র একটা ধাক্কা লাগল আমার বুকের ভেতর।

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

আধুনিক ভারতীয় গল্প / ৩

আজকাল একটা প্রশ্ন খুব খাচ্ছে। কেমন ক'রে মুখোমুখি হবো আমরা কোনো আখ্যানের? কীভাবে তাকে ধরবো? তাকে কি ধরতে হবে আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ, স্থচনা মধ্যবর্তী-জট আর উপসংহারে তৈরি নিপুণ-এক রুদ্ধ প্রকরণ হিশেবে, যার সমস্ত তাৎপর্য তার নিজের তৈরি রুদ্ধ কুঠুরিতেই বসবাস করে, বাইরের পৃথিবীতে যেখানে মানুষজন তার সমাজসংসার নিয়ে হিমশিম খেতে-খেতে বাঁচে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই যার নেই? অর্থাৎ তাকে কি ধরতে হবে নিছকই এক গূঢ়লেখ ব'লে, কোনো চাবির সাহায্যে আস্তে-ধীরে যাকে খুলে-খুলে আমাদের বার ক'রে আনতে হবে এর মধ্যে লুকোনো ছিলো কোন কথা? কিংবা যে-চিহ্ন-গুলো দিয়ে এই গূঢ়লেখ তৈরি হয়েছে সেগুলোই বা কতটা জরুরি? চিহ্নক কি কোনো ফ্রিস্টাইল মল্লযুদ্ধ ছাড়াই চিহ্নিতকে ধরিয়ে দিতে পারে—না কি চিহ্নর জন্যই চিহ্ন—চিহ্নসর্বস্বতাই গূঢ়লেখের মোদ্দা ও আদৎ ব্যাপার—আমরা সাতকাহন ফাঁদতে পারি নিছক এই চিহ্নগুলোকে নিয়েই?

এমনিতে, কোনো আখ্যানের পাঠ যে আসলে কী, তা ধ'রে ফেলতে মুহূর্তও দেরি হয় না আমাদের।

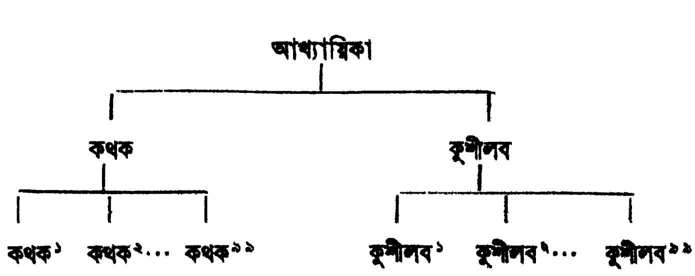


অর্থাৎ যে-কোনো আখ্যানের মধ্যেই বুনে দেয়া হয় কথক আর কুশীলবের সন্দর্ভের স্ফুট-অস্ফুট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি: পরপর সাজানো এরা, কিন্তু কখনো-বা স্থানচ্যুত ক'রে অপ্রত্যাশিত ভাবেই জবর দখল ক'রে নেয় একটার বদলে আরেকটা, একটা বিন্যাস যান্ত্রিকভাবে গণিত মেনে তৈরি হ'য়ে যাচ্ছে দেখলেই তাকে ভেঙে ফেলে নতুন একটা আদলও তৈরি ক'রে দেয়া যায় হয়তো-বা। অনেকটা জমি থাকে, ফাঁকফোকের প্রসার থাকে, ইচ্ছে করলে যেখানে খেলানো যায় এই দুইকেই।

কথক হ'তে পারেন সর্বজ্ঞ, সর্বত্রগামী (কুশীলবের মনেও তাঁর অদৃশ্য আনাগোনা থাকতে পারে, আবার একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে-কালেও তিনি হাজির থাকতে পারেন পর্যবেক্ষক ও প্রতিবেদক হিশেবে); আবার, এমনও হ'তে পারে যে কথকের জ্ঞান অতীব সীমাবদ্ধ—পাঠকের মতো তিনিও ধীরে-ধীরে আবিষ্কার করছেন কবে কখন কীভাবে কেন এত-সব কাণ্ড ঘটেছিলো। তবে এটা ধ'রে নেয়া হয়েছে যে কথকের দুটি দিক থাকে :



কথক বিভিন্ন ঘটনা ও টানাপোড়েনে কাজ করতে পারেন অনুঘটক হিশেবে—অন্তত ক্রিয়ামূলক অপেক্ষক একটা দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়—কিন্তু তাতেও কিছু হ'তো না যদি-না তাঁর বাচিক প্রকাশ থাকতো, ভাষায় যদি তিনি তুলে ধরতে না-পারতেন সব। স্বভাবতই এটাও মেনে নিতে কোনো বাধা নেই যে কোনো আখ্যানের কথক হ'তে পারেন অনেকেই, কুশীলবও থাকতে পারেন অনেকেই, গ্রন্থকার তাদের বিন্যাস মারফৎ গ'ড়ে তুলতে পারেন আখ্যানের ছক—আর এইভাবে এইরকম একটি সরল নকশাও তৈরি হ'য়ে যেতে পারে যে-কোনো পাঠের :



কিন্তু সবসময়েই মনে-রাখা উচিত কথক আর কুশীলবের মেলামেশার ক্রিয়ামূলক বা কায়িক দিকটা এতই ভিন্ন যে ছকটাও আলাদা হ'য়ে যায়। অর্থাৎ কথক এবং কুশীলবের আদিষ্ট কাজ কিছুতেই এক হ'তে পারে না :

কথক	কুশীলব
১ মুখ্য কর্ম :	
ক) বর্ণন / বিবরণ	ক) ঘটনাকর্মে অংশগ্রহণ
এবং	↑
খ) নিয়ন্ত্রণ / বিন্যাস	খ) ব্যাখ্যান
২ গৌণ কর্ম :	
গ) ব্যাখ্যান	গ) নিয়ন্ত্রণ / বিন্যাস
↓	এবং
ঘ) ঘটনাকর্মে অংশগ্রহণ——————→	ঘ) বর্ণন / বিবরণ

কথকের মুখ্য কাজ, আসলে, সুবিন্যস্তভাবে বর্ণনা বা বিবরণ দেয়া। কথক ঘটনার ব্যাখ্যাও করতে পারে, কিন্তু সেটা মুখ্য কিংবা আবশ্যিক কাজ নয় তার, ঘটনায় তাকে অংশ নিতে হবে কিনা সেটাও তার কাছে জরুরি বা আবশ্যিক প্রশ্ন নয়। অথচ এইটেই ঠিক উলটে যায় কুশীলবের বেলায় : তাকে অংশ নিতে হয় ঘটনায়, টানাপোড়েনে,দ্বন্দ্বে—আর অংশ নিতে গেলে স্বভাবতই কোনো-একটা ব্যাখ্যাও খাড়া করতে হয় তাকে এ-সবের, কিন্তু বর্ণনা বা বিবরণ এবং তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কেমনভাবে সাজাতে হবে—এ-সব তার মুখ্য কাজ নয় ;—তবে দরকার হ'লে, কোনো-কোনো আখ্যানে, সে এ-সব দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিতে পারে। অর্থাৎ কথকই, সত্যি-বলতে, আখ্যানের মধ্যে তার প্রাধান্য বিস্তার করে—তার কথকতায় সে-ই সর্বেসর্বা, কেননা তার কথকতার ঠিক কোন-কোন জায়গায় সে কুশীলবের সন্দর্ভ জুড়ে দেবে, সেটা তাকেই স্থির ক'রে নিতে হয়—ছটা চরিত্র হুড়মুড় ক'রে আখ্যানে ঢুকে প'ড়ে গায়ে প'ড়ে কথককে হুকুম করতে পারে না আমাদের নিয়ে এইভাবে, এইরকম ক'রে বলুন। যদি এ-রকম ঘটেও, সেটা ঘটে কথকেরই ইচ্ছায়—তারই বিন্যাসের অভিনবত্বে মনে হয় কুশীলবই বুঝি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। কুশীলবদের প্রত্যেকেই তার সন্দর্ভে বর্ণিত বিষয় ও ঘটনা সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত আবেশ বা খেয়াল (অর্থাৎ মন্ময় ভঙ্গিমা) প্রকাশ ক'রে থাকে। ব্যাখ্যানের মধ্যে পড়ে মন্তব্য, টীকাভাষ্য, শ্লেষকটাক্ষ, মূল্যায়ন—এমনকী নিছক সাড়াপ্রতিক্রিয়াও। কথক ইচ্ছে করলে ব্যাখানের দায়িত্ব নিতে পারেন বৈ কি (যদিও এটা তাঁর বাধ্যতামূলক কাজ নয়) তবে তাঁর ব্যাখ্যানা শুরু হ'লেই কথকের সন্দর্ভ নাটকীয়ভাবে বদলে যায়,

ঠিক যেমন যায় কথক স্বয়ংই যদি বর্ণিত ক্রিয়াকলাপ ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়—কুশীলব বর্ণনার দায়িত্ব দখল ক'রে নিলে আখ্যানের ধরন যতটা বদ্‌লে যায়, প্রায় ততটাই।

আখ্যানপ্রণালী : দায়দায়িত্ব	বিবৃতি, বিবরণ, বর্ণনা বা কল্পমূর্তি প্রতিষ্ঠা	ব্যাখ্যান	ঘটনা
বিষয়মুখ (তন্ময়)	+জরুরি	—অপ্রয়োজনীয়	—অপ্রয়োজনীয়
আলংকারিক (বাঁধাবুলির খোপ)	+জরুরি	+জরুরি	—অপ্রয়োজনীয়
আত্মমুখ (মন্ময়)	+জরুরি	+জরুরি	+জরুরি

এই ছকটা থেকেই প্রধান তিনটি আখ্যানপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ফুটে বেরুবে। আখ্যায়িকা যা-ই হোক, যদি তা বিষয়মুখ হয় তবে, বিবৃতিবিবরণের কল্পমূর্তি তৈরি করা ছাড়া তার আর-কোনো দায়িত্ব নেই। যদি তৈরি-করা, পূর্বরচিত, আলংকারিক ভাষার মোড়কে আখ্যায়িকাকে পরিবেষণ করা হয়, তবে বর্ণনা-বিবরণেই মিশে যাবে ব্যাখ্যান—কেননা বাঁধাধরা একটা জগৎকেই সে ফোটাতে চাচ্ছে—ঘটনায় কথক অংশ নেবে কিনা সেটা জরুরি নয় তখন, কিন্তু কথক যখন প্রচলিত অলংকারের মোড়ক ব্যবহার করেছে, তখনই সে ব্যাখ্যার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু যে-লেখা সম্পূর্ণ আত্মমুখ, মন্ময়, সেখানে কিন্তু তাকে সবগুলো কাজেই অংশ নিতে হয়—বিবরণ দিতে হয় তাকে, ব্যাখ্যান বিনা তার আত্মমুখিনতা আমরা বুঝবোই বা কী ক'রে, আর ব্যাখ্যান মারফৎ—আর-কিছুতে যদি না-ও হয়—সে তখন বদ্‌লে ফ্যালে ঘটনার বৈশিষ্ট্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে কথক আর গ্রন্থকার বা লেখকের সম্পর্ক পরোক্ষ ও 'বাইরের'। কবিতার 'আমি' যেমন কাল্পনিক চরিত্র হ'তে পারে, বিশেষত লিরিক কবিতায়, আখ্যায়িকাতেও তাই। কবিতার 'আমি'—যার মধ্যে একটা খেলা আছে; i / eye এইরকম একটা গড়ন তৈরির দিকে ঝোঁক আছে : তা কিন্তু রচনা থেকে রচনায়, কবি থেকে কবিতে, শৈলী থেকে শৈলীতে ভিন্ন-ভিন্ন

চেহারা নিতে পারে। তবে এটা যে আরো বিবেচনা দাবি করে, সেটা এখানে কবুল ক'রে রাখা ভালো।

	→	বিষয়মুখ
তৃতীয় পুরুষের জবানিতে	→	আলংকারিক
	→	আত্মমুখ
আখ্যানপ্রণালী[১] →		
	→	বিষয়মুখ : পর্যবেক্ষক
উত্তম পুরুষের জবানিতে	→	আলংকারিক : প'ড়ে-পাওয়া বর্ণনাভঙ্গি ও ব্যাখ্যা
	→	আত্মমুখ : ব্যক্তিগত

আখ্যানরচনা সম্বন্ধে এই প্রাথমিক সূত্রগুলোকে মনে রেখে এবার আমরা আখ্যায়িকার তত্ত্বকাঠামোর ভেতর প্রবিষ্ট হ'তে পারি। ভালটার বেনিয়ামিন

১ মধ্যম পুরুষের জবানিতে যে-কাহিনীর বয়ন, তার মধ্যে আরো-একটি দিক লক্ষ করা যাবে। একই সঙ্গে কথকের আগেকার অভিজ্ঞতা, আর পরে কী হ'তে পারে এই অনুমান—এই দুয়ের মিশোলের ফলে অন্য-একধরনের টানাপোড়েন তৈরি হ'য়ে যায় : আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সময়ের দুই জমি থেকে বুঝি আদান-প্রদান বিনিময় চলেছে, কিন্তু এই দুই জমি এক হ'য়ে যায় যখন দেখা যায় আগেকার অভিজ্ঞতাকেই পরবর্তী এই জমিতেও অনড় হিশেবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেয়া হচ্ছে, যতই কেননা তার মধ্যে থাকুক গ্লানি, আত্মপীড়ন, বিবেকবোধের তাড়না, যেমন দেখা যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রর "তেলেনাপোতা আবিষ্কার" গল্পে। অর্থাৎ একটা অপরিবর্তনীয় জমি তৈরি হ'য়ে যায়, যার ফলে সমস্ত শ্লেষ তির্যক-আঘাত তাড়নপীড়ন সত্ত্বেও মনে হয় সময় পালটালেও অবস্থা পালটাবে না—কেননা কথকের শ্রেণীচরিত্রের অবস্থান এবং আত্মগত আবেগ-অনুভূতি পালটায়নি, বরং মধ্যম পুরুষের ওপর তা পুরোপুরি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ যেন নিজের কাহিনীকেই—যা আগে ঘ'টে গিয়েছে—সিন্দবাদের বোঝার মতো পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করার চেষ্টা করা যে এ-রকম হ'তোই, এছাড়া এমনতর শ্রেণীবিভাগের ফলে আর-কিছুই সম্ভব হ'তো না, আপনার বেলাতেও হবে না। গ দাইনস্ক-এ জন্মানো জর্মান লেখক গুনটার গ্রাসের 'বিড়াল আর ইঁদুর'ও তা-ই করবার চেষ্টা করেছিলো : ঘটনার ওপর থেকে নিজের দায়িত্ব সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পুরুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মদোষ ক্ষালনের একটা চেষ্টা। মেহিকোর লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেস অবিশ্যি 'আর্তেমিও ক্রুসের মৃত্যু' ও 'খোলশবদল' উপন্যাসে বিভিন্ন আখ্যানপ্রণালী উত্তম পুরুষের জবানি, মধ্যম পুরুষের জবানি বা তৃতীয় পুরুষের বিবরণ—একান্তর ভঙ্গিতে মিশিয়ে দিয়ে অন্যতর এক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তবে মধ্যম পুরুষের জবানিতে রচিত আখ্যায়িকা বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি নিবন্ধের অবতারণা করাই হয়তো ভালো।

একবার নিকোলাই লেসকভ এবং কথ্য ও লিখিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আখ্যানরচনার একটি সূত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কথক, তাঁর মতে, দু-ভাবে কাহিনী সাজাতে পারেন। শ্রোতা বা পাঠক যখন কৃষিজীবী সভ্যতায় কোনো-একটি জমিতে নিবিড়-বদ্ধ হ'য়ে থাকতো, তখন কৌতূহলোদ্দীপক চিত্তাকর্ষক আখ্যান শোনা যেতো তাঁদের কাছেই যাঁরা মনে ক'রে রেখেছেন দূর-কালের অতীতের কথা, খুঁটিনাটি, ঘটনা—আর, না-হ'লে, শোনা যেতো তাঁদের কাছে যাঁরা বিভিন্ন উপলক্ষে—ব্যাবসা, যুদ্ধযাত্রা বা তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে—বহু দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ দেশ বা কাল—এই দুই মাত্রার ভেতরই যাঁরা বর্তমান জমি থেকে দূর-দূরান্তরে গিয়েছিলেন, তাঁরাই শোনাতে পারেন বিচিত্র সব আখ্যায়িকা—যার মধ্যে বর্ণনা-মাহাত্ম্যেই আমাদের ওপর অপরিচিত সময় বা দেশ অভিঘাত তৈরি ক'রে যেতো। যেহেতু আমরা—শ্রোতারা—কৃষিকর্মে ব্যস্ত ছিলাম ব'লে দূর-দূরান্তরে যেতেও পারিনি, কিংবা জীবিকার তাড়নায় অতীতের সাতকাহন বিশেষভাবে মনে ক'রেও রাখিনি, আমাদের কাছে কথক তাই উপস্থিত হতেন কোনো বিস্মৃত বা অজ্ঞাতপূর্ব জগতের ইঙ্গিত নিয়ে। আখ্যায়িকা নিজেই যে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্পূর্ণ জগৎ রচনা ক'রে দেয়—এ-বোধ তখন ছিলো না, আর তাই সমকালীন জগতের উপাদান নিয়েও চেনাকে অচেনা বা অচেনাকে চেনা হিশেবে দেখিয়ে দেবার উপায় বা কৌশল নিয়ে তখন ভাবা হয়নি। কিন্তু, তবু, যে-আখ্যানই তাঁরা ফাঁদুন না কেন, কী ছিলো তার কলকব্জা? স্বভাবতই ভিন্ন-ভিন্ন আখ্যায়িকা প্রণীত হ'তো ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে—তবে তাদের বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসতো কতগুলো সাধারণ সূত্র।

ধ্রুপদী রুশী ফর্মালিস্ট চিন্তায় অনেকদিন আগেই ভেবে বার করা হয়েছিলো 'কাহিনীবিন্যাস' (Plot) এবং 'কাহিনী' (Story)র ভিন্নতার কথা। আখ্যায়িকার ভেতর ঠিক কেমনভাবে, কোন পারম্পর্যে, ঘটনাগুলোকে পর-পর 'সাজানো হয়েছে' সেটা এক, সেটা *récite*, সেটা বয়ন, সেটা বাচন। কিন্তু যে কালানুক্রমিক পারম্পর্যে পর-পর ঘটনা ঘটেছে, আখ্যায়িকার সঙ্গে পরিচিত হবার পর যেটা আমরা ভেবে বার ক'রে নিতে পারি, সেটা অন্যরকম হ'তেই পারে, সেটা *histoire*, সেটা ইতিহাস, কালপঞ্জি। এক্ষেত্রে আখ্যানপ্রণালী—অর্থাৎ বর্ণন, বিবরণ, বিবৃতি, কল্পরূপগড়ন—সেটা তৃতীয় একটা মাত্রা যোগ করে। কোনো রহস্যকাহিনী সচরাচর যেমন শুরু হয় কোনো-একটি অপরাধকর্মের আবিষ্কারে,

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাখ্যার-অতীত কতগুলো ঘটনার তালগোলপাকানো জটে, আখ্যায়িকা তারপর 'এগোয়' পেছনের দিকে—খুলে দেখায় কেন, কেমন ক'রে, কার দ্বারা, কখন এই দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয়েছিলো, কেমন ক'রেই বা বিভিন্ন রেড হেরিং জট পাকিয়ে গিয়ে আমাদের বুঝতে দিতে চায়নি ঘটনাগুলোর কলকব্জা, ক্রম ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য উপাদান—অর্থাৎ এখানে বয়ন উলটে দিয়েছে গল্পকে, অর্থাৎ ঘটনার ক্রমপঞ্জি। এক কথায়, ঘটনার ক্রমপঞ্জি আর রচনার ক্রমপঞ্জি যে একই হবে এমন-কোনো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। অন্যূন পাঁচটি বিষয় তাই এখানে লক্ষ্য করা উচিত :

১. পা র ম্প র্য : আখ্যায়িকার ভেতর সময়ের প্রবাহ বা পারম্পর্যকে কী-রকম ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা খুঁটিয়ে দেখা চাই : কখনও প্রত্যাশা (*prolepsis*) দিয়ে, কখনও পেছিয়ে এসে আলো ফেলে (*analepsis*), আর কখনো-বা দুইকেই উলটেপালটে মিশিয়ে দিয়ে (*anachrony,*) অর্থাৎ সময়ের ওলোট-পালোট তৈরি ক'রে যার ফলে একটা ইঙ্গিত তৈরি হয় বাচন আর কালপাঞ্জর মধ্যকার বিরোধ বিষয়ে, কোনো-কোনো আখ্যায়িকায় যেহেতু সেটাই প্রধান বিবেচ্য হ'তে পারে।

২. স্থা য়ি ত্ব কা ল : কোনো আখ্যায়িকা কীভাবে উহ্য বা অনুচ্চারিত রাখে কোনো ঘটনা, কিংবা তাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে, বিশদ করে, সংক্ষিপ্ত করে, একটু থেমে গিয়ে অন্য কথা পাড়ে ইত্যাদি কৌশলের ব্যবহারই তৈরি ক'রে দেয় আখ্যায়িকার স্থায়িত্বকাল।

৩. বা রং বা র তা : কোনো ঘটনা একটি আখ্যায়িকায় ক-বার ঘটে তারই খতিয়ান যখন নেয়া হয়, তখন পারম্পর্য বা স্থায়িত্বকালের প্রশ্নও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আসলে যে-পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের আমরা উল্লেখ করতে চাচ্ছি, তারা পরস্পরসংলগ্ন—মোটেই আলাদা-আলাদাভাবে নিজেদের জাহির করে না। আমরা কেবল আলোচনার সুবিধের জন্যেই তাদের এক-এক ক'রে ভেবে দেখছি। সাধারণভাবে কোনো আখ্যায়িকায় কোনো ঘটনা একবারই ঘটে এবং একবারই তার বর্ণনা করা হয়, পরে হয়তো আরেকটি ঘটনারও বর্ণনা দেয়া হবে। কিন্তু এমনও হ'তে পারে ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র একবার, অথচ বর্ণিত হয়েছে একাধিকবার ; ঘটেছে কয়েকবার, বর্ণনা করা হয়েছে কয়েকবার ; কিংবা ঘটেছে কয়েকবার, কিন্তু সংক্ষেপেই তাদের কথা একবারেই সেরে ফেলা গেছে। ধরা যাক, একবার ঘটেছে, অথচ কয়েকজনে (বা হয়তো একজনেই) তাকে বর্ণনা করেছে কয়েকবার—

অর্থাৎ সেখানে সময় থমকে থেমে জমাট বেঁধে (*freeze*) গিয়েছে; কিংবা একই ঘটনা হয়তো চারবার চারজায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে—অর্থাৎ বারংবারতা বা পৌনঃপুনিকতা যে-বার্তা দেয় অনেকক্ষেত্রেই সে সময়ের প্রবাহকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে একই ঘটনাকে ঘিরে আবর্তিত হ'তে থাকে, ফিরে-ফিরে আসতে থাকে একই জায়গায়—আর এভাবেই এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে যায় পারম্পর্য বা স্থায়িত্বকালেরও প্রশ্ন।

৪. ক্রি য়া ভা ব : সে নিয়ে আসে দুই ধরনের মেজাজ—দূরত্ব ও দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন। নিজের উপাদানগুলোর সঙ্গে আখ্যায়িকার সম্বন্ধের তারতম্য থেকেই এটা বোঝা যায় : শুধু কি গল্প ব'লে দেয়া হ'লো, যাকে বলে *diagesis*, নাকি হুবহু কী ঘটেছিলো তারই প্রতিলিপি তৈরি করা হ'লো যাকে বলে *mimesis*—কিংবা কী উক্তি ও বাচন ব্যবহার করেছে কুশীলব, সরাসরি প্রত্যক্ষ, না কি তাকে ব্যবহার না-ক'রে পরোক্ষে কারু মারফৎ অথবা কখনও নিজেই যদি জানিয়ে দেয় বক্তব্যের সারমর্ম, না কি একজন অন্যের উক্তির মর্ম বোঝাবার সময় সে তার কথাগুলো যে-ভাবে যে-ভঙ্গিতে বলেছিলো হুবহু সেইভাবে ব'লে দিচ্ছে—এইসবের মধ্যেই নির্ভর করে ক্রিয়াভাবের বৈশিষ্ট্য। আমরা উপস্থিত ছিলাম ঘটনাস্থলে, ঘটনার সময়, না কি অনুপস্থিত ছিলাম, পরে অন্যের জবানিতে জানতে পারছি—এ থেকেই তৈরি হয় দূরত্বের বোধ—অথবা নৈকট্যও।

দৃষ্টিকোণ বা অনুপাতের প্রশ্নটিও কতগুলো আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে। কথক কুশীলবের চাইতে বেশি জানতে পারে, সে সর্বজ্ঞ ও সর্বত্রগামী হ'তে পারে; সে কুশীলবের চাইতে কম জানতে পারে; কিংবা এমনও হ'তে পারে যে কুশীলব যতটুকু জানে সেও ততটুকুই জানে—আস্তে-আস্তে চরিত্ররা যেভাবে যেমনভাবে জানতে পায় তথ্য, খুঁটিনাটি, টানাপোড়েন, সেও সেইভাবে এবং তেমনভাবেই আস্তে-আস্তে জানতে পারে সব। অর্থাৎ আখ্যায়িকা উপস্থাপিত করা যেতে পারে বিশেষ-কোনো কেন্দ্রবিহীন কাহিনীর বাইরেকার কোনো সর্বজ্ঞ কথক দ্বারা, কিংবা ভেতর থেকে একটি কেন্দ্র খুঁজে নিয়ে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কোনো চরিত্রই কথকের ভূমিকায় কোনো স্থির ও নির্ধারিত অবস্থা থেকে উপস্থাপিত করতে পারে আখ্যায়িকা, কিংবা কোনো ভিন্ন পরিবর্তমান অবস্থা থেকেই তাকে উত্থাপিত করতে পারে সে, কিংবা ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্র ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে উপস্থাপিত করতে পারে আখ্যায়িকা। ঘটনার বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রেও আখ্যায়িকা গ'ড়ে তোলা যায়, সেখানে কথক কুশীলবদের চাইতেও ভেতরের টানাপোড়েন অনেক কম জানে।

৫. স্ব র : আখ্যানক্রিয়ার, অর্থাৎ আখ্যায়িকাটিকে উপস্থাপিত করার কাজটির সঙ্গেই তার যোগ : কে কথক, কথ্য বিষয় কী, শ্রোতা কারা—এই সবকিছুই স্থির ক'রে দেয় স্বরগ্রামের বৈশিষ্ট্য। 'আখ্যায়িকার সময়' আর 'আখ্যাত সময়ের' নানারকম সমাবেশ হ'তে পারে—ঘটনাগুলো বর্ণনা করার কাজ আর যে-সব ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, তার মধ্য থেকেই বোঝা যাবে ঘটনাগুলো ঘটবার আগে, না পরে, না কি ঘটবার সময়ই বিবৃত হচ্ছে। কথক তাঁর আখ্যায়িকায় বেমালুম গরহাজির থাকতে পারেন ; থাকতে পারেন আখ্যায়িকার মধ্যে, যেমন থাকেন পর্যবেক্ষক উত্তম পুরুষের জবানিতে, কিংবা শুধু-যে আখ্যায়িকার অবিচ্ছেদ্য অংশই হ'য়ে ওঠেন তিনি তা নয়—তার প্রধান চরিত্র হিশেবেও তিনি হাজির থাকতে পারেন।

তত্ত্বকাঠামোবিষয়ক এই সন্দর্ভ থেকে একটা দিকে কিন্তু হুঁশিয়ার থাকা দরকার আমাদের। আ খ্যা ন ক র্ম—অর্থাৎ কোনো আখ্যায়িকা উপস্থাপিত করার কর্ম ও পদ্ধতি—আর আ খ্যা য়ি কা—সত্যি-সত্যি কী বা কাকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে—এই দুটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় আ ত্ম চ রি তে—যেখানে কথক আর কথকের বর্ণিত বিষয় দুইই যুগপৎ এক অথচ ভিন্ন—তিনি নিজেই বিষয় ও বিষয়ী, এমন-এক উত্তম পুরুষ যিনি শুধু নিজেই চরিত্র নন, তিনি দাবি করেন তিনি কল্পিত বা রচিত চরিত্র নন, অথচ বিন্যাসকৌশলে কোথাও-কোথাও কল্পনা বা রচনার ছাপ থেকে যায় বৈ কি।

এই তাত্ত্বিক সন্দর্ভ আমাদের বিশ্লেষণ করতে শেখায় আখ্যায়িকার গড়ন, নির্মাণ, ভাষা ও গূঢ়লেখ—সে কিন্তু কিছুতেই মাথা ঘামায় না আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ নিয়ে, সে কিছুতেই বলে না আখ্যায়িকা ভালো না মন্দ, তার অব্যবহিত কোনো উপযোগিতা বা প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা : মুড়ি মিছরির একই দর হ'য়ে ওঠে এই বিশ্লেষণে! বিশ্লেষণপদ্ধতিটি থেকে, পাঠক লক্ষ করবেন, সযত্নে ইতিহাস, সমাজপরিবেশ, আর্থরাজনৈতিক চিন্তাকে ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দেয়া হয়েছে। কারু সঙ্গে তার একমাত্র সম্বন্ধ যদি গ'ড়ে ওঠে তবে তা সাহিত্যের ইতিহাস—যেন সে-ইতিহাসও পৃথিবীর পরপারে অপরিবর্তনীয়ভাবে গ'ড়ে উঠেছে। এক আখ্যায়িকার সঙ্গে অন্য আখ্যায়িকার সাধর্ম্য, বিরোধিতা, সমান্তরতা—এইসব বোঝা যাবে, কিন্তু সমাজপ্রসঙ্গচ্যুতভাবেই। অর্থাৎ, এই তত্ত্বের মোহান্তরা বলেন সাহিত্যকর্ম রচিত হয় অন্য কোনো সাহিত্যকর্ম থেকে—সাহিত্যের রূপকল্পের বাইরেকার আর-কোনো উপাদানের সঙ্গেই তার কোনো সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ

আমরা কথা বলতে পারি *intertextuality* (অন্তর্পাঠ) নিয়ে, কোথায় আখ্যায়িকার এই পাঠে অন্য-কোন আখ্যায়িকার পাঠ লুকিয়ে আছে—এবং এর বাইরে আর-কিছু নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। যে-ইতিহাসের ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে সাহিত্যকে আলগোছে বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি বদ্ধ জমির মধ্যে পুরে দেয়া হয়েছে, যেখানে এক আখ্যায়িকা থেকে অন্য আখ্যায়িকার জন্ম হ'য়ে চলেছে অনবরত—সাহিত্য যেন ইতিহাসের বিকল্প হ'য়ে উঠেছে, ইতিহাসের বদলে সাহিত্য শুধু বিশ্বজনীনই নয়, স্বতন্ত্র একটি বিশ্বলোক—এই ধুয়ো এই জিগির এমনভাবে তোলা হচ্ছে যাতে মনে হয় পদ্ধতিগতভাবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা বিজ্ঞানের মতোই হ'য়ে উঠুক—সেইরকমই মূল্যবোধরহিত, সমাজ-সংস্পর্শবিহীন, স্বয়ংশাসিত, স্বয়ম্পূর্ণ একটি বাচিক নির্মাণ। কিন্তু 'গালিলেও চরিত' নামক নাট্যে ব্রেশ্‌ট যেমন দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকেও কাজ করতে হয় সমাজ পরিবেশের ভেতর, অর্থনীতি রাজনীতি ধর্ম সংস্কৃতি কোনো-কিছুই তার বাদ দেবার জো থাকে না—এই আখ্যায়িকাতত্ত্ব সেই কথাকে আদৌ পাত্তা দিতে চায় না। অম্লজান এবং উদ্‌জানের একটি বিশেষ অনুপাত থেকে জলের জন্ম হয়—তাঁদের বক্তব্য—ফিউড্যাল যুগে, পুঁজিবাদে, তৃতীয় বিশ্বে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায়। সাহিত্যও তেমনি স্বয়ম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর বাচিক নির্মাণ—নিজের বাইরে তার কোনো সম্বন্ধসূত্র নেই, একেবারে আলো-হাওয়া-রোধকরা এক বদ্ধ অন্তর্মুখিন জমি যা নিজেরই তৈরি-করা ব্যবস্থার মধ্যে নিজের জীবন ও বাস্তবতাকে আটকে রেখেছে। এখন শুধু উপাদানগুলো বিভিন্ন কায়দায় নিজেদের ফেটিয়ে নতুন-নতুন বিন্যাস তৈরি করবে, তাকে বোঝবার অন্যকোনো সূত্রই যেন নেই। এ যেন বাচ্চাদের এক খেলনা—দু-দিকে দুই কাচ বসানো নলের মধ্যে অনেকগুলো রংবেরঙের মারবেল পুরে দিয়ে বন্ধ ক'রে ঝাঁকালে যেমন প্রতিবারেই নতুন-নতুন বিন্যাস দেখা যায় এ যেন তা-ই। ইতিহাসের বিষয়ে এমনতর বিজাতীয় ঘৃণা বা গভীর আতঙ্কের হয়তো কারণ আছে: কী ক'রে ভোলা যায় সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, শ্রেণীসংঘাত, পুঁজিবাদের আগ্রাসব্যবস্থা, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, নতুন নক্ষত্রযুদ্ধের পাঁয়তাড়া—আর কী শোচনীয় গ্লানি ও বিকারের জন্ম দেয় তারা। কিন্তু সময় কোনো আখ্যায়িকায় কখনো ফ্রীজ্‌ হ'য়ে স্থাণু হ'য়ে গেলেও সত্যি-তো আর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর মোটেই থেমে থাকেনি। টেওডোর আডোর্নো যেমন বলেছিলেন, নির্যাতনশিবির, গ্যাসচেম্বার, হলোকাস্ট দেখে, যে এর পর আর শিল্পসাহিত্য হয় না; ধিক্কার

জেগেছিলো তাঁর, আত্মবিস্কার; তবে তিনি অবশ্য বলেননি যে শিল্পসাহিত্য একটি স্বতন্ত্র জগৎ, স্বতন্ত্র জমি—সমাজ ও ইতিহাসের বাইরে তার বসবাস। ভিয়েৎনাম, আলজেরিয়ার পর চিলে, নিকারাগুয়া, গ্রেনাদা, এল সালভাদোর, অনদুরাসও হয়, গ্যাসচেম্বারের মিথাইন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে ভূপালের নিরীহ নির্দোষের ওপর, চেরনোবিল দূষিত ক'রে যায় পরিবেশ, স্যুইৎজারল্যাণ্ডের নদীর জল বিষাক্ত ক'রে যায় ওষুধ কম্পানির রাসায়নিক পরিত্যজ্য। চিহ্নতত্ত্ব মাথা ঘামায় শুধু তার চিহ্নত্বর সাতকাহন নিয়ে। চিহ্নক (ধ্বনিচিত্র / বর্ণচিত্র / ভাষাচিত্র…) পৌঁছে দেয় চিহ্নিতের কাছে, এবং সেই চিহ্নিতই আবার হ'য়ে ওঠে চিহ্নক। কিন্তু ভাষাকে শুধু গূঢ়লেখ, শুধু code বা cryptogram তৈরির উপায় ব'লে ভাবলে একটা গূঢ়লেখের হেঁয়ালির জট খুলে আমরা পৌঁছুবো আরেকটি গূঢ়লেখে—এবং এইমতো অবিশ্রাম, এইভাবে অনন্তকাল। গূঢ়লেখ আসলে চিহ্নব্যবস্থারই একটি রূপ যাকে কোনো চাবির সাহায্যে সাধারণভাষায় তর্জমা ক'রে নেয়া যায়—শুধু তখনই তাকে আমরা গূঢ়লেখ ব'লে ভাববো যদি তা চিহ্নিত করে অন্য-কিছুকে, সে যা তার চাইতে আলাদা-কিছুকে—অর্থাৎ সে ছদ্মবেশ, সে লুকিয়ে রাখে তথ্য ও জ্ঞাতব্য, ছিপি-আঁটা ভাষা-কলসের মধ্যে আটকে রাখে জিন, যে-জিন আবার ভাষারই নির্মাণ—চিহ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে এই যা-কিছু আমাদের জানানো হচ্ছে তাতে কিন্তু চিহ্নক-চিহ্নিতের সম্পর্কটাই বিধান-বিহীন হঠাৎ-ঘটা সম্পর্কের অধীন। জাতপাত কেন জা ত পা ত বোঝাবে, কেন চন্দ্রবিন্দুর চ বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা দিয়ে তৈরি চশমা বোঝাবে না, তার কোনো কারণ বা মাথার দিব্যি নেই। অথচ উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করলে জাতপাতের চশমা এঁটে ভারতীয় সমাজের দিকে তাকানোও যায় তো। কিন্তু ভাষায় যার রচনা তার সবই যদি হয় গূঢ়লেখ, চিহ্ন, তবে সেটা ভেদ করলে—ভাষাতেই—সেই ভাষাও আবার নতুন একটি গূঢ়লেখ হ'য়ে উঠবে। স্তানিসোয়াভ লেম তাঁর 'বাথটাবে-পাওয়া স্মৃতিচিত্র' আখ্যায়িকায় ইয়ার্কি ক'রে চমৎকার খুলে দেখিয়েছিলেন এই তর্কের উদ্ভটত্ব।

'আপনার মতে সবকিছুই তবে গূঢ়লেখ?'
'ঠিক।'
'সে-ক্ষেত্রে সমস্ত পাঠ?…'
'হ্যাঁ।'
'কোনো সাহিত্যের পাঠও?'

'নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে আসুন।' সে ইঙ্গিতে আমায় ছোট্ট কালো দরজাটার কাছে নিয়ে গেলো। ভেতরে অন্য-কোনো ঘর নেই। শুধু-একটি যন্ত্রের কালো ঝকঝকে উপরিতল, ছোট্ট-এক কী-বোর্ড, দস্তায় মোড়া একটা ফোকর যার মধ্য থেকে সরীসৃপের জিহ্বার মতো বেরিয়ে আসছে কুণ্ডলি-পাকানো প্রিন্‌টআউট।

'কোনো সাহিত্যকর্ম থেকে যে-কোনো একটা লাইন দিন আমায়,' আমার দিকে ফিরে প্রান্‌টল বললে।

'শেক্সপীয়ার?'

'যথা অভিরুচি।'

'আপনি এখনও ধ'রে আছেন যে তাঁর নাটকগুলো গূঢ়লেখে পাঠানো কোনো বার্তা ছাড়া আর-কিছু নয়?'

'কাকে গূঢ়লেখে রচিত বার্তা বলে, তা বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন এটা তার ওপর নির্ভর করে। তবে আসুন না, চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক না-হয়।'

আমি ভাববার চেষ্টা করলাম, কিন্তু 'ওথেলো'র 'Excellent wretch!' ছাড়া আর-কিছুই আমার মনে পড়লো না। সেটা মনে হ'লো বড্ড ছোটো আর কেমন যেন খাপ খাবে না।

'পেয়েছি!' হঠাৎ প্রেরণার বশে ব'লে বসলাম। *'My ears have not yet drunk a hundred words of that tongue's utterance, yet I know the sound: Art thou not Romeo and a Montague?'*

প্রান্‌টল এ-কথাগুলো টাইপ করেছে কি করেনি, ফোকর থেকে ফিতে বেরুতে লাগলো, কাগজের সাপ। সে আস্তে ধ'রে একটা প্রান্ত আমার হাতে তুলে দিলে—আমি ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন প্রিন্‌টআউট বেরিয়ে আসে। হঠাৎ যন্ত্রের কম্পন বন্ধ হ'য়ে গেলো, বাকি ফিতেটা বেরিয়ে এলো শাদা। আমি পড়লাম:

'BAS TARD MATT HEWS VAR LET MATT HEWS SCUM WOULD BASH THAT FLAP EAR ASS WITH PLEA SURE GREAT THAT MATT HEWS BAS'

'এ আবার কী?' হতভম্ব হ'য়ে জিগেশ করলাম। প্রান্‌টল সবজান্তার ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললে:

'শেক্সপীয়ার নিশ্চয়ই মনে-মনে ম্যাথু ব'লে কারু ওপর বিষম রাগ পুষে রেখেছিলেন, আর ও-লাইনগুলো লেখবার সময় গূঢ়লেখে এই বার্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।'

'অ্যাঁ? আপনি বলতে চাচ্ছেন অমন চমৎকার দৃশ্যটা তিনি রচনা করেছিলেন শুধু ম্যাথু ব'লে কারু উদ্দেশে খিস্তি ছিটোবার জন্যে?'

'কে বললে তিনি ইচ্ছে ক'রে করেছিলেন ? গূঢ়লেখ হ'লো গূঢ়লেখ হ'লো গূঢ়লেখ—লেখকের উদ্দেশ্য কী ছিলো তাতে কিছুই এসে-যায় না।'

'আচ্ছা, আরো দেখা যাক।' এবার যন্ত্রে আমিই এই নিষ্কাশিত তাৎপর্যটি টাইপ ক'রে দিলাম। ফিতে আবার নড়তে শুরু করলো, ঘুরে-ঘুরে পড়লো মেঝেয়। প্রানৃটল শুধু হাসছে, কিছু বলছে না।

'IF ONLY TRA LA LA SHE'D GIVE ME LA LA, TRA LA LA AND GIVE ME TRA LA LA HA HA HA TRA LA LA,' বললে প্রিনৃটআউটের ছাপা বয়ান।

'এর মানে কী ?'

'আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজটির মনের গভীরে পৌঁছে গিয়েছি।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে শেক্সপীয়ারের মহৎ কাব্য নিছক বেজন্মা ম্যাথু আর ট্রা লা লা ছাড়া আর-কিছু নয়। এইভাবে চললে আমাদের সাহিত্যের সব কীর্তিস্তম্ভ, প্রতিভাবানদের সব সৃষ্টি, সমস্ত অমর রচনাকে সম্পূর্ণ প্রলাপে পরিণত ক'রে দেবে।'

'ঠিক তাই,' বললে প্রানৃটল। 'প্রলাপ। অর্থহীন কিচিরমিচির। শিল্প-সাহিত্য—কী তাদের প্রকৃত তাৎপর্য ? মনোযোগহরণ। ভিন্ন দিকে মনকে চালিত করা।'

'কী থেকে ভিন্ন দিকে ?'

'আপনি জানেন না ?'

'না।'

'আপনার জানা উচিত।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'কোনো বুঝে-ফেলা গূঢ়লেখও গূঢ়লেখ—যে-ভাষায় বোঝা হয়েছে, সেটাও। কোনো ওস্তাদ লোক স্তরের পর স্তর খোশা ছাড়াতে পারে। কেউ শুধু খুঁড়ে-খুঁড়ে পৌঁছুতে পারে অধিকতর অনধিগম্য স্তরে। সেই অভিযানের কোনো শেষ নেই।'[২]

লেম, বলাই বাহুল্য, 'আধুনিক' সাহিত্যবিশ্লেষণের পদ্ধতিকে, চিহ্নতত্ত্বের গ্রাম্ভারী ভাবভঙ্গিকে, এইভাবে একটি প্রচণ্ড ঠাট্টার থাপ্পড় কষিয়েছেন। কেননা কোনো বিশেষ লেখার যদি বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ সমাজসম্পর্ক না-ই থাকে, সে যদি হয় স্বয়ম্পূর্ণ স্বয়ন্তর স্বয়ংশাসিত স্বয়ংপ্রসবী রুদ্ধ কোনো ব্যবস্থা, তবে সে এইভাবে

অবিশ্রাম, অন্তহীন, আরো-সব স্বয়ম্পূর্ণ স্বয়ংপ্রসবী রুদ্ধ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েই চলবে।

এর মানে এই নয় যে এই তত্ত্বগুলো থেকে শেখবার আমাদের কিছু নেই। আখ্যায়িকাতত্ত্ব, অন্তত, শেখায় কেমন ক'রে বোনা হয় কোনো আখ্যান, তার কলাকৌশল কলকব্জাগুলো কী-রকম, সেগুলো বেঢপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, না সুষ্ঠুমসৃণভাবে। এগুলো বোঝাও তো সাহিত্যপাঠকের কাজ। কিন্তু আরো-কিছুও বোঝা চাই সেই সঙ্গে। এই তত্ত্বে কখনও স্বীকার করা হয়নি যে যে-কোনো শিল্পেরই আঙ্গিক বা প্রকরণ জন্মায় উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে শ্রমশক্তির অবস্থান থেকে। সেই জন্যেই যুগে-যুগে দেশে-দেশে তার বদল হয়। ফিউড্যাল যুগের আখ্যান, পুঁজিবাদের আগ্রাসনের মধ্যে আখ্যান, উপনিবেশের দো-আঁশলা আর্থ-সামাজিকব্যবস্থার মধ্যে আখ্যান, বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও আখ্যান ভিন্ন-ভিন্ন রূপ লাভ করে। চিহ্নতত্ত্বেও তেমনি *arbitrary* ভাবে, খেয়ালখুশিমাফিক, যে-কোনো বিধিবহির্ভূত চাবি ব্যবহার করা যায় না, যেটা স্তানিসোয়াভ লেম অট্টহাসি হেসে বলেছেন—গূঢ়লেখের মর্মার্থ অনুধাবনের জন্যে সমাজপ্রসঙ্গ থেকেই, যুক্তি তৈরি ক'রে, চাবি বার করতে হবে আমাদের। দেখতে হবে কেন বিশেষ-কোনো আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশে কেন বিশেষ ধরনের আখ্যায়িকা তৈরি হয়—রচিত হয় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, উক্তি ও উপলব্ধির অভেদ। এই সংকলনের পূর্ববর্তী দুটি খণ্ডে আমরা তারই আভাস-ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলাম। এই খণ্ডে বাংলা বাদে গল্প সংকলিত হ'লো উর্দু, পঞ্জাবী, মরাঠী, গুজরাতী, সিন্ধি, তামিল, অসমীয়া, কাশ্মীরী ও গোয়ানিজ থেকে, গোয়ার গল্পটি লেখা হয়েছিলো ইংরেজিতে। অসমীয়া গল্পটি ব্যঙ্গকটাক্ষ পড়েছে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর, গুজরাতী গল্প ছুঁতে চেষ্টা করেছে অস্তিত্ববাদের নিরাশা—একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ দেবার জন্যেই। কিন্তু বাকি সব গল্পই, যে-ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, আমরা দেখতে পাবো দুটি সমস্যা—মেয়েদের সমস্যা ও নিম্নবর্গের মানুষদের সমস্যাই নানা দিক থেকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। কোনো-কোনো গল্পে হয়তো এই দুই সমস্যাই মিলে গিয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের "শাস্তি" গল্পে। কিন্তু সব গল্প প'ড়েই, এমনকী অসমীয়া ও গুজরাতী গল্প দুটি প'ড়েও, আমরা বুঝতে পারি এ-সব গল্প ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য-কোথাও লেখা হ'তে পারতো না। কেমন ক'রে পারি? আখ্যায়িকাতত্ত্বের বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে? না। বরং সেটা বোঝবার জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান-কালের ওপর—স্থান

ভারতবর্ষ, কাল সাম্প্রতিক পরিবর্তমান চিন্তার জগৎ, আর উদ্দেশ্য এই আপাতদৃষ্টিতে অচলায়তন ব'লে মনে-হওয়া এই সমাজ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হওয়া, প্রতিবাদ করা। এই খণ্ডে দলিত গল্পের প্রাচুর্য দেখেই পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমরা কোনদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলাম।

২

সেই কবে অবদানে আর জাতকে লেখা হয়েছিলো জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বুদ্ধের লড়াইয়ের কথা। তারপর ভারত থেকে হঠিয়ে দেয়া হ'লো বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ফিরে এলো প্রবল প্রতাপে, হিংসায় ও তাণ্ডবে। প্রত্যাবৃত্ত শার্লক হোমসের মতো অতটা অক্ষম সে তো নয়ই, বরং ঠিক তার উলটোটাই, সঙ্গে নিয়ে এলো আবারও জাতপাতের বিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই। যখন ইসলাম এলো, এবং তারও পরে যখন ইংরেজ, তখন তারা ইচ্ছাতেই হোক অনিচ্ছাতেই হোক, অস্পৃশ্যতাকে দূর করেনি বা দূর করতে পারেনি। সত্যি-যে কিছু লোক মুসলমান হ'য়ে গেলো, আর পরে খ্রিস্টান—কিন্তু ধর্মান্তর ঠিক সত্যি-কোনো উত্তর বা প্রতিরোধ হ'লো না এই বিভেদনীতির, এই অমানুষিক প্রথার।

সাহিত্য কিন্তু মুখ বুঁজে থাকেনি—অবদানে আর জাতকেই শুধু নয়, কখনও সে নিয়ে এসেছে মঙ্গলকাব্যে ব্যাধ বা কশাইয়ের গল্প, কখনও সে নিয়ে এসেছে লৌকিক সাহিত্যে ব্রাত্য বা অন্ত্যজদের কাহিনী—পাহাড়ি উপজাতি, বেদে যাযাবর, চণ্ডাল, হাড়ি মুচি ডোম—এরা ভিড় ক'রে এসেছে সাহিত্যে। ইংরেজ আসার পর কুমারন আহ্সান লিখলেন চণ্ডালকন্যার কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা', সতীশচন্দ্র রায়ের চণ্ডালীর কাহিনীও সেই একই বৌদ্ধ উৎসকে স্মরণ করলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্রাত্য বা মন্ত্রবর্জিতদের মধ্যে স্বয়ং দেখা গেলো কবিকে, নজরুল ইসলাম বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা এই বর্বর অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ধিক্কারে থরথর ক'রে উঠলো, শরৎচন্দ্র লিখলেন 'বামুনের মেয়ে', আর ভারতীয় রাজনীতিতে আম্বেদকার ও গান্ধির আবির্ভাবের পর আরো অনেক লেখক বিষয় হিশেবে বেছে নিলেন এই জলন্ত সমস্যাটিকে—আক্ষরিকভাবেই জলন্ত, যদি মনে রাখি রোজ কীভাবে হরিজন পল্লিতে আগুন ধরায় ঠাকুর, সিং, এমনকী পুলিশও।

কিন্তু এ যেন কালোদের জন্য শাদা উদারনৈতিকদের ওকালতি, অথবা মেয়েদের জন্য কোনো দরাজদিল পুরুষের উচ্চকিত সমর্থন ও সহমর্মিতা। কালোরা

বা মেয়েরা নিজেরা যতদিন মুখ বুঁজে থাকবে, ততদিন এইসব উদারনৈতিক উচ্চারণকে লোকে বাহবা দেবে বা তারিফ করবে—কিন্তু জীবনে খুব-একটা গ্রহণ করবে না ; হয়তো তা হ'য়ে উঠবে রক্ষাকবচ বা সেফটিভাল্‌ভও, এইই বোঝাতে যে ছাখো, আমরা তো প্রতিবাদ করছিই 'তোমাদের হ'য়ে'। মধ্যযুগের সাহিত্যে ভক্তিবাদ একটা দিক থেকে ভাঙতে চেয়েছিলো এই বেড়া—কিন্তু তার অতীন্দ্রিয়তা তার অধ্যাত্মবাদ হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকেই সুযোগ দিয়েছিলো পুরো প্রতিবাদটাকে ঘুলিয়ে দিতে, যখন সমাজ আত্মসাৎ ক'রে হজম ক'রে ফেলেছিলো ভক্তিবাদের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের দিকটা। জোলা বা তাঁতি যতই তাঁর দোহায় সমাজবদলের কথা বলুন না কেন, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব ছিলো ভক্তিকে মুচড়ে নিংড়ে তা থেকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পক্ষে বাড়তি মজুরি আদায় ক'রে নেয়া।

লিখিত সাহিত্য অনেক সময়েই সুবিধাভোগী শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের (বা আত্মধিকারের) উপায়—কথ্য সাহিত্যের মতো সে সর্বসাধারণের সম্পত্তি নয়, কেননা কিছু লিখতে গেলে আপনার প্রথমে চাই বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণজ্ঞান, বিভিন্ন ধারণা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিশ্লেষণী মনোভাব, যেটা প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই জোগায়—এবং শিক্ষা হ'য়ে ওঠে ক্ষমতারই আধার বা উৎস। আর আমাদের দেশে কাস্ট আর ক্লাস—অর্থাৎ বর্ণবিভেদ আর শ্রেণীবিভাগ—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একে আরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, একটা আরেকটার সঙ্গে মিলে যায়, একটা আরেকটাকে মদত জোগায়। একমাত্র উচ্চবর্ণের এবং অর্থসম্পন্ন লোকেরাই এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুনাফা জবরদখল ক'রে নিতে পারে—কেননা বর্ণমাহাত্ম্যের দৌলতে তারা পার্থিব আখেরও গুছিয়েছে।

কিন্তু নতুন-একটা সাহিত্যের জন্ম হ'লো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, যখন অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্যদের মধ্যেও কেউ-কেউ শিক্ষার সুযোগ পেলো—হ'তে পারে তারা অনেকগুলো পাশ দিয়ে বিদ্যাদিগগজ হবার সুযোগ পায় না, কিন্তু একটুতেই তারা বুঝে নিতে পারে (যেহেতু সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক জীবন) কেমনভাবে তারা আত্মপ্রকাশ করবে শিল্পসাহিত্যে, কী হবে বা ভাবে তাদের ভাষা, কী তাদের বক্তব্য। আর তাদের এই অনুধাবনটি প্রায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জাগরণের সমান্তর—শুধু তৃতীয় বিশ্বই বা কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো তথাকথিত মুক্ত চিন্তার দেশে ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে কালোদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সমান্তর।

সমান্তর এইজন্যে যে সমাজের নিচুতলা থেকে যাঁরা পঞ্চাশের শেষে বা ছয়ের

দশকের গোড়ায় তাঁদের আন্দোলনের সপক্ষে রশদ সংগ্রহ করেছিলেন, তার অনেকটাই এসেছিলো অন্যান্য দেশের শোষিত ও বঞ্চিত ও পদদলিতদের সাহিত্য-পাঠে। মহারাষ্ট্রে যখন দলিত সাহিত্যের জন্ম হ'লো, তখন দলিতরা একসময় নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন দলিত প্যান্থার হিশেবে—মার্কিন দেশের ব্ল্যাক প্যান্থারদের মতোই। কিন্তু তাই ব'লে এটা ভাবাও ভুল হবে যে তাঁদের সমস্ত প্রেরণা বা উদ্দীপনা এসেছিলো বিদেশ থেকে : তাঁরা বারে-বারে স্মরণ করেছেন বুদ্ধের অনুশাসন, স্মরণ করেছেন জাতক ও অবদানের কাহিনী ; কিন্তু বদল যেটা হ'লো সেটা বুদ্ধকে স্মরণ ক'রেও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র চেষ্টায়—অসাড় অপ্রতিরোধী ভাবে বুদ্ধের স্মরণ বা শরণ নেয়ায় নয়, যা অনেক সময়েই বুদ্ধের নির্বাণ বা অহিংসাকে মেনে নেয় না, মেনে নেয় শুধু ততটুকুই যতটুকু তাঁদের মনে হয়, নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রে নেবার পর, আধুনিক কালের উপযোগী। এ-বিষয়ে প্রবন্ধ আছে তাঁদের, স্মৃতিকথা আছে, আছে তর্কাতর্কি, সন্দর্ভ ও আখ্যায়িকা—আছে গল্প ও কবিতা। সেইরকমই ক-টি গল্প প্রকাশিত হ'লো এখানে, যা হয়তো বাঙালি পাঠকের কাছে অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে সজোরে স্ব-কণ্ঠে অনেক কথা ঘোষণা করবে। মনে রাখা উচিত, দলিত সাহিত্য আজ আর শুধু মহারাষ্ট্রের সম্পত্তি বা আন্দোলনের হাতিয়ার নয়—ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেও তার প্রকাশ দেখা যাবে। সাম্প্রতিক কন্নড় সাহিত্যেরও একটি শক্তিশালী ধারা হ'লো সে-ভাষার দলিত সাহিত্য।

গুজরাতে আজ যে-হানাহানি চলেছে গত ক-বছর ধ'রে—সংরক্ষণ প্রথার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণের লোকদের সুবিধে বজায় রাখার জন্য লাগামছেঁড়া হিংস্রতা—মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা রাজস্থানে যার প্রকাশ ঘটে অনবরতই, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্পগুলোর উপযোগিতা নিশ্চয়ই কাউকে বিশদ ক'রে ব'লে দেবার দরকার নেই। যে-সব রাজ্য বড়াই করে যে আমাদের ওখানে 'ও-ভাবে' বর্ণভেদ নেই, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, তাদের এটাও যে নিছকই মুখের কথা, এটাও মনে-রাখা উচিত। আবারও বলা উচিত, রেস আর ক্লাস যেমন একজায়গায় গিয়ে এক হ'য়ে যায়, তেমনি কাস্ট আর ক্লাসও ভারতবর্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই আজ এক। যাদের এতকাল পদদলিত ক'রে রাখা গেছে, তারা তাদের অধিকার দাবি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই চালালে ওপরতলার লোকদের তা সহ্য হবার কথা নয়—এবং সহ্য যে হয়নি, তা তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্প্রতিক হানাহানির ছবি থেকেই স্পষ্ট। এটা প্রচণ্ড আশার কথা যে দলিতদের জন্য আজ আর

গাদ্ধিদের মতো বানিয়া আর উকিল দরকার হয় না—দলিতরা নিজেদের কথা বলছেন। এটাই কি ওপরতলার লোকদের গায়ের জালার আরেকটা কারণ? ফিউড্যাল আমল থেকেই আমাদের পেট্রন বা পাত্রোন হওয়ার বদভ্যাস আছে—আমরা ভেবেছিলাম আমরা কোনো-কোনো পদদলিত গোষ্ঠীরও পেট্রন বা পৃষ্ঠ-পোষক হবো আর তাতে আমাদের মহিমা বা গরিমাই বাড়বে; এখন যদি দেখি আমার পিঠচাপড়ানোর তোয়াক্কা না-রেখে এককাট্টা হ'য়ে তারা কোনো আন্দোলনে নেমে পড়েছে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের আত্মাভিমানেই ঘা লাগে। সুখের কথা যে দলিতরা আমাদের ক্ষুব্ধ বা আহত আত্মাভিমানেরও কোনো তোয়াক্কা না-ক'রে নতুন একটি সাহিত্যের জন্ম দিচ্ছেন, যেটা শুধু বিষয়বস্তুর জন্যই নয়, রচনাশৈলীর জন্যও বারে-বারে শিরোপা পাবার যোগ্য। আমি অবশ্য বিষয়-বস্তুর ওপরই জোর দিতে চাই—শুধু রচনাশৈলীকেই বাহবা দিয়ে এর উদ্দেশ্য-ময়তাকে আড়াল ক'রে রাখতে চাই না—আর সেইজন্যেই গোড়ায় আখ্যায়িকা-তত্ত্বের অবতারণা ক'রে আমি বলতে চেয়েছিলাম সে-তত্ত্ব কতটুকু গ্রহণযোগ্য, কতটাই বা আমাদের উদ্দেশ্যর পক্ষে অবান্তর।

দলিতদের মধ্য থেকে প্রথম যে-লেখকরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শঙ্কররাও খারাট প্রধান (জন্ম ১৯২২, সাঙলি জেলার একটি গাঁয়ে)। পুণের এস. পি. কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর পুনা ল কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়েছিলেন। ড. বি. আর. আম্বেদকারের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে কাজ করেছিলেন তিনি, পুণের বস্তিতে কাজ করেছিলেন, পরে ঔরঙাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'মানুষের হক' বেরোয় ১৯৫৮তে, সেই বছরই বেরোয় তাঁর প্রথম বই 'বারোজন গ্রামভৃত্য'—সেই প্রথম মরাঠী ভাষায় গ্রামের অস্পৃশ্য ও অন্য-সব নিম্নবর্ণকে নিয়ে লেখা বই বেরুলো। এই বারোজন 'বালুতেদারের' মধ্যে একজন মাহার ভৃত্য ছিলেন স্বয়ং শঙ্কররাওয়ের বাবা। ছোটোগল্প ছাড়াও ড. আম্বেদকার এবং বৌদ্ধধর্মান্তর আন্দোলন বিষয়েই তিনি বই লিখেছেন। এই গল্পের মাহার 'পোটরাজে'র ছেলে (বৌদ্ধ হবার আগে ওলাউঠার দেবী মারী-আইয়ের পূজক সবসময় হ'তো মাহার) গাঁয়ের লোকদের ধাপ্পা দিয়েছিলো, যাতে অস্পৃশ্যতার ফাঁদে প'ড়ে বাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে তার লেখাপড়ায় বাধা না-পড়ে। কুসংস্কার আর অস্পৃশ্যতার বন্ধন—দুয়ের বিরুদ্ধেই ছিলো তার লড়াই, শঙ্কররাও খারাটের বৈশিষ্ট্য এটাই যে উন-কথনের মধ্যে দিয়ে তিনি এ-সব সমস্যাকে প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিতভাবে ছুঁয়ে যান।

অন্ত অনেক দলিত লেখকদের চাইতেই বাবুরাও বাগুল আলাদা—তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি, এবং 'উন্নতি' ক'রে মধ্যবিত্তও হ'য়ে যাননি, তাঁর শৈশব কেটেছিলো কঠোর দারিদ্রে—গ্রামে এবং মুম্বাদেবীর শহরে;—তিনি বলেন এক মুসলমান প্রতিবেশীর সৌজন্যেই তিনি লিখতে-পড়তে শিখেছিলেন। তাঁর প্রথম বই 'আমি যখন আমার জাত ছেড়ে এলাম' বেরিয়েছিলো ১৯৬৩-তে। দ্বিতীয় বই 'মৃত্যু বড়ো শস্তা হ'য়ে যাচ্ছে' বেরোয় ১৯৬৩এ, আর তৃতীয় বই 'শোধ' বেরোয় ১৯৬৩এ। তাঁর লেখায় বাস্তব দগদগে ঘা-এর মতো সত্য হ'য়ে ফুটে ওঠে; মরাঠী বর্ণহিন্দুর রচনার চাইতে কী বিষয়বস্তুর নির্বাচনে কী ভাষা-ব্যবহারে তাঁর লেখা স্বতন্ত্র হ'য়ে তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করে।

আনন্দ যাদবকে এককালে সমালোচকেরা 'গ্রাম্য' লেখক হিশেবে বর্ননা করেছিলেন, আর এই 'গ্রাম্য' অভিধা ছিল রচনায় পরিশীলিত বোধের অভাবেরই নামান্তর। 'জীবিতরা' গল্পটি বেরিয়েছিলো ১৯৬৩এ— 'সত্যকথা' পত্রিকায়। কোনো হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত একজন অনিচ্ছুক উদাসীন দর্শকের চোখ দিয়ে পুরো সৎকারের রীতিটাকে খুলে দেখানো হচ্ছে— এতই চাক্ষুষ ও সজীব যে আমাদের সন্দেহ থাকে না এর ঘটনাস্থল হয় পুণের ওঙ্কারেশ্বরের শ্মশান কিংবা আরো পশ্চিমে কোনো অব্রাহ্মণকে পোড়াবার শ্মশান —সেতুর ওপাশেই আধুনিক সাহেবি কেতার বাড়িঘর; স্পষ্টতই বস্তির লোকদের চিতায় তোলবার জন্যে এখানে কিছুকাল পরেই আর শ্মশান থাকবে না—যাতে সাহেবি মরাঠীদের জীবনযাপনে এই মৃতেরা হানা না-দেয় এই ব্যবস্থাই সম্পন্ন হবে। কোথাও এ-কথাটি মুখ ফুটে বলা হয়নি—কিন্তু যাদবসাহেবের আচ্ছন্ন ঘোর ও বিস্মৃতপ্রায় রীতিপালন ও শহরের বর্ণনার মধ্যে দিয়েই এই চাপা বিষয়টি সজীবভাবে ফুটে ওঠে।

অবিনাশ দোলাস আর ভীমরাও শিরওয়ালে সাম্প্রতিক মরাঠী সাহিত্যের ধারায় সামাজিক বাস্তববাদেরই একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

কর্তার সিং দুগগল (জন্ম ১৯১৭) লিখতে শুরু করেন ছাত্রজীবনেই, তাঁর সব লেখাই পঞ্জাবীতে, যদিও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গল্প অনুবাদ হ'য়ে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পের সংকলন 'ইক ছিট চনন ভি' ১৯৬৫-তে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলো, ১৯৬৩ এ তিনি তাঁর উর্দুতে অনূদিত নাটকের জন্যে মির্জা গালিব পুরস্কার পেয়েছিলেন। "অলৌকিক" গল্পটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে কেমন ক'রে বাস্তব থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে কিংবদন্তির একটি

আলাদা জমি তৈরি হ'য়ে যায়—একটি অতীত প্যারাবলের মতোই জন্ম হয় নতুন এক প্যারাবল, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সহমর্মিতার বোধে যা তীব্র একটি চাপ তৈরি ক'রে দেয় শেষে। এটাই আশ্চর্য যে সম্প্রতি যে-বিচ্ছিন্নতাবাদের শক্তি-গুলো পঞ্জাবে-হরিয়ানায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কর্তার সিং দুগ্‌গলের এই গল্পটি তার থেকে কতদূরে অবস্থিত।

'অশোকমিত্রন' নামটি, সাম্প্রতিক তামিল কথাসাহিত্যের অনেক লেখকের নামের মতোই, ছদ্মনাম: তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প প্রকাশ করার সময় জ. ত্যাগরাজন 'অশোকমিত্রন' নামটিই ব্যবহার করেন। মাদ্রাজনিবাসী ত্যাগরাজন কিছুকাল আগে একবার ক্রিয়েটিভ রাইটিং বিভাগে ফেলোশিপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন। গল্প ও উপন্যাসে অশোকমিত্রন সাধারণত উনকথনের পক্ষপাতী, সূক্ষ্ম একটি চাপা শ্লেষের বোধও তাঁর রচনায় অন্য একটি মাত্রা যোগ ক'রে যায়; আখ্যায়িকারচনার বিভিন্ন প্রণালী নিয়েও বহুবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন অশোকমিত্রন, কিন্তু তাঁর রচনার জগৎ দুঃস্থ ও নিঃস্ব মানুষদের জীবনযাপনের গ্লানি ও কঠোর সংগ্রামের কথাই মনে করিয়ে দেয়। "বাঘ" গল্পের 'ট্যাগার' কাদের ওরফে শের কাদের একই সঙ্গে দুই মানুষ—শিল্পী হিশেবে সে মুহূর্তে তৈরি ক'রে দিতে পারে হিংস্র ও ভয়াল একটি বাঘকে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে এতটাই অসহায় ও সম্বলবিহীন যে তাকে দেখলে কখনোই বোঝার উপায় থাকে না সে ও-রকমভাবে বদ্‌লে গিয়ে স্বয়ং বাঘ হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু অশোকমিত্রন আরো-একটি জমি তৈরি ক'রে যান তাঁর আখ্যায়িকায়, যখন সফল ও শস্তা ব্যাবসাদার তামিল চলচ্চিত্রের জগৎ সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ হানেন। অশোকমিত্রন যে একসময়ে তামিল চলচ্চিত্রে সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখতেন, তাঁর এই অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে দারুণভাবে কাজে লেগেছে। চলচ্চিত্রের ফ্যানটাসির জগৎ কেবল যে তারকারাই তৈরি করেন না, সেইসঙ্গে বিস্তর কলাকুশলী ও অন্যান্য জীবিকার লোকজনও জড়িত, এবং তাদের নিজেদের অবস্থা যে খুব-একটা ভালোও নয়, এটাও ফুটে ওঠে যখন আপিশের লোকরা তাদের পকেট হাৎড়ে মাত্র দুটি টাকাই তুলে দিতে পারে কাদেরের হাতে।

অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনন্দন বরার খ্যাতি ছড়িয়েছিলো 'গঙ্গাচিলেনির পাখি' উপন্যাস বেরুবার পর—বিশেষত তার চলচ্চিত্ররূপ কিছুকাল আগে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলো। 'গাঙচিলের ডানা' উপন্যাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন কেমনভাবে ছোটোখাটো খুঁটিনাটির বর্ণনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীনন্দন

বরা কেমন ক'রে একটি সম্পূর্ণ জগৎকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সেই জগতের ঋতুচক্র, পালাপরব, উৎসব-অনুষ্ঠানকে তিনি যে সজীব চাক্ষুষ ভাবে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলেন তা-ই নয়, মানুষজনও তাদের স্ফুট-অস্ফুট সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন্তভাবে আমাদের মুখোমুখি উপস্থিত হয়; বিশেষত 'গাঙচিলের ডানা'র বাসন্তীকে ভোলা হয়তো কখনোই অসমীয়া সাহিত্যের পাঠকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু শ্লেষ-টিটকিরি-ব্যঙ্গের গল্পেও তাঁর শিল্প-বোধ এমনভাবে প্রকাশিত হয়, যা এই "মহাপতন" গল্পের পাঠকরা প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভব করবেন।

ঘনশ্যাম দেশাইয়ের গুজরাতী গল্পটি "কাক" প্রায় কবিতার মতোই যে-জগৎকে ফুটিয়ে দিয়ে যায়, সেটা মানসিক জগৎ যতখানি, ততখানিই কিন্তু বাস্তব সামাজিক জগৎ—একটা আরেকটার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে ভাঁজে-ভাঁজে মিশে আছে। এই সংকলনের গল্পগুলোর মধ্যে "কাক" গল্পটির সুর একটু ভিন্ন—কিন্তু কাশ্মীর থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত যে নিম্নবর্গের জগতে আমরা প্রবিষ্ট হয়েছি, তাকে হয়তো ভালো ক'রে বোঝবার জন্যে ঘনশ্যাম দেশাইয়ের গল্পটির অন্য-একটি জমির সঙ্গেই অন্বিত বা তুলনা ক'রে দেখা উচিত।

চল্লিশের যুগে উর্দু কথাসাহিত্য সৃজনশীলতার একটি দারুণ জোয়ার এসেছিলো—সাদত হাসান মাণ্টো, গুলাম আব্বাস, কৃষণচন্দর, রাজিন্দর সিং বেদি, শওকৎ সিদ্দিকি—এমনতর অনেক নামই আমাদের পর-পর মনে প'ড়ে যাবে। মুনশি প্রেমচন্দের অনতিকাল পরেই উর্দু ছোটোগল্পে এই-যে নতুন ঢেউ উঠেছিলো, তাতে কিন্তু একই সঙ্গে এই বিখ্যাত কথাসাহিত্যিকেরা গল্প লিখলেও কারু স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যই কিন্তু আমাদের অগোচর থাকে না। গুলাম আব্বাস (জ. ১৯০৯-১৯৬৩) তুলনায় তেমন অতিপ্রজ না-হ'লেও তাঁর প্রতিটি গল্পই সূক্ষ্ম শিল্পিতায় ও কারুকর্যে পাঠকমহলে চিরকাল অভিনন্দিত হ'য়ে এসেছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য তার স্ফুট-অস্ফুট উনকথন আর চাপা আততি আর লঘু ব্যঙ্গের বোধ—যেটা এই "গাজি মর্দ্" গল্পের পাঠকদেরও নজরে আসবে। কিছুকাল আগে শ্যাম্ বেনেগাল তাঁর একটি ছোটোগল্প অবলম্বনে "মাণ্ডি" ছবিটি তৈরি করেছিলেন। দেশভাগের পর গুলাম আব্বাস স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পাকিস্তানকে বেছে নিলেও এই উপমহাদেশের কথাকার হিশেবেই তাঁকে আমরা গণ্য করেছি। "গাজি মর্দ্" গল্পটির প্রখর শ্লেষ কোথাও উগ্রভাবে ফুটে বেরোয়নি, কিন্তু 'মাচো' বা 'মাচিস্‌মো' বা পুরুষদের শভিনিস্‌ম্ সম্বন্ধে এটি যে একটি

অসাধারণ গল্প সেটা যে-কেউ স্বীকার করবেন। 'মাচিস্‌মো' যে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্য, এবং নারী ও পুরুষ দুয়েই যে একে এতকাল টিকিয়ে রেখেছে, এটা আলিয়া অন্ধ যুবতী চিরাগবিবিকে বিয়ে-করার পর থেকেই বোঝা যায়। আলিয়া যেমন চিরাগবিবিকে বিয়ে ক'রে ভেবেছিলো সকলের শাবাশী বা বাহবা পাবে, তেমনি চিরাগবিবিও মনে-মনে জানে আলিয়ার মতো চৌকশ বাহাদুর যুবক তাকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ায় সে একেবারে 'ধন্ত' হ'য়ে গিয়েছে। আলিয়া এখন পস্তায় কিনা জানি না, কিন্তু চিরাগবিবি এই ধারণাটাকে জিইয়ে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে তার সংস্কার, পুরুষের প্রাধান্ত সম্বন্ধে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। এই চাপাশ্লেষের আড়ালেও গুলাম আব্বাস কিন্তু সহজেই পারেন তাঁর সহানুভূতির বোধটিকে প্রকাশ ক'রে দিতে, আলিয়াকে গাজি মর্দ্‌ ব'লে ব্যঙ্গ ক'রে এই অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গকেই প্রতিবাদের হাতিয়ার ক'রে তুলতে পারেন তিনি : কিন্তু, আগেই যেটা বলেছি, কোনোকিছুই উগ্রভাবে নয়, আস্তরের পর আস্তর তৈরি ক'রে সেখানে শ্লেষকে লুকিয়ে রাখতেই তাঁর দক্ষতা বেশি।

এই 'মাচিস্‌মো' এবং তাতে নারী-পুরুষের যে সমান দায়িত্ব আছে, এটা ইস্‌মত চুগতাইয়ের "ঘরওয়ালি" গল্পেরও প্রসঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তেই পারে "ঘরওয়ালি" হয়তো মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের ফ্যানটাসি সম্বন্ধে হালকা স্বরে লেখা রসালো ও উচ্ছল একটি ঠাট্টা—আর এরই আড়ালে সমাজের ভণ্ডামি সম্বন্ধে টিপ্পনীগুলো যে-রকম লাগসই ভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তাও হয়তো কারু নজর এড়াবে না। 'আম্মা, বহিন, লেড়কি, বিবি'—এর বাইরে হ'লেই মেয়েদের আরেকটাই পরিচয় হবে—'ছেনাল'—সে-সম্বন্ধেও হয়তো প্রতিবাদটা চোখে পড়বে। যেন 'আম্মা বহিন লেড়কি বিবি' অথবা রক্ষিতা (অর্থাৎ অন্ত-কারু সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছাড়া) স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, নিছক মানুষ হিশেবে, মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতা নেই।

এ-গল্প পড়তে-পড়তে অবশ্য আরো-একটি মোক্ষম তথ্যও পাঠকের নজরে এসে যাবে। ব্রাজিলের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোর্জে আমাদু (জন্ম ১৯১২) পোর্তুগিস ভাষায় ১৯৫৮-তে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন, ইংরেজি তর্জমায় (১৯৬২) যার নাম 'গাব্রিয়েলা, ক্লোভ অ্যাণ্ড সিনামোন', যেটা ১৯৬৩ সালে মার্চেল্লো মাস্ত্রোয়ানি ও সোনিয়া ব্রাগা অভিনীত 'গাব্রিয়েলা' চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্যাকাও খেতখামারের একটি লোকগীতি ছিলো এইরকম :

দারচিনির মতো গায়ের রং,
লবঙ্গের মধুর সুঘ্রাণে টৈটুম্বুর,
আমি অনেক রাস্তা পেরিয়ে এলাম
গাব্রিয়েলাকে দেখতে।

এ হেন গাব্রিয়েলাকে নিয়ে লেখা হ'লেও জোর্জে আমাদুর উপন্যাসের পটভূমি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত—ফিউড্যাল কর্নেলদের হাত থেকে কী ক'রে ধীরে-ধীরে ব্রাজিলের ধনসম্পদ বুর্জোয়াদের হাতে এসে পড়েছিলো, সেই বিশাল সামাজিক পটভূমিও ছিলো উপন্যাসের উপজীব্য -- কেননা নারীপুরুষের সম্পর্কের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকটার কথা ভাবতে গেলে আর্থ-রাজনৈতিক পটকেও বাদ দেয়া অসম্ভব। কিন্তু সেই আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের কাহিনী বাদ দিলে 'গাব্রিয়েলা'র কাহিনী যা দাঁড়ায়, "ঘরওয়ালি"র লাজোর কাহিনীও হুবহু তাই। এই দুই কাহিনীর এমন আশ্চর্য মিল দেখে কেউ কি বলতে প্রলুব্ধ হবেন যে তৃতীয় বিশ্বের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা মূলত একই রকম? না কি এ-রকম একটি ধারণা তৈরি হ'তে পারে যে, অন্তর্পাঠ তৈরির তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি থেকেই আরেকটি রচনার জন্ম হয়েছে? হয়তো পাঠক তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে এই হেঁয়ালিটির সমাধান করতে পারবেন।

লুসিও রডরিগস (১৯১৬-১৯৬৩) ছিলেন বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উজ্জ্বল' ছাত্রদের একজন। গোয়ার এই লেখক সালাজারের আমলে 'দি লিবারেশন মুভমেণ্ট' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন—শুধু-যে পোর্তুগিস সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীনতা আদায় করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো তা নয়—তিনি চেয়েছিলেন গোয়ার সামাজিক অবস্থানের আমূল সংস্কার, আর আরো চেয়েছিলেন গোয়াকে ভারতীয় মূল ধারার সঙ্গেই অন্বিত করতে। পোর্তুগিস বংশোদ্ভূত সচ্ছল শ্রেণী, যারা এই কিছুকাল আগেই লিসবনকে তাদের স্বর্গ ব'লে মনে করতো, তারা লিখতোও পোর্তুগিসে, ছিলো দো-আঁশলা সম্প্রদায়—তারা পোর্তুগিসে না-লিখতে পারলে লিখতো ইংরেজিতে; আর কোঙ্কনি—তারা যে শুধু গোয়াতেই ছিলো তা নয়, কর্নাটক ও কেরালার কোনো-কোনো অংশেও তাদের বাস ছিলো—কিন্তু তাদের মধ্যে ধীরে-ধীরে গজিয়ে উঠছিলো এক সংহতির বোধ। লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন লুসিও রডরিগস চেয়েছিলেন এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃজনশীল আদানপ্রদান—তাঁর ইচ্ছে ছিলো 'এক্সোগ্যামি' মারফৎ এমনকী যেন এদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে বৈবাহিক সম্বন্ধ, রক্তের সম্বন্ধ। গোয়ার স্বাধীনতা লাভের সময় সচ্ছল সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনেকেই

পোর্তুগাল, আফ্রিকা (মোজাম্বিক, আঙ্গোলা, ও পূর্ব আফ্রিকার কোনো-কোনো দেশেই প্রধানত) ও পশ্চিমের কোনো-কোনো দেশে স্বেচ্ছাদেশান্তরী বেছে নিয়েছিলো। যারা থেকে গিয়েছিলো তারাও চেয়েছিলো, সুযোগসুবিধে পেলেই, ইওরোপ চ'লে যাবে। এখানে লুসিও রডরিগসের যে-গল্পটি সংকলিত হ'লো, তার মধ্যে এইসব প্রসঙ্গকে আলতোভাবে ছুঁয়ে-যাওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রধান প্রসঙ্গটি শ্রেণীসংঘাত—এবং তার মধ্যে মেয়েদের অবস্থান। শ্রেণীবৈষম্যের বিভিন্ন পরিমণ্ডল আছে—কিন্তু এই শ্রেণীসংঘাতের মধ্যেও সবচেয়ে নিচের তলায় যাদের অবস্থান, তারা মেয়েই। এক অর্থে হয়তো এমনও বলা যায় মেয়েদের অবস্থার বদল হ'লে হয়তো আমরা শ্রেণীসংঘাতের চরিত্রটিরও আমূল বদল ঘ'টে যেতে দেখবো। গল্পটির ছোট্ট পরিসরেই বিভিন্ন জমি তৈরি ক'রে দিয়েছেন লুসিও রডরিগস; চাষীদের জগৎ—যেখানে নারী-পুরুষ সকলেই কাজ করে একসঙ্গে ; পরজীবী জমিদার সম্প্রদায় যারা উপভোগ করে তাদের আলস্য ও অবসর—কেননা শোষণ মারফৎ তারা টিকে থাকে ; আরো-একটা জমি আছে, যখন গাঁয়ের মেয়েরা হাট থেকে ফেরে, তারা আলোচনা করে, রাখঢাক বাদ দিয়েই, ফিলমুর ভাবী দশা কী হবে। সরল, তীক্ষ্ণ, অব্যবহিত এই গল্পটির মধ্য দিয়ে লুসিও রডরিগস আশ্চর্যভাবে ছুঁয়ে গিয়েছেন গোয়ার সমাজের বহুবিধ স্ফুট-অস্ফুট আততিকে।

অবশ্য কেমনভাবে শ্লেষ ও মমতা ব্যবহার ক'রে অনেকগুলো স্তরকে ছুঁয়ে গিয়ে তৈরি করা যায়, চমকপ্রদ ক্ষুদ্র আয়তনে, তার দুর্ধর্ষ নিদর্শন হিশেবে রবীন্দ্রনাথের "শাস্তি" গল্পের কথা উল্লেখ করতে অনেকেই প্রলুব্ধ হবেন নিশ্চয়ই। "শাস্তি" গল্পের ভেতর আছে জাতপাতের প্রশ্ন, জমিদার ও ভাগচাষীর সম্বন্ধ মধ্যবর্তী স্তরে ব্রাহ্মণদের কূটকচাল, তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে মেয়েদের অবস্থা এই সমাজে কী—বলি হওয়া ছাড়া তাদের আর-কোন ভূমিকা আছে—এই প্রশ্নটি। ছিদাম যখন বলে, "ঠাকুর, বউ গেলে পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না," তখন আমরা, এই কঠোর-কঠিন যুক্তি (আর যুক্তি দিয়ে সব অপকর্মকেই তো চালিয়ে দেয়া যায় অনন্যোপায় কর্তব্য হিশেবে) শুনে যতটা আঁৎকে উঠি, তার চেয়েও বেশি আতঙ্ক জাগায় কথক যখন তার সন্দর্ভে বলেন, "যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে এক্টা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিত ভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।" তাড়াতাড়িতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কিছু না-ভেবেই তাহ'লে প্রথম মনে হয় দোষ চাপিয়ে দেয়া যায়

নিরপরাধ কোনো মেয়েমানুষের ঘাড়ে! এমন স্বতঃস্ফূর্ততা আসে কোথেকে? পরবর্তী যুক্তি ও প্রবোধের সঙ্কম্প্র চেষ্টার তাৎপর্য বোঝা যায়, কিন্তু সত্যিকার বিভীষিকা হ'লো হুম ক'রে নিজের বৌ-এর ঘাড়ে এই হত্যার বোঝা চাপিয়ে দেয়ায়: জমিদারের পেয়াদা এসে জবরদস্তি ক'রে ছিদাম আর দুখিরামকে নিয়ে গিয়েছে—বেগার খাটিয়েছে, শুধু-একটু জলপানের বিনিময়ে, যেমন খাটে ভাতুয়ারা. বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে, উচিত মজুরি পায়নি, তার ওপর শুনেছে তিরস্কার ও কটুকাটব্য। দুখিরামের মেজাজ খারাপ হবার কারণ এক দুই তিন ক'রে পর-পর সাজানো হয়েছে: "সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষ বচন. বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ ["ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব?"] দুখিরামের হঠাৎ কেমন অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি!" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না-ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল।' কিছু না-ভেবেই, জন্তু হ'য়ে গিয়ে (ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায়), দুখিরাম স্ত্রীকে হত্যা করে। কিছু না-ভেবেই, ছিদাম হত্যার অপরাধ স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয়। এবং কিছু ভাবতে পারেন ব'লেই রামলোচন চক্রবর্তী গোড়ায় না-জেনে সত্যের মর্মস্থলে হাত দিয়েছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই 'ভীষণ সত্যের চেয়েও ভীষণ মিথ্যার পক্ষে' চ'লে গিয়েছিলো, আর কিছু জানতে না-চেয়েই, কেননা স্ত্রীলোক এই উঁচু-তলা থেকে নিচুতলায় সটান গড়িয়ে নেমে আসার সময় সবচেয়ে নিচের স্তরেই থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প এই সামাজিক সত্যের নিষ্ঠুর উন্মোচনের মধ্যেই ব্যক্তি হিশেবে আলাদা ক'রে ছিদাম-চন্দরার বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সম্বন্ধটিকে ফুটিয়ে তুলে এই ছোটো গল্পটিতে আরো-একটি আয়তন যোগ করেছেন। ফাঁসির ঠিক আগেই, চন্দরার তীব্র অভিমান, ছোট্ট সংক্ষিপ্ত একটি কথায় যার অমোঘ প্রকাশ, 'মরণ!' —এর তীব্রতা ব্যক্তিসম্বন্ধের বিশেষত্ব বুঝিয়ে দেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা কিছুতেই সামাজিক সত্যগুলোকে আড়াল ক'রে দেয় না, বরং স্বামীর প্রতি এই তীব্র অভিমান শেষ অব্দি ছিদাম মারফৎ—তার মধ্য দিয়ে—যে-লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, সেটা এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীর অবস্থান—এবং ধীরে-ধীরে অভিমান বদ্‌লে যায় প্রতিবাদে।

যেমনভাবে কান্না বদ্‌লে যায় প্রতিবাদে মহাশ্বেতা দেবীর (জ. ১৯২৫) গল্প "রুদালী"তে। শনিচরীর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে; স্বামী মরে, ছেলে মরে,

ছেলের বৌ বেশ্যা হ'য়ে যায়, নাতি হয়োয়া ভেগে পড়ে কোথায় কোন অলীক বুনোহাঁসরূপী সার্থকতার সন্ধানে—শনিচরী একফোঁটাও কাঁদে না, বেঁচে-থাকার কঠোর, নিরন্তর সংগ্রাম তাকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে ব্যক্তিগত কোনো শোকপ্রকাশ বা কান্নার মধ্যে দিয়ে নিজেকে হালকা ক'রে দেবার কোনো উপায়ও তার আর নেই। কিন্তু কান্নার অভিনয় হ'য়ে ওঠে শুধু জীবিকারই একটা উপায় নয়—প্রতিবাদেরও একটা ব্যবস্থা, যেখানে :

শুধু কাঁদলে একরকম রেট।

কেঁদে লুটোলে পাঁচটাকা এক-সিকে।

কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচটাকা দু-সিকে।

কেঁদে বুক চাপড়ে শ্মশানে গিয়ে লুটোপুটি খেলে ছয়টাকা দিতে হবে।

কিরিয়াতে কাপড় চাই। সে-কাপড় কালো থান হ'লেই ভালো।

এ হ'লো রেট। তারপর, রাজালোক তুমি, চালের সঙ্গে ডাল-নিমক-তেল দিলে না-হয়? লক্ষ্মী বেঁধেছ ঘরে, ও চাল-তেল তোমার গায়ে লাগবে না।

মহাশ্বেতা দেবীর "দ্রৌপদী" গল্পে নারীত্ব, নারীর নগ্নতাই, হ'য়ে উঠেছিলো শানিত অস্ত্র। এখানে যে-কান্না প্রিয়জনের মৃত্যুতে চোখ ফেটে বেরোয় না—দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে দু-দণ্ড ফুরসৎ নেই ব'লে—সেখানে সব চোখের জল জমা হ'য়ে থাকে কখন জীবিকার উপায় হ'য়ে উঠবে এই প্রতীক্ষায়। ক্রন্দন, রোদন, শোক-প্রকাশ এক তীব্র ব্যঙ্গ ও টিটকিরির মধ্য দিয়েই রূপান্তরিত হ'য়ে যায় 'বিশ্রী চোখ মটকানি'তে। প্রতিবাদে, আঘাতে, জাতপাত শোষণ নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক অধঃপাতের সবকিছুর মধ্য থেকে নিরস্ত্রদের হাতে এই ভয়ংকর অস্ত্র তুলে দেন মহাশ্বেতা দেবী, আর গম্ভীর সিং-এর পেটফোলা ঘা-পচা গন্ধ-ছেটানো লাশকে ঘিরে রুদালী রাণ্ডিরা মাথা কুটে কাঁদতে থাকে। জাতপাতের বিভেদ শ্রেণীবিভেদ এই-সবের মধ্যে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হ'লো স্ত্রীলোক, তাই দ্রৌপদী মেঝেন বা শনিচরীরা যখন শেষ মুহূর্তে ঠিক ক'রে নেয় তাদের নারীত্ব বা বেঁচে-থাকার উপায়টাকেই তাঁরা ব্যঙ্গ টিটকিরি প্রতিবাদে রূপান্তরিত ক'রে দেবে, তখন মহাশ্বেতা দেবীর রচনা নিছক মানবিকতার দোহাইই পাড়ে না আমাদের কাছে—নিরস্ত্রের রণকৌশলের উদ্ভাবনী শক্তি সম্বন্ধে আমাদের এই উদ্দেশ্যে সচেতন করে যে এবার অন্যকোনো শস্ত্রধর রণকৌশল বার করা যায় কিনা—সেটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।

আখতার মহি-উদ্-দিন (জন্ম ১৯২৮) কাশ্মীরী ভাষার বিখ্যাত ছোটোগল্প লেখক। ১৯৫৫-তে, মাত্র ২৭ বছর বয়েসেই তিনি তাঁর ছোটোগল্পের জন্য

অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষদের ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ ছবির সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণীসংঘাতের বাস্তব দশা। খোয়াজা মুমার তাৎক্ষণিক আমোদ-বিলাস-ফুর্তি অন্য-কারু মৃত্যু ঘটায়—এটা এতই সত্য যে এই নির্দিষ্ট বিশেষ থেকে আমরা একটি সাধারণ অবস্থার ও হদিশ পেয়ে যাই। অশোকমিত্রনের "বাঘ" আর আখতার মহি-উদ্-দিনের "বরফগোলার খেলা" আমাদের আক্ষরিকভাবেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অব্দি মানুষ কীভাবে বাঁচে বা মরে, সে-সম্বন্ধে সচেতন ক'রে যায়।

শুধু 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক' নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২.৯.১৮৯৪-১.১১.১৯৫০) অজস্র দুর্ধর্ষ ছোটোগল্পেরও লেখক এটা সকলেরই জানা, কিন্তু এরই মধ্যে "ভণ্ডুলমামার বাড়ি" গল্পটির স্থান নিশ্চয়ই বিশেষ—তবে সেটা ভণ্ডুলমামার যে-বাড়ি কোনোকালেই ওঠে না, তার সাংকেতিক তাৎপর্যের জন্যেই শুধু নয়। দুটি উত্তম পুরুষের জবানিতে ফাঁদা এই গল্প কিন্তু শেষ অব্দি নিছক ভণ্ডুল-মামার গল্পই হ'য়ে থাকে না। মূল গল্পের একটা ফ্রেম আছে, সেটা স্কুল ইন্সপেক্টরের জবানিতে বলা—আসলে গল্পের মধ্যে আরো-একটা গল্প—আর সেই ফ্রেমের মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটির কথক গাঁয়ের মাইনার স্কুলের হেডমাস্টার অবিনাশবাবু। স্কুল পরিদর্শক বিকেলে জলখাবার খাবার সময় একটু ইতস্তত ক'রে বলেন—'অবিনাশ-বাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু…'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—সার্টেনলি—ওরে কানাই। শোন্, শোন্, যা দিকি একবার গঙ্গার বৌয়ের বাড়ি। আমার নাম ক'রে বলগে, দুটি গরম মুড়ি ভেজে দেয়—এক্ষুনি…'

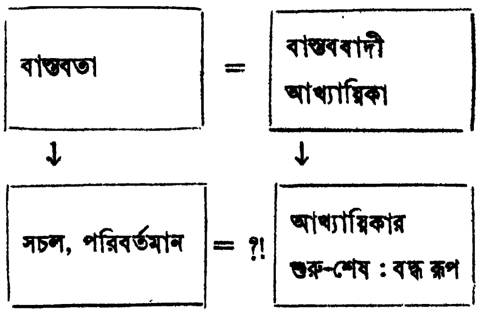
আমি বললুম, 'অভাবে চাল ভাজা…'

ভণ্ডুলমামার না-ওঠা বাড়ির গল্প শেষ হ'তেই 'অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এলো।'

এই ফ্রেমের ভেতর ভণ্ডুলমামার বাড়ি-উঠছে-তো-উঠছেই-কিন্তু-কিছুতেই-শেষ-হচ্ছে-না গল্পটি পুরে দেবার ফলে, একটি স্পেসের মধ্যে আরো-একটি স্পেস তৈরি ক'রে দেয়ায়, বিভূতিভূষণের আশ্চর্য শিল্পিতা দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। তাঁর অস্ফুট উনকথন, অলক্ষিতে সাজানো ইঙ্গিত, সবকিছু মিলে গল্পটি উত্তীর্ণ হয় অন্য-একটি স্তরে। অবিনাশবাবু বলেন 'হ্যাঁ-হ্যাঁ—সার্টেনলি'; অবিনাশবাবু বলেন,

বয়স হয়েছে কলেজে পড়ি: নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিংয়ে ভলান্টিয়ারি করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই গেছে বদলে—তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরো-পাঁচটা পুরোনো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা প'ড়ে গিয়েছে…

অথচ পড়েওনি, যেমন অজ পাড়াগাঁয়ে ব'সে আজ তিনি বলেন 'সার্টেনলি' ; তেমনি স্কুল পরিদর্শক, তাঁরও যেটা বাসনার স্তর, সেখানে চাহিদা একটু গরম মুড়ি, 'অভাবে চালভাজা'ও সই। একটা বাক্সের মধ্যে পোরা আছে আরেকটা বাক্স—এ-গল্প যদি নিছকই বাস্তবতার গল্প হ'তো, যে-বাস্তবতা অনবরত বদ্‌লায়, পালটায়, যা বেগবান গতিশীল, ঐ বাক্সে তাকে পোরা অসম্ভব হ'তো, যদি-না এই ফ্রেমের থাকতেন স্কুল পরিদর্শক ও অবিনাশ বাবু।



সচল পরিবর্তনশীলতাকে আখ্যায়িকার শুরু ও শেষের এই বদ্ধরূপে ধরবো কী ক'রে আমরা ? ভণ্ডুলমামার বাড়ির গল্প তা-ই শেষ হয় না, বাড়ি হ'য়ে ওঠে স্বপ্নের বাসনার সাফল্যের উৎপ্রেক্ষা—যে-বাসনা পূর্ণ হয় না কখনও। একটা ছোট্ট বাড়ি, সম্পূর্ণ হয় না। কলেজের পড়া শেষ ক'রে দিয়ে পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুলের হেডমাস্টারি—আদর্শ, স্বপ্ন, বাসনা পূর্ণ হয় না। স্কুল পরিদর্শক—তাঁর নগণ্য (কিন্তু তুচ্ছ নয় মোটেই, গল্পের জমিতে) বাসনা একটু গরম মুড়ি, অভাবে নিদেন চাল-ভাজা। আমরা দেখতে পাই ভণ্ডুলমামা একা নন, ধীরে-ধীরে অনেক হ'য়ে উঠছেন, হয়তো কানাই, যে-গরিব ছেলেটি অবিনাশবাবুর বাসায় থেকে পড়ে, সেও আরেকজন হবু ভণ্ডুলমামা। বিভূতিভূষণ আশ্চর্য শিল্পিতায় এই ফ্রেমটি ব্যবহার ক'রে বদ্ধ বাস্তবতার রূপকল্পটিকে নিরর্গল ক'রে দিয়েছেন—এই ফ্রেম বাদ দিলে গল্পটি আমাদের কাছে এমন মর্মস্পর্শী মনে হ'তো না।

হরিকান্ত জেঠওয়ানির গল্প, তাই, এক নামহীন ভূগোলে, কারফিউ, জরুরি অবস্থা, অকথ্য নির্যাতন—ইত্যাদির মধ্যে আমাদের এনে পৌঁছে দেয় গারদের মধ্যে —কেননা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যদি জাতপাত, শ্রেণীবিভাগ, নারী নির্যাতন ইত্যাদিই নিয়ামক ও পরিচালক হ'য়ে থাকে তবে সমগ্র ভারতবর্ষ এক বিরাট গারদ ছাড়া আর কী ? এই সিদ্ধি লেখক যে-গারদকে যে-আতঙ্ককে

চাক্ষুষ ও সজীব ক'রে তোলেন তা ক্রমেই মনে হয় কোনো বিশেষ ছোটো স্থানীয় হাজত নয়—তার চেয়েও বড়ো-কিছু। সেখানে স্কুলপরিদর্শক বা অবিনাশবাবুর মতো আমরা যদি ভাবি যে তবু তো সব বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে বেশ বেঁচে আছি, ভণ্ডুলমামা বরং অন্যধরনের ব্যর্থ মানুষ ছিলেন, তবে আমরা ভুল করবো। এই হাজত এমন-একটা জগৎ যেখানে তীব্র অভিমানে উচ্চারণ-করা 'মরণ' কথাটি, অত্যাচারী জমিদারের মৃত্যুতে রুদালীদের কপাল ঠুকে কান্নাকাটি করা—সব উলটে যায়, হ'য়ে ওঠে প্রতিবাদ-ধিক্কার-ব্যঙ্গ-অভিমান অর্থাৎ অন্যকিছু। আর সেখানেই অন্য আয়তন তৈরি ক'রে দেয় 'অলৌকিক'—বাস্তবকে পেরিয়ে গিয়ে তৈরি হয় কিংবদন্তি, পুরাণ—অনড়-অচল পুরাণ নয়—কেননা আমরা দেখছি প্রক্রিয়াটা, গতিময় বেগবান প্রক্রিয়া; প্যারাবলের মতো পুরাণের এই নতুন জন্মের প্রক্রিয়াও তাই দেখতে পাই আধুনিক ভারতীয় গল্পের একটি প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠছে।

—